পদধ্বনি

সুবোধ বসু

গ্রন্থাগার
কলিকাতা

শ্রীঅমলা দেবী

শ্রীভবতোষ দত্ত

প্রীতিভাজনেষু—

সুবোধ বসু-র

অন্যান্য বই

উপন্যাস

পাখির বাসা

রাজধানী

পদ্মা—প্রমত্তা নদী

মানবের শত্রু নারী

সহচরী

নব মেঘদূত

স্বর্গ

নটী

বন্দিনী

স্ত্রীবুদ্ধি

গল্প-সংগ্রহ

জয়যাত্রা

বিগত বসন্ত

নাটক

অতিথি

কলেবর

তৃতীয় পক্ষ

শিশু-নাট্য

বুদ্ধির্যস্য

এক

সম্পাদকীয়টা শেষ করিয়া সুপ্রকাশ কপিটা বেয়ারার হাতে সম্পাদকের ঘরে পাঠাইয়া দিল। আজ দুপুরে অফিসে আসিবার সময় হইতেই মন পালাই-পালাই করিতেছে। সমস্ত শহরটা এমন ক্ষেপিয়া গিয়াছে, আর সে-ই ডেস্কের সমুখে বসিয়া 'ন্যাশন্যাল ডেইলি'র জন্য সুস্থির বিচার-পূর্ণ রাজনৈতিক নিবন্ধ লিখিবে, ইহা তাহার কাছে কেবলই অসঙ্গত মনে হইতে লাগিল।

এমন একটা শহরে এমন বিশৃঙ্খলার উদ্ভব একটা ঐতিহাসিক ঘটনার পর্য্যায়ে পড়ে। মানুষ, ঘোড়া, মোটর-গাড়ি, ট্রাম-বাস, দোকান-পসার, হাওড়ার পুল, রেলের ইস্টিশান, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক শড়ক, সবাই পাগল হইয়া গিয়াছে। রেলের ইস্টিশান যে এই বিরাট নগরীর অর্দ্ধেক বাসিন্দার একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হইত না। প্রাইভেট মোটর, ট্যাক্সি, বাস, মোটর-লরি, ঘোড়ার গাড়ি, রিক্সা, আর গোরুর গাড়িতে পর্য্যন্ত কাতারে কাতারে লোক ইস্টিশানের বুকিং অফিসের সম্মুখে ধর্না দিতে আসিয়াছে। ট্যাক্সি ও গাড়ি-অলাদের মর্শুম পড়িয়াছে; কুলি, টিকিট-বাবু ও রেল প্ল্যাটফর্ম্মের দ্বারপালদের পকেট ভারি হইয়া উঠিতেছে। ভয়-ত্রস্ত নরনারী অর্থের মায়া করিতেছে না, অসুবিধার তোয়াক্কা করিতেছে না, যে যাহার মূল্যবান সম্পত্তিগুলি জোগাড় করিয়া অভিশপ্ত নগরী হইতে ছুটিয়া পালাইবার-জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। মানুষে, মালে, শিশুর চিৎকার এবং জনতার কোলাহলে কলিকাতার রেল-স্টেশন দুটি আকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তবু জনতার শেষ নাই; জলস্রোতের মতো [illegible] জনস্রোত সম্ভব-অসম্ভব

নানাপ্রকার যান-বাহনে চড়িয়া, আবশ্যক এবং অনাবশ্যক পোঁটলা-পুঁটুলি আঁকড়াইয়া ভীত, উদ্বিগ্ন পাংশু-মুখে রেলের গাড়ির একটা যত অপরিসর কোণই হউক সংগ্রহ করিবার জন্য মরিয়ার মতো ছুটিয়া আসিতেছে। ভদ্রতা নাই, সৌজন্যবোধ নাই, অন্যের ন্যায্য অধিকারকে সম্মান দেখাইবার প্রবৃত্তি ভয়ে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধকে ঠেলিয়া যুবা, নারীকে ঠেলিয়া পুরুষ, দুর্বলকে ঠেলিয়া শক্তিমান আত্মরক্ষার জন্য লালায়িত হইয়াছে। কাহারও ছেলে হারাইতেছে, কাহারও মেয়ে হারাইতেছে। কেহ ভিড়ের চাপে মূর্চ্ছা গেল, কেহ অলঙ্কারের বাক্স হারাইল; বিনিদ্র, শীতার্ত্ত, অভুক্ত অবস্থায় কত লোক যে মরিবার উপক্রম হইল, তাহা আর বলিবার নয়। তবু এই অভিশপ্ত নগরীকে এই মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে হইবে। এই নগরী কত জীবিকার সংস্থান করিয়াছে, কত আয়াস বিতরণ করিয়াছে, কত প্রমোদ পরিবেশন করিয়াছে, উৎসব-সভায় কত দীপ জ্বালিয়াছে, আজ তার দুঃসময়ে কাহারও আর তাহা মনে রহিল না; ব্যাধিগ্রস্তা নটীর মতোই সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল।

এই বিশৃঙ্খলা সুপ্রকাশের মনকে টানিয়াছে। যাহা স্থির, যাহা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত বলিয়া এতদিন সম্মান এবং আনুগত্য পাইয়া আসিয়াছে, একটা সামান্য টোকায় তাহা কেমন করিয়া সাড়ে-বত্রিশ ভাজার মতো ওলোট পালোট হইয়া যাইতে পারে তাহা ভয়ের পরিধির বাহিরে থাকিতে পারিলে উপভোগ করিবার মতো বস্তু। সুপ্রকাশ সমস্তই উপভোগ করিতেছে, একান্তই উপভোগ করিতেছে। কত ভঙ্গুর এসব! এমনই সহজে সকল রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থের গর্ব্ব, কীর্ত্তির গর্ব্ব, সম্পত্তির স্বাচ্ছন্দ্য এক টোকায় ধূলায় মিশাইয়া যাইতে পারে! নতুন সভ্যতা, নতুন মূল্য-বিচার, নতুন ন্যায়ের আদর্শ এমনই অবলীলাক্রমে উদয় হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়।

একটা অনাগত বিপ্লবের ছবি বারবার সুপ্রকাশের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল।

মাটিতে পা দুইটা দিয়া ঠেলিয়া সশব্দে চেয়ার সরাইয়া সে উঠিয়া পড়িল।

সুপ্রকাশ আটাশ-উনত্রিশ বছরের যুবক। বেশি মোটা নয়, বেশি রোগা নয়; লম্বায় ছ'ফুটের কাছাকাছি। উজ্জ্বল শ্যাম গায়ের রং; নাকটা উঁচু। চোখ দুটি স্তিমিত থাকিলে একটু ভাবালুতার আমেজ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সজাগ থাকিলে তাহাতে বুদ্ধি এবং সমালোচনার দীপ্তি সুস্পষ্ট ফুটিয়া ওঠে। তার মুখমণ্ডলে অকৃপণ হাসি অতি সহজে যাতায়াত করে, কিন্তু ঠোঁট দুটিতে দৃঢ়তার চিহ্ন একটু লক্ষ্য করিলেই নজরে পড়িবে।

গত দুই বৎসর ধরিয়া, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় শুরু হইতেই সে 'ন্যাশন্যাল ডেইলি'তে অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরি করিতেছে। এম্‌-এ পাশ করিবার পর জীবিকা-অর্জ্জনের তাগিদটা যখন প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে, তখন জীবিকা বাছিবার সমস্যাটা তাহার জীবিকা-অন্বেষণের সমস্যার চাইতে কম গুরুতর হইয়া ওঠে নাই। প্রচলিত পথে বড় চাকুরি জোগাড়ের চেষ্টা করিয়াছে, একবার কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতেও বসিয়াছিল, স্টেটস্‌ম্যানের কর্ম্মখালির কলাম ঘাঁটিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম হিসাবে বহু আবেদন ছাড়িয়াছে, কিন্তু কোনও পরিণতিতে পৌছায় নাই। এমন সময় বাঁধিল তার বাপের সঙ্গে মতান্তর; ক্রমে তাহা মনান্তরে দাঁড়াইল।

মাত্র আগের বছর তার মা মারা গিয়াছিলেন; বাড়িতে গৃহিণী-স্থানীয় কেহ নাই। নারায়ণগঞ্জের বিখ্যাত উকিল অম্বিকাবাবু সেইটাকে বড় ছেলের অবিলম্বে বিবাহ করিবার মতো জরুরি বিবেচনা করিলেন। পাত্রীর খোঁজ চলিল। অবশেষে একদিন তিনি সুপ্রকাশকে

জানাইলেন, তাহার বিবাহ তিনি স্থির করিয়াছেন, একটা শুভদিনও ধার্য্য হইয়া গিয়াছে।

সুপ্রকাশের নব-জাগ্রত ব্যক্তিত্ব-বোধের কাছে এই আজ্ঞা একটা রূঢ় আঘাতের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল। জীবনের এত বড় এবং এত অন্তরঙ্গ ব্যাপারে অন্যের এমন সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ অনধিকার চর্চ্চার মতো মনে হইল। মতান্তর মনান্তরে দাঁড়াইল। মূল্যবান চাকরি সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করা আর চলিল না; স্বাবলম্বী হওয়া অচিরেই অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিল। অল্প বেতনে যেটা সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত কাজ তাহাই সে বাছিয়া লইল। কলেজ-জীবনেই তার কলমের জোর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই কল্যাণে 'ন্যাশন্যাল ডেইলি'-র সম্পাদনা-মণ্ডলে তাহার সগর্ব প্রবেশাধিকার।

হ্যারিসন রোড ধরিয়া সুপ্রকাশ হাওড়া-পুলের দিকে আগাইয়া চলিল। জানুয়ারী মাস, বেশ কনকনে হাওয়া দিতেছে। পশমী পাঞ্জাবিটার গলার বোতামটাও সে আটকাইয়া দিল; একটুতেই আবার তার সর্দ্দি লাগে। শীতের সন্ধ্যা শুরু হইয়া গিয়াছে। এখনও ব্ল্যাক-আউটের গ্যাস জ্বলে নাই। কর্পোরেশনের আলো যাহারা জ্বালায়, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যেই শহর ত্যাগ করিয়াছে, কেহ কেহ পলায়নের উপায় খুঁজিতেছে; তবু কর্পোরেশন পৌর কর্ত্তব্যগুলি যথাসাধ্য চালাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই শহরব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটি কর্ত্তব্যের শুধু বিরাম নাই—পলায়নপর জনতার শোভাযাত্রা অন্তহীন প্রবাহে চলিয়াছে। এই ক্রমান্ধকার পথে সুপ্রকাশের কাছে তাহা প্রেতের শোভাযাত্রার মতো মনে হইল।

১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস। বর্ম্মার জাপানীরা হানা দিয়াছে

বিমান-আক্রমণে রেঙ্গুনের বহু সহস্র লোক হতাহত হইয়াছে। দলে দলে ভারতবাসী জাহাজে বা পদব্রজে দেশে পালাইয়া আসিতেছে। জাপানী সৈন্যদলের এক বাহু মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা প্রভৃতি জয় করিতেছে; অন্য বাহু ট্যানাসেরিম অঞ্চলের মধ্য দিয়া বর্ম্মায় প্রবেশ করিয়াছে। এই যুদ্ধের ধাক্কাটা কিন্তু সবচেয়ে প্রবল হইয়া আসিল কলিকাতায়। বহুকাল যুদ্ধ-দর্শনে অনভ্যস্ত জনেরা আতঙ্ক গণিল; প্রমোদময়ী নগরীর উপরে আতঙ্কের ছায়া মৃত্যুচ্ছায়ার মতো গাঢ় হইয়া উঠিল। আশঙ্কা-উদ্বেগের আর অন্ত রহিল না।

মাড়োয়ারিদের বড় বড় আড়ত ও দোকানগুলির কোনটাই যে খোলা আছে, সুপ্রকাশের এমন মনে হইল না। গুজব শুনিয়াছে, বহু মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী নাকি জলের দামে মাল বিক্রয় করিয়া অভিশপ্ত নগরীর আওতা ছাড়িয়া পালাইয়াছে; নিজেদের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি সোনার তালে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে, পুলিশ এমনও কয়েক জনকে আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া খবরের কাগজে সংবাদ বাহির হইয়াছে। বড়বাজার আর বড়ো বাজার নাই; রুদ্ধদ্বার বিপণিগুলি কালো কালো বিরাট প্রেতের মতো হিংসুক আনন্দে মৃত্যু-ভীত জনতার বক্ষ-কম্পন উপভোগ করিতেছে।

'শুনচো, ট্যাক্সিওয়ালা, হাওড়া স্টেশন যাবে?'

'কেওঁ নেই।' রাস্তার ধারে ট্যাক্সির পিছনের সীটে গা এলাইয়া জবরজঙ্গ গালপাট্টাওয়ালা শিখ ট্যাক্সি-চালক সমুখের আসনের পিঠে পা-জোড়া উঠাইয়া দিয়া জগতের সমুদয় কিছুর প্রতি অবহেলা-ভরে ...র পাতা নাচাইতেছিল, শুইয়া শুইয়াই নির্লিপ্তকণ্ঠে প্রশ্নের ... দিল।

'বড় বিপদে পড়েছি।' সুপ্রকাশ ঠোঁটের কোণায় দুষ্টু হাসিটা চাপিয়া কহিল। 'স্ত্রী অসুস্থ, তিনটে ছোট ছোট ছেলেপিলে, এদের

নিয়ে আজই পালাতে হবে। অথচ কোথাও একটা গাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না।'

ট্যাক্সিঅলা নিঃশব্দে তিনচার সেকেণ্ড পা নাচাইল। অতঃপর নিরাসক্তভাবে প্রশ্ন করিল, 'কাঁহাসে যাও গে?'

'এই তো, চিৎপুরের মোড়ে; কাছেই।'

'পন্দর রূপায়া।'

'পনেরো টাকা! বলো কি? এক মাইলেরও যে পথ নয়? মিটারে আট আনার বেশি উঠবে না।'

'যো মিটার যে যায়গা উস্‌কো ঢুঁড়ো।' বলিয়া ট্যাক্সিঅলা আবার পা নাচাইতে আরম্ভ করিল।

'ছেলেপিলে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি; দেশের লোকের বিপদে দেশের লোক সাহায্য না করলে...' সুপ্রকাশ আবার শুরু করিল।

'খত্‌রা হামারা ভি কুছ্ কমতি নেহি।'

'তোমারও এখানে ছেলেপিলে আছে নাকি? অসুস্থ স্ত্রীও আছে আমার মতো?'

'নেহি তো কেয়া? হামারা জান্‌কো কিম্মৎ কুছ কমতি হায়?'

'দশটাকা নাও।'

'ভয়সা-গাড়ি বহুৎ মিলেগি।' বলিয়া ট্যাক্সিঅলা পুনর্ব্বার পদ-নৃত্য শুরু করিল।

সুপ্রকাশ আর কিছু না বলিয়া মনে মনে খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া হাওড়ার পুলের দিকে অগ্রসর হইল।

'কমলা লেবুর জোড়া কত করে?'

'আঠ্ আনে।'

পেশোয়ারি ফলওয়ালা ফলের মতোই রসে টস্‌টস্ করিতেছে;

সুপ্রকাশকে সে মোটেই সাংবাদিক বলিয়া জানিল না; জানিলেও সম্মান করিত না। তাহার লাভের মর্শুম আসিয়াছে; পলায়নপর জনতা ভবিষ্যতের রসদ-সংগ্রহের প্রয়োজনে তাহার দোকানে সারাক্ষণই ভিড় করিতেছে, দ্রব্যের মূল্য বিচার করিতেছে না, জিনিষ পাইতেছে, ইহাই যথেষ্ট মনে করিতেছে।

'ভাই, চার আনা দিচ্ছি। ইস্টিশানে আমার ছেলেটা কাঁদছে, তাই কমলালেবুর খোঁজে এতদূর আসতে হলো।'

'আগে বাঢ়ো, বাবুজি। চার আনামে সান্ত্রা নেহি মিলতা।'

সুপ্রকাশ তবু দমিল না। কহিল, 'এর জোড়া কি দু আনার বেশি হওয়া উচিত? দুঃসময় বলেই না চার আনা দিচ্ছি।'

পেশোয়ারি ফলওয়ালা ইহার জবাব দেওয়াও অসম্মানজনক মনে করিল। ঠোঁট দুটি ছুঁচলো করিয়া সে অবজ্ঞাভরে 'বনকে চিড়িয়া' শুরু করিয়া দিল। অবশ্য, 'চল্, চলরে নওজোয়ান' বা 'পিয়া মিলনকো জানা' বা 'নাচো নাচো প্যায়ারে, মনকে মোর' এবং আরও অনেক কিছুই তার জানা, তবু 'বনকে চিড়িয়াই' তাহার মনোহরণ করিয়াছে।

বনের পাখির সন্ধানরত ফলওয়ালাকে ছাড়িয়া সুপ্রকাশ হাওড়া পুলের জনস্রোতের মধ্যে আসিয়া মিশিল। ভাবিতে লাগিল, পন্টুন পুল কত শক্তি ধরে? কোনও ওজনই কি ইহাকে পরাজিত করিতে পারে না? নইলে আজও সে নদীর উপরে ভাসিয়া আছে কি করিয়া? ও-পারে পৌঁছিয়া ঘড়ি মিলাইয়া সুপ্রকাশ দেখিল, কুড়ি মিনিট লাগিয়াছে। পাঁচ মিনিটের পথ কুড়ি মিনিটে পৌঁছিয়াও তার বিস্ময় হইল।

'আঃ, মোশায়, বিছনে চোকে দেখতে পান না? দিলেন তো সুজনিটাতে রাস্তার ময়লা লাগিয়ে…

'আজ্ঞে, আমি বড়ই লজ্জিত,' অপ্রতিভ হইয়া সুপ্রকাশ কহিল, 'আমি এ-জায়গাটাকেও রাস্তাই মনে করেছিলাম! বুঝতে পারিনি এখানে বিছানা পাতা রয়েচে…'

'আর রাস্তা!' কেরাণীশ্রেণীর সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কহিলেন, 'এ যে তীর্থে এসেছি মোশায়। পদ-রজ গায়ে মেখে গড়াগড়ি যাচ্ছি; অথচ দুদিনের চেষ্টারও টিকিট ঘরের কাছাকাছি ঘেঁষতে পারলাম না…'

'বাড়ি ছেড়ে এসব ছেলেপিলেদের নিয়ে দুদিন ধরে এখানে বসে আছেন!' সবিস্ময়ে সুপ্রকাশ কহিল।

'এ ছাড়া আর বাঁচবার উপায় কি, মোশায়?' ভদ্রলোক অভিযোগের সুরে কহিলেন। 'ব্যাটা গো-খাদক আর ফড়িঙ-খাদকের যুদ্ধ, আর এদিকে আমাদের উলুখড়ের প্রাণ যায়। দেখুন তো মোশায় কাণ্ড! আমাদের কোলকাতা শহরটাকেই ধূলিসাৎ করবার জোগাড় করেছে।… এবার প্রাণ নিয়ে সরে পড়তে পারলে বাঁচি।…বলেচে তো রেলের বাবু, আজই টিকিট জোগাড় করে' দেবে…দশটাকা কবলেছি, রাজি হচ্ছে না…ষোল টাকা চাচ্ছে। মাঝামাঝি একটা রফা করতে হবে।…প্রাণই যদি না বাঁচে, টাকা দিয়ে আর কি হচ্ছে…'

'কোথায় যাবেন?' সুপ্রকাশ প্রশ্ন করিল।

'জানিনে, মোশায়! কোথায় যাব, কিচ্ছু জানিনে! শুধু জানি, পালিয়ে যেতে হবে। তাই তো ভদ্দরলোককে বলেছি, যেখানে হোক, যদ্দূর হোক, শুধু টিকিট ক'টা জোগাড় করে দিন।'

টিকিটহীন যাত্রা নিবারণের জন্য প্ল্যাটফর্ম্ম-টিকেট বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। টিকিট-ঘরের পঞ্চাশ গজের মধ্যে অগ্রসর হওয়া

অসম্ভব। প্ল্যাটফর্মের ফটকের কাছাকাছি অগ্রসর হইতে হইলে প্রতি পদক্ষেপে লোকের বা লোকের সম্পত্তির সঙ্গে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। তবু সুপ্রকাশের ভিতরকার সাংবাদিক তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

প্ল্যাটফর্মের প্রবেশ-মুখে সে এক মহামারী ব্যাপার। যেন সমুদ্রের জল একদিন ক্ষেপিয়া গিয়া একটা খালের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছে। শিশু, নারী, বৃদ্ধ, যুবা এবং তাহাদের মালবাহী কুলিরা সকলেই যেন স্থান কাল পাত্র উপেক্ষা করিয়া নিরাপত্তার বাহন রেলের গাড়ির সান্নিধ্যে আগাইয়া যাইবার বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

'কোন ক্লাসের টিকেট ?'

'কোন্ ক্লাস !'

'আপার ক্লাস ছাড়া কারুর ভেতরে ঢোকবার হুকুম নেই। সরে দাঁড়ান।' রেলের দ্বারপাল কর্ম্মচারিদের একজন একটু রূঢ়স্বরেই কহিল।

'অন্যদের উপায় ?' সুপ্রকাশ উৎকণ্ঠার সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিল।

'জানিনে। অত বক্‌বার সময় নেই।'

মাথায় পর্ব্বত-প্রমাণ মাল লইয়া একটা কুলি কিছুক্ষণ হইতেই সুপ্রকাশকে পিছন হইতে ঠেলিতেছিল। পুরোগামীর অজ্ঞতা ও আনাড়িত্ব দেখিয়া সে হতাশ হইয়া উঠিতেছিল। উপদেশ দিয়া কহিল, 'পাকিট্ মে দো রূপায়া ডাল্ দিজিয়ে বাবুজি, ফটক জরুর খুলে গা। রাস্তা্ বন্দ্ করকে খাড়া নাহি হোনা...আপ নেহি দেঙ্গে তো দুসরি দেনেকো তৈয়ার...'

'আমি ন্যাশন্যাল ডেইলি থেকে ভিড়ের অবস্থা রিপোর্ট করতে এসেছি।' ফটকের সমুখের অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত পোশাকের কর্ম্মচারিটিকে সুপ্রকাশ অবশেষে গম্ভীরভাবে জানাইল।

'ওঃ, আপনি ন্যাশন্যাল ডেইলির প্রতিনিধি? আসুন, ভেতরে আসুন, আসুন। দেখে যান, যাত্রিদের সুবিধার জন্য আমরা কি রকম সব ব্যবস্থা করেছি। অসম্ভব ভিড় মশায়। এর সঙ্গে কোপ্ করা কি চাটিখানি কথা; মেহন্নতের একশেষ হচ্ছি।...আসুন. আমার সঙ্গে আসুন। আমি একজন প্যাসেঞ্জার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট: যাত্রিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাই আমার কাজ।...রেল কর্ত্তৃপক্ষ হিরোয়িক এফর্ট করচে। দেখছেন তো কাণ্ড! সব লোক একসঙ্গে ক্ষেপে গেলে আমরা কি করি? এই পাগলামির তাল সামলাতে আমরাও সারা হবার জোগাড় হয়েচি। খেটে খেটে হাড়ের ভিতরে পর্য্যন্ত ব্যথা হয়ে গেছে।...স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে একবার দেখা না করে যাবেন না। যাত্রিদের জন্য আমরা কি কি ব্যবস্থা করেছি, সব তিনি বুঝিয়ে দেবেন। টিকিট-ঘরের সবগুলি কাউণ্টার খুলে দেওয়া হয়েছে; ঝাড়ুদার মেথর সর্ব্বত্র ঝাঁটপাট দিয়ে বেড়াচ্ছে, ফিলটারের জলের যাতে অভাব না হয়, সেদিকে কড়া নজর আছে; ভেজাল না-চালায় সেজন্য ফেরিঅলাদের খাবারের উপর দৃষ্টি রাখা হয়েচে। আর চোর-বাটপারের হাতে যাতে যাত্রীর ধন-সম্পত্তি মারা না যায়, তার জন্য কি রকম পুলিশের বন্দোবস্ত করা হয়েছে, তা আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেচেন...'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গেটের সামনেই তো দু' দুটো পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচি!' সুপ্রকাশ হাসিটা গিলিয়া ফেলিয়া গম্ভীর মুখেই কহিল। 'চুরি-জোচ্চুরির কোনও উপায়ই রাখেন নি আপনারা।'

'ধন্যবাদ। সবাই এটা অ্যাপ্রিশিয়েট করে না।' প্যাসেঞ্জার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কহিল। 'দেবেন আপনার কাগজে দুকথা লিখে, তবে যদি বিশ্বেস হয়। আমার নাম দেবেন চাটুয্যে।'

'মনে থাকবে', বলিয়া সুপ্রকাশ ট্রেনের দিকে আগাইয়া চলিল।

বস্তুতঃ ঘটনা রিপোর্ট করা সুপ্রকাশের কাজ নহে। খবরের কাগজের নাম করিয়া সে প্ল্যাটফর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, এই যথেষ্ট। খবরের কাগজের অফিসের চাকরিটা সহসা তার কাছে মূল্যবান মনে হইতে লাগিল।

দুই

স্টেশন হইতে বাহির হইয়া সুপ্রকাশ যখন একটা দশ নম্বরের বাস্-এ চাপিয়া বসিল, তখন বাহিরের বড় ঘড়িটাতে প্রায় আটটা বাজে। সে অফিসে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সুজাতা-দির কাছ হইতে এক টেলিফোন আসিয়াছিল; একবার নিউপার্ক স্ট্রীট্‌টা ঘুরিয়া আসিতে হইবে। প্রয়োজন হয়তো এমন কিছু গুরুতর নয়; হয়তো ভাল কিছু রান্না হইয়াছে, তাই এই আহ্বান। এমন তো সর্ব্বদাই হয়। তবে শহরের সর্ব্বত্র যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে তিনিও যে উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠেন নাই, তাই বা কে বলিবে। যদিও সুজাতাদির মতো তেজস্বী মেয়ে ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া বসিবেন, এমন সম্ভব মনে হইল না।

সুজাতাদি! কি অদ্ভুত মেয়ে! কোমলতার অন্তরালে চিত্তের এমন দৃঢ়তা বিস্ময়কর! যাহারা তাহার জীবনেতিহাসের একান্ত ট্র্যাজিডি-টার কথা বিদিত নয়, তাহারা তাহাকে অতি-কোমলস্বভাবা সাধারণ বাঙালি মেয়ে ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিবে না; কত বড় একটা সামাজিক বিদ্রোহের তিনি মূর্ত্ত প্রকাশ তাহা কল্পনা করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। অথচ তাহার সমস্ত জীবন জ্বালাইয়া কত বড় একটা প্রতিবাদ তিনি ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা সুপ্রকাশের কাছে অবিদিত নয়! কী শ্রাদ্ধই হয় তার ভগ্নিস্বরূপা এই মহিলার উপর।

খালি বাস্-টা বড়বাজারের মধ্য দিয়া হুহু করিয়া ছুটিয়া চলে। হাওড়া স্টেশন হইতে দুচার জন ছাড়া আর যাত্রী ওঠে নাই; রাস্তায়ও বড় বিশেষ কেহ উঠিল না। সকলের গতি স্টেশনের দিকে, উল্টা স্রোতে ভাসিবার লোক বড়ই বিরল।

নিউ পার্কস্ট্রীটের তেতলার ছোট ফ্ল্যাটটার দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুপ্রকাশ যখন বেল্ টিপিল তখন রাত সওয়া আটটার বেশি নয়।

ড্রয়িং-রুমের বড় কৌচটার একপ্রান্তে আলোটার ঠিক নিচে বসিয়া সুজাতা চৌধুরি উল্ বুনিতেছিলেন। কোল হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্য্যন্ত একটা কল্কা-আঁকা লাল-রঙের শালে ঢাকা; তার উপর নীল রঙের উলের গোলাটা। চোখ বয়নে নিবদ্ধ নয়, অভ্যস্ত অঙ্গুলিগুলি নির্ভুলভাবে আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছে;

সুজাতা যৌবনের প্রায় প্রত্যন্ত-দেশে পৌঁছিয়াছেন বলা চলে; ফর্শা, প্লাংলা সতেজ দেহ; দীর্ঘপক্ষ্মশোভিত বড় বড় চোখের দৃষ্টি বিনম্র; ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলে চোখের পাতার উপরে অতি ক্ষীণ দু একটা উপশিরার রেখা চোখে পড়িবে। মুখমণ্ডল সামান্য বিশীর্ণ হইলেও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ।

বারবার তিনি সস্নেহ দৃষ্টিতে পাশে চাহিয়া দেখিলেন। বই বুকে করিয়াই মিণ্টু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একগাছ অবশ রজনীগন্ধার মতো তার ছোট্ট মাথাটা একদিকে এলাইয়া পড়িয়াছে; সুজাতা সতর্কভাবে কুশানটা তার মাথার নিচে বারবার গুঁজিয়া দিলেন, কয়বার ওর চুলগুলি কপাল হইতে সরাইয়া দিলেন।

বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় এই সময়টায়। সুমিতা যদি একদিনও ঐ সময়টায় বাড়ি থাকিত, তবে সন্ধ্যাটা এমন দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর মনে হইত

না। অথচ এখন আর একদিনও সন্ধ্যায় সে বাড়ি থাকিবে না; নানা ধরণের পুরুষ ও মেয়ে বন্ধু জুটিয়াছে তার. বড় ভয় করে সুজাতার, নানা আশঙ্কায় মনটা ভরিয়া ওঠে। ছোট বোন সুমিতা কিন্তু এ আশঙ্কাকে আমলই দেয় না। বলে, সিনেমায় নাম করতে হলে, ভাল ভূমিকা পেতে হলে এদের সঙ্গে মিশতেই হবে।

সিনেমা! সুজাতা কোনও দিনই ইহা অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু কাহারও স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করা তার স্বভাব নহে। সুমিতা বড় হইয়াছে, ভালোমন্দ বিচার সে নিজেই করিবে। তবু তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন, জীবিকার জন্য অর্থ উপার্জ্জন প্রয়োজন মনে করিলে অন্যত্র তাহা সন্ধান করিতে বলিয়াছেন। সুমিতা নাক বাঁকাইয়া বলিয়াছে—মাস্টারনিগিরি! ও আমার ধাতে পোষাবেনা দিদি, তোমার মতো হেড্-মিসট্রেস হলেও না! জীবনটা আনন্দে উত্তেজনায় টগবগ করে উঠবে, তবে তো জীবন!

সন্ধ্যাবেলায় শিশু-পুত্র মিণ্টুই একমাত্র সাথী; সে-ও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

এমন সময় বাহিরের দরজায় বেল বাজিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সুজাতার মুখ স্নিগ্ধ আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বুঝিলেন, সুপ্রকাশ আসিয়াছে।

'কি দিদি, এমন জরুরি তাগিদ কেন? হাওড়া-স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে না তো?'

'না ভাই, তুমি বসো', সুজাতা কহিলেন। 'যমের ভয়ে পালাতে যাব কোন সুখে? ক'দিন ধরে তুমি আসচ না; ভয় হ'লো, অসুখ-বিসুখ কিছু করেনি তো। রাতে খেয়ে যাবে।'

'তা তো জান্‌তামই', পাশের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া সুপ্রকাশ কহিল।

'সু-মামা !' একটা হুইসিলের মতো কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়ই তাকাইয়া দেখিলেন, মিণ্টু উঠিয়া বসিয়াছে।

'আয়, আয়', সুপ্রকাশ কহিল। 'তাইতো আমি বলি, বাড়িটা এমন চুপচাপ কেন? তারপর, জাপানী এরোপ্লেন যে এসে পড়ল, তার কি করছ?'

'অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান্', মিণ্টু চোখ্ কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে কহিল, 'ফাইটার প্লেন্ আর বেলুন ব্যারাজ!'

'চমৎকার!' হাসিয়া সুপ্রকাশ কহিল। 'কোন্ টাইপের ফাইটার প্লেন?'

গড়গড় করিয়া মিণ্টু এক গাদা লড়িয়ে বিমানের নাম আওড়াইয়া গেল। এসবই সুপ্রকাশ তাহাকে শিখাইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ-বিদ্যায় মিণ্টুর স্বাভাবিক দক্ষতা বিস্ময়কর। সস্তা বই পড়িয়া যুদ্ধের বিভিন্ন মারণ-অস্ত্র বা যুদ্ধরীতি সম্বন্ধে যে সব তথ্য মিণ্টুকে শিখাইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ কয়দিনের মধ্যে সুপ্রকাশ ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মিণ্টু ভোলে নাই। ম্যাগনেটিক মাইন, ডেপথ্ চার্জ্জ বা মার্ক ফোর ট্যাঙ্ক সম্বন্ধে সে সহসা এমন সব তথ্য বলিয়া দিত যে, সুপ্রকাশ বাধ্য হইয়া তাহার নাম দিয়াছে—মেজর।

'কিন্তু, মেজর', সুপ্রকাশ কহিল, 'সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষার অস্ত্রটিরই নাম বলতে পারলে না।'

'আবার কি?' সবিস্ময়ে মিণ্টু কহিল।

'কেন, স্লিট্ ট্রেঞ্চ!'

'ধ্যেৎ। ও গর্ত্তের মধ্যে কে ঢুকবে, যা নোংরা!' মিণ্টু অবজ্ঞার সঙ্গে কহিল।

বড় ঘড়িটায় সাড়ে আটটা বাজিবার শব্দ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু-

স্থানী আয়াটা আসিয়া কহিল, 'বাবা, খেতে চল, সাড়ে আট বেজেছে।'

'না না, এখন আমি যেতে পারব না', প্রতিবাদের সুরে বিরক্তির সঙ্গে মিণ্টু কহিল। 'এখন আমি কিছুতেই যাব না, সু-মামার সঙ্গে গল্প করব, তুম্ আভি যাও···'

সুজাতা কহিলেন, 'মিণ্টু!'

ব্যস, আর কিছু বলিতে হইল না। একান্ত বাধ্য ছেলের মতো মিণ্টু এক মুহূর্তেই উঠিয়া পড়িল। সাড়ে আটটার তাহার খাওয়ার টাইম; মায়ের কাছে নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হইবার জো নাই, মিণ্টু তা জানে। এখন প্রতিবাদ জানাইতে হইলে পর্দার আড়ালে গিয়া আয়াটার কাছেই জানাইতে হইবে।

'ট্রেনিংটা খুবই নিখুঁত হয়েচে।' মিণ্টু বাহির হইয়া যাইবার পর সুপ্রকাশ সহাস্যে কহিল।

'কেন, তোমার কি পছন্দ হয় না?' সুজাতা হাসিয়া কহিলেন।

'না, তা কেন। নিয়মানুবর্তিতার ওপরই জীবনের ভিৎটা গড়া ভালো। তাতে ভবিষ্যতে বিদ্রোহী হবারও সুবিধা হয়।'

'তা জানি ভাই।' সুজাতা দৃষ্টিটা সহসা সুদূরে প্রসারিত করিয়া কহিলেন, 'বিদ্রোহী তোমরা হবেই। তোমাদের নব-জাগ্রত ব্যক্তিত্ব কারুর স্নেহ-প্রেমের মুখ-চেয়ে চলে না; নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য তোমরা ব্যগ্র হয়ে ওঠো, আর কারুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না···'

'মানুষের ব্যক্তিত্বের এই উদ্ধত বিকাশকে কি আপনি ভয় করেন, দিদি?'

'না, ভাই, ভয় করব কেন? নিজেও যে আমি এরই সাধনা করেচি। আমিও তো বিদ্রোহিনী। তবু ভয় হয়···'

'কি ভয়?'

'কোন্ একটা ইংরেজি উপন্যাসে পড়েছিলাম একটি মেয়ের কথা', উলের গোলাটা আবার কোলের উপরে তুলিয়া লইয়া সুজাতা কিছুটা যেন অলস-কণ্ঠে কহিলেন, 'সুখ-সন্ধানের প্রথম প্রচেষ্টায় সে ব্যর্থ হল ; স্বামীর প্রেম-লাভ ভাগ্যে ঘটল না। আঁকড়ে ধরল সে দ্বিতীয় সম্ভাবনাকে —পুত্র হ'তে আনন্দ পাবেন। এখানেও তাকে হতাশ হ'তে হলো, পুত্র চায় তার প্রিয়াকে, মা তার কাছে গৌণ ! তখন আর কি বাকি রইল ? ধর্ম্ম। থেকেও শান্তি এল না, ধর্ম্মের ভণ্ডামি হতাশ করলো।— ধর্ম্মের থেকে আনন্দ লাভের চেষ্টা করব বলে মনে করিনা ; ধর্ম্মের উদ্ভব ও স্বরূপ সম্বন্ধে যে-ব্যাখ্যা তোমাদের কাছে নিত্য শুনতে পাই, তার পরেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা বজায় আছে বলে মনে করি না। প্রথমটায় তো ব্যর্থ হয়েইছি। বাকি রয়েছে আমার মিণ্টু। সে-ও কি তার মাকে হতাশ করবে ?' একটা যেন ক্ষীণ-বেদনার আভাস তাহার কণ্ঠে ভাসিয়া উঠিল।

'ভয় নেই, দিদি', সুপ্রকাশ কহিল, 'আমরা, বাঙালি ছেলেরা, ক্রোনিনের উপন্যাসের সেই ডাক্তার ছেলেটির মতো অত স্বার্থপর হয়ে উঠতে পারি না। অন্যকে শ্রদ্ধা করাও আমরা কর্ত্তব্য মনে করি। শুধু চাই, সে-কর্ত্তব্যের দাবি যেন এত স্বার্থপর না হয় যে, সে আমার ব্যক্তিত্বকে চাপা দেবার ষড়যন্ত্র শুরু ক'রে দেয়। আমাদের আচরণের এথিক্স-টা নতুন হ'তে পারে, কিন্তু তা সর্ব্বতোভাবেই মন্দ নয়।'

মিণ্টুকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া সুজাতা আবার বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ঘড়িতে সময়ের কাঁটা সওয়া নয়টায় ; সেদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিলেন, 'সুপ্রকাশ, চলো তুমি খেয়ে নেবে, সওয়া নয়টা বেজে গেছে। তোমাকে আবার ফিরতে হবে সেই কোথায় ; এই শীতের মধ্যে যেতে আবার ঠাণ্ডা না লেগে যায়।'

'কিছু ভয় নেই, দিদি। মনে নেই সেই পাঞ্জাবি গণৎকারটাকে হাত দেখিয়েছিলাম। একশো বছর পূর্ণ হবার পরে তবে অসুখ-বিসুখের ভয় করব। কিন্তু আরও মিনিট পনেরো তো অপেক্ষা করতে পারি। সুমিতা ফিরে আসুক না।'

'সুমিতা! বাইরে ওর নেমন্তন্ন আছে,' সুজাতা কহিলেন। তারপর যেন ঈষৎ দ্বিধা করিয়া কুণ্ঠিতস্বরে কহিলেন, 'রোজই নেমন্তন্ন! রোজ পার্টি। এমন আমার ভয় করে। যাদের সঙ্গে ও মেশে সবাইকে আমার খুব ভালো মনে হয় না। যদি কিছু বলি, হেসেই উড়িয়ে দেবে; একটু জোর করে বললে কেঁদেই দেবে। একে নিয়ে আমি কি করি বল? অমিয়ের কাছে থাকলে তবু একটু শাসনে থাকতো। আমাকে কি ভ্রূক্ষেপ করে? বলে, দিদি, স্বাধীনতার জন্য তুমি স্বামীকে ছেড়েছ, তুমিই চাও অন্যের স্বাধীনতা খর্ব করতে। কথা শোন! স্বাধীনতার অর্থ কি যথেচ্ছাচার?'

'অমিয়বাবু শুধু দাদা নন, ব্যারিস্টারও বটেন।' সুপ্রকাশ রগড়ের সুরে কহিল, 'ওঁকে বলুন না, জটিল যুক্তি-তর্ক দিয়ে লিবার্টি আর লাইসেন্সের তফাৎটা বোনকে বুঝিয়ে দিতে!'

'তুমি ঠাট্টা করচ, কেমন?' সুজাতা তার দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'কিন্তু অমিয়কেই বলিনি মনে করো। সে বলে, ও আমা দ্বারা হবে না, দিদি। সুমি আমার কথা মোটেই শুনবে না। বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে' তোমার সঙ্গে থাকতে এসেচে। আমি কিছু বলতে গেলে ভাববে, বৌয়ের শেখানো। আমার যে নিজস্বতা কিছু আছে, তা ও স্বীকার করে না।—কাজেই দেখচ, সব ঝুঁকি একলা আমাকেই পোহাতে হবে। কিন্তু এ মেয়েকে শাসন করবে কে?'

সুপ্রকাশ ইহার কোনও জবাব দিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'চলুন, খেতে যাই।'

'ভূপতি চাটুয্যে ছেলেটা কেমন, একটু খোঁজ নিও। ওর রকম-সকম আমার ভালো লাগে না। শুনেচি, তিন বছর বিলেত ছিল, কিছু করে' আসেনি। অথচ দেখচি তো, দুহাতে টাকা ছড়াচ্ছে…'

'বড়লোকের ছেলের এই তো প্রিভিলেজ; কিছু না করবার জন্যও বিলেত যেতে পারে; কিছু না করে এলেও দুহাতে খরচ করতে পারে!' চলিতে চলিতে সুপ্রকাশ কহিল। 'তবে সম্প্রতি সে নিজেও ব্যবসা করে বহু টাকা উপার্জ্জন করচে!'

'কি ব্যবসা?' সোদ্বেগে সুজাতা প্রশ্ন করিলেন।

'ওয়র্ কনট্রাক্ট্। ব্যবসার রাজা।'

'ওঃ, এইবার বুঝতে পেরেচি', সুজাতা কহিলেন। 'এই জন্যই সে সুস্মিতাকে বলে, ভাবনা কি, সব সিনেমাওয়ালা আমার ট্যাঁকে; চান্স্ না-দিয়ে যাবে কোথায়?—ছেলেটাকে আমার একটুও ভাল লাগে না…'

'ফিশ্ মেওনাইস্! চমৎকার, দিদি। এ পদটা আমার সবচেয়ে প্রিয়', বলিয়া সুপ্রকাশ খাদ্যের দিকে মনোযোগ দিল।

তিন

শেষ-ট্রামের সময় হইয়া গেছে। বেশ তাড়াতাড়ি করিয়াই সুপ্রকাশ নামিয়া আসিতেছিল। এ-আর-পি-তে কামাফ্লিয়ারিং এবং পেট্রোল-র‍্যাশানিং-এর ফলে পূর্ব্বের মতো আর রাত একটা দেড়টা পর্য্যন্ত বাস্ চলে না। সাড়ে দশটায় ডিপো হইতে রাতের শেষ ট্রাম ছাড়ে। সুতরাং এই মধ্যরাত্রে স্বাস্থ্য-অর্জ্জন এড়াইতে হইলে এইটিই ভরসা।

'গুড্ নাইট্, বেস্ট অব নাইট্স্', 'স্লিপ্ ওয়েল, ড্রিম অব্ মি', 'গুড্ নাইট্, ব্লু এঞ্জেল', 'টা টা...'

গেটের ঠিক সমুখেই একটা হুড্-খোলা মোটর দাঁড়াইয়াছিল. সুপ্রকাশের চোখে কতগুলি ফেল্টের টুপি এবং কয়েকটি মেয়ের স্কন্ধের অংশ চোখে পড়িল। মোটরের এঞ্জিনের যাত্রারম্ভ-পূর্ব্ব আর্ত্ত-গর্জ্জন শোনা গেল। এবং পরক্ষণেই একটা সুগন্ধ ঝড়ের মতো সুনীলবেশা এক নারীমূর্ত্তি প্রায় সুপ্রকাশের উপর হুম্ড়ি খাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

'সুপ্রকাশবাবু!'

'কে? সুমিতা!'

'চিনতে পেরেছেন ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ', সুমিতা গলা হইতে স্কার্ফ খুলিয়া লইয়া কহিল। 'সে-দিন সিনেমাতে চিনেও চিনলেন না; আমার বন্ধুদের কাছে আমাকে অপদস্থ করে' ছাড়লেন...'

'ওপরে যাও, দিদি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।' সুপ্রকাশ গম্ভীর ভাবেই কহিল।

'দিদির ব্যস্ত! সবটাতেই ব্যস্ত। এত ব্যস্তের সম্মান করে' চলতে হলে ঘরের আসবাব হয়ে উঠতে হয়! তা আমি পারব না, কিছুতেই পারব না: এত তাড়াতাড়ি আপনি যাচ্ছেন কেন? কখন এসেছিলেন? চলুন, ফিরে চলুন, কিচ্ছু রাত হয়নি এখনও। অনেক গল্প করবার আছে; এত কথা আমার পেটের মধ্যে কিলবিল করচে। শীগ্গির চলুন, কিছুতেই আপনাকে যেতে দেব না...'

'আর দু মিনিট এখানে দেরি করলে এই ব্ল্যাক্-আউটে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ পর্য্যন্ত আমাকে হেঁটে যেতে হবে।'

'বেশ, হবে হবে', উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে সুমিতা সুপ্রকাশের হাত ধরিয়া টানিবার উপক্রম করিল: 'না যদি যেতে পারেন, থাকবেন;

এখানেই থাকবেন। একটা রাতও কি আপনি এখানে থাকতে পারেন না? ড্রয়িং-রুমের সোফাটায় একটু কষ্ট করলেই এঁটে যাবেন...'

'রাতের এই নিমন্ত্রণগুলো কি তুমি কিছুতেই এড়াতে পারো না?' সুপ্রকাশ উচ্ছ্বাসে কর্ণপাত না করিয়া কহিল।

'মানে?' সুমিতা সামান্য ঘাবড়াইয়া কহিল। 'ওঃ, পুরুষ-বন্ধু থাকা বুঝি আপনারা সহ্য করতে পারেন না? আপনাদের যখন মেয়ে-বন্ধু থাকে, তখন? এ আপনাদের হয় ঈর্ষা, নয় কুসংস্কার। আমি কোনওটারই তোয়াক্কা করিনে। আপনাদের পচা সমাজকে আমি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলতে পারি। আমি চাই আমার মত চলতে; আমি চাই স্বাধীনতা। যা আমার ইচ্ছে, আমি তাই করব; অন্যে আমার কাজে নাক-গলাতে আসবে কেন? রাতে বেড়ালেই যদি খারাপ হয়, তবে আপনারা রাতে বেড়ান কেন? মেয়ে বলেই বুঝি আমাদের দাবিয়ে রাখতে চান্...'

'না, তা চাই না', সুপ্রকাশ কহিল। 'আমি এবার শুধু যেতে চাই; ট্রামটা মিস্ করতে চাই না।'

'ওঃ, আমার সঙ্গে তর্ক করাকেও আপনি...মানে, আমাকে তর্কের যোগ্যও মনে করেন না।' সুমিতা চটিয়া কহিল। 'কেন, কেন আপনার এতো দেমাক? পাণ্ডিত্যের দেমাক, ব্যক্তিত্বের দেমাক, চরিত্রের দেমাক! এতো দেমাক! কেউ আপনার চোখেই পড়ে না: কারুর মন যদি ঝলমল করে' ওঠে, আপনি নাক বেঁকিয়ে বলেন, সেটা অসহ্য দুর্ব্বলতা। আরেক জনের আবেগকে বলেন, পচা উচ্ছ্বাস। এই নিন্ তার শাস্তি...'

মুহূর্ত্তে আপনার নগ্ন বলয়িত বাহু দুটি দিয়া সুপ্রকাশের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া সুমিতা তাঁহার ঠোঁটের উপর একটা গভীর সশব্দ চুম্বন আঁকিয়া

দিল। পলকে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পরক্ষণেই হি-হি করিয়া একটা সুউচ্চ শঠ হাস্য শোনা গেল; মোসাইকের সিঁড়িতে জুতার খুরের সুতীক্ষ্ণ শব্দ তুলিয়া একটা ঘূর্ণি বাতাসের মতো সুমিতা উপরে উঠিয়া গেল।

এক সেকেণ্ড মাত্র স্তম্ভিত রহিয়া সুপ্রকাশ রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। কোমল ঠোঁটের সুউষ্ণ স্পর্শের স্বাদের সঙ্গে মদের গন্ধ তাহার মুখের মধ্যে যেন একটা আবর্জ্জনার মতো মনে হইল। এই নির্ল্লজ্জ আচরণটা যে মাদকতারই ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সুমিতা কোন্ দিকে চলিয়াছে, ইহা অভ্রান্ত ভাবে সে দিকটাও নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

বারবার সুপ্রকাশ রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল; তবু সেখান চুম্বন এবং মদ্যের একটা মিলিত স্বাদ যেন অচল হইয়া মিলাইয়া রহিল। চমকাইয়া দেখিল, স্টপে না-থামিয়াই ট্রামটা আগাইয়া চলিয়াছে। সুপ্রকাশ চল্‌তি ট্রামেই লাফাইয়া উঠিল।

সুমিতা সুন্দরী মেয়ে। ঋজু সাবলীল দেহের সঙ্গে ওভেল ধরণের ঈষৎ লম্বাটে মুখটা মানাইয়াছে ভালো। গায়ের রং ধবধবে না হইলেও ফর্সা; সুর্ম্মার প্রলেপ ছাড়াও চোখ জোড়া দীর্ঘ ও কালো। রোম-উৎপাটন করিয়া কৃত্রিম রেখা টানিবার পূর্ব্বে ভুরু-যুগল আরও সুন্দর ছিল। পেলব বাহু ও সরু লম্বা আঙুলগুলি দেহের সুষমা বৃদ্ধি করে। কথা-বার্ত্তায়, আচার আচরণে, চোখের কোমল দৃষ্টিতে তাহাকে মাধুর্য্যময়ীই মনে হইবে। অথচ তার চরিত্রে এই অদ্ভুত খাদ মেশানো; উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য, চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব, প্রকৃতিগত অস্থিরতা এবং তাহাদের পরিবারের রীতি অনুযায়ী বহু বিলাসী বখাটে অকর্ম্মণ্য ছেলের সহিত অসঙ্কোচ-মিলনের সুযোগই

তার চরিত্রে একটা ওলোট-পালোটের সৃষ্টি করিয়াছে। নিজের পায়ের উপর না-দাঁড়াইয়া সে হাওয়ায় উড়িতেছে; হাওয়া যেদিকে জোর, অনায়াসেই সে সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

মেয়েটির গতির এই দুষ্টতায় সুপ্রকাশ কখনও কখনও পীড়া অনুভব না করিয়া পারে নাই। তাহার প্রতি সুমিতার যে কিছুটা দুর্ব্বলতা বিদ্যমান, একথাটাও সুপ্রকাশের কাছে গোপন নাই। নিজে সে কোনও দিনই কিন্তু তাহার প্রতি কোনও প্রকারে আকৃষ্ট বোধ করে নাই। সুমিতার মতো হাল্কা, সেণ্টিমেণ্টাল, দৃঢ়তাহীন মেয়ে তার পছন্দ নহে।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে নামিয়া সুপ্রকাশ কলুটোলার মোড়ের কাছে নিজের মেস্-টার দিকে আগাইয়া চলিল।

চমৎকার লাগে তার ব্ল্যাক-আউটের রাত। আলোর প্রাচুর্য্যে কলিকাতা যেন বড়ই প্রগলভা হইয়া উঠিয়াছিল। নিষ্প্রদীপ অন্ধকারের সংযম টানিয়া দিয়া তাহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছে। অন্ধকারের মতো এমন কোমল, এমন স্নিগ্ধ কিছু নাই। 'শুধু', ফুটপাথের উপর আরাম করিয়া শোওয়া ষাঁড়টার সহিত হোঁচোট খাইয়া সুপ্রকাশ নিজে নিজেই হাসিয়া কহিল, 'এইগুলিই যা একটু অসুবিধা!'

মেসের উপরতলার ছাদের উপরকার ঘরটি সুপ্রকাশের। খোলা ছাদের উপর কতগুলি টব জোগাড় করিয়া সে কিছু শৌখিন ফুলের গাছ পুঁতিয়াছিল। এখন অবশ্য উৎসাহ কমিয়া গেছে; উচিত-মত ইহাদের আর যত্ন নেওয়া হয় না। এই অবহেলা উপেক্ষা করিয়াও কতগুলি গাছ শীতের ফুল ফুটাইয়াছে।

'কে, সুপ্রকাশ! এসেছিস? এলি তো এতক্ষণে! এর মধ্যে কতবার আমি রেগে উঠেচি, প্রচণ্ড রেগে উঠেচি, জানিস? একবার

কাণ্ড দেখ! পাঁজির তিনশো পঁয়ষট্টিটা দিন, অথচ আজই এত দেরি! কেন, কেন রেগে উঠব না শুনি?'

কোলের উপরকার খাতাটা একদিকে সরাইয়া রাখিয়া উড্-পেন্সিলটা শাসনের ভঙ্গিতে উদ্যত করিয়া একটি রোগা ঢ্যাঙা, সুপ্রকাশের বয়সী ছেলে প্রায় থিয়েটারি ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

'না-রাগবার কোনই কারণ নাই', সুপ্রকাশ বিছানাটার উপর চিৎ হইয়া সটান্ শুইয়া পড়িয়া কহিল। 'কিন্তু দুজনের খাওয়াই পড়ে আছে কেন? তোকে নিয়ে মহা মুস্কিল হয়েছে; কতদিন তোকে বলব, কেউ কারুর জন্যে অপেক্ষা নয়; সময় হলেই খেয়ে নিবি। শ্রীধরের কি শ্রী-ই ফুটে উঠেচে দিন দিন!'

'তুত্তোর খাওয়া!' শ্রীধর প্রতিবাদের সুরে কহিল। 'খাওয়া চুলোয় যাক্। জীবনে এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেল, আর অনায়াসেই তুই বলতে পারলি খাওয়া…'

'ক্রস্-ওয়ার্ডের প্রাইজটা পেলি নাকি?' সুপ্রকাশ ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে প্রশ্ন করিল।

'আজ্ঞে না। দি আদার ওয়ান্। অবশেষে দেখা পেয়েছি, সত্যিই তার দেখা পেয়েচি। এবার আর সন্দেহ নেই; বলতাম না তোকে, এ হতেই হবে, জন্মমৃত্যুর মতো এ অবশ্যম্ভাবী। নইলে বাণ্ডিলটা ট্রামে ফেলেই তিনি নেমে পড়বেন কেন, আর এত লোকের মধ্যে তা আমারই চোখে পড়বে কেন? এ আলবৎ প্রিডেস্টিনেশন! স্পষ্টই বললেন, ধন্যবাদ, বড় উপকার করলেন। দেখতিস একবার যদি সেই কৃতজ্ঞ দৃষ্টিটা…'

'আমি খেয়ে এসেচি', সুপ্রকাশ কোনও উৎসাহ না দেখাইয়া কহিল। 'আর ঠাণ্ডা করিস না, খেয়ে নে।—প্রকৃত প্রেম এবার নিয়ে কতবার হলো?…'

'মানেটা কি হলো?' অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া শ্রীধর কহিল। 'প্রকৃত! কোন্‌টা প্রকৃত ছিল এর আগে শুনি? কিন্তু এবার নির্ঘাৎ; এতে আর সন্দেহমাত্র নেই। যুগযুগান্তরের পথ-চাওয়া মেয়ে! এইবার প্রকৃতই প্রকৃত। এ ঠাট্টা নয়; সব কিছুতেই মুখ-টিপে হাসিস না, আমারও দুয়েক সময়ে রাগ হয়।'

সুপ্রকাশ আড় চোখে তাকাইয়া দেখিল। উস্কোখুস্কো চুল, কদিন ধরিয়া দাড়ি কামানো হয় নাই; মুখের চেহারাটা বড় ক্লান্ত। ভাগ্য শ্রীধরকে বহুভাবে বঞ্চিত করিয়াছে। বি-এ পাশের পরই তার বাপ মারা যায়; এম্-এ পড়ার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হয়। বিধবা মা এবং দুটি অনূঢ়া বোনের দারিদ্র মাথায় আসে। তখন হইতেই তাহার ভাগ্যান্বেষণ শুরু হইয়াছে। ভাগ্য এখনও এড়াইয়া চলিতেছে। ভদ্র একটি চাকরি জোগাড়ের জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টা সুপ্রকাশ তাহাকে করিতে দেখিয়াছে। কিন্তু সহায়হীন, মুরুব্বিহীনের কাজ জোগাড় হয় না। সংখ্যাতীত দরখাস্ত, দিনের পর দিনের ধর্না, হাজার হাঁটাহাঁটি তাহার ব্যর্থ হইয়াছে।

ক্রমে শ্রীধরের আর উৎসাহ বজায় রহিল না; একটা গুরুভার অদৃষ্টবাদ তাহার সকল উদ্যম আচ্ছন্ন করিল: চেষ্টা করিয়া কি হইবে? ফলাফল যখন জানা আছে, তখন ইহাতে লাভ কি? একমাত্র অবলম্বন হইল, প্রাইভেট্ টুশানি। কিন্তু এগুলির স্থায়িত্ব কিছু নাই; আজ আছে তো কাল নাই। তবু ইহা হইতেই তাহাকে পোষ্যবর্গের জন্য দেশে টাকা পাঠাইতে হয়। দু এক মাস সে সম্ভবতঃ কাজকর্ম্মের সন্ধানেই কলিকাতার বাহিরে যায়; কাজ না-পাওয়ায় বা পছন্দ না হওয়ায় আবার ফিরিয়া আসে। এখানে সে সর্ব্বদাই সুপ্রকাশের অতিথি হিসাবে থাকে; পারিলে খাওয়ার খরচটা দেয়, না কুলাইলে দেয় না।

এই রকম একটা ব্যর্থ, অনিশ্চিত অবস্থা হইতেই তাহার এই দুইটা ব্যতিকের সৃষ্টি হইয়াছে। কামিনী ও কাঞ্চন, অর্থাৎ একজন প্রেয়সী ও তাহাকে ভরণ-পোষণ করিবার মতো টাকা একদিন সম্পূর্ণ অভাবিত ভাবেই নাকি তাহার কাছে উপস্থিত হইবে। ভাগ্যদেবতার নাকি ইহাই পরিহাস। ফলে, মেয়ে দেখিলেই সে প্রেমে পড়ে এবং লটারি দেখিলেই টিকিট কেনে।

'তবে ঘটনাটা একে একে শোন, সবটা খুলে বলি',' শ্রীধর দুই ঘণ্টা-ব্যাপী এক বিবৃতির জন্য আসন কাটিয়া বসিল। 'তার বাড়িটাও চিনে এসেচি...'

'তবে তো কাজটা অনেকটাই এগিয়ে এসেচিস', সাতঙ্কে সুপ্রকাশ কহিল। 'কিন্তু আগে আমি হাত-পা ধুয়ে আসি। ইতিমধ্যে তুই খেয়ে নে। বেশ আরাম ক'রে শুয়ে শুয়ে শুনব এখন...'

'আবার হাত-পা ধোয়া! যা, শিগগির যা। খেতে আমার এক সেকেণ্ডও না। খাওয়াটাই আজ গন্ধময় অসভ্যতা মনে হচ্ছে; স্থূল কিছু সহ্য করাই কষ্টকর হবে।'

বিছানায় আরাম করিয়া শুইয়া সুপ্রকাশকে সেই রোমাঞ্চকর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী শুনিতে হইল। ব্রতকথা শুনিতে হইলে হাতে দূর্ব্বা লইয়া শুনিতে হয়; তাহার পরিবর্ত্তে সুপ্রকাশ টবের গাছ হইতে ডাঁটশুদ্ধ একটা ফুল সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এই নিষ্ঠাও তার কাজে লাগিল না। বিজলি আলোটা লাল নীল সবুজ নানা রকম এলোমেলো রঙে মিশাইয়া যাইতে লাগিল; স্থির আলোটা গলিত বর্ণের একটা অস্পষ্ট চক্রের মতো হইয়া উঠিয়া বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল; একটা কোমল ধূসর ছায়া মগজের ভিতর কেবলই জড়াইয়া যাইতে লাগিল।

'কি হচ্চে, ব্যাপারটা কি হচ্চে শুনি?' সহসা সুপ্রকাশ একটা ক্ষীণকণ্ঠ শুনিল। 'দেড় দেড়টি ঘণ্টা ধরে আমি অনবরত বকে যাচ্ছি একটু সহানুভূতি পাবার জন্য, আর ইদিকে নাকের ডাকটা বেশ জোর করে' উঠেচে। দেখ্, সুপ্রকাশ, কখনও কখনও এমন কি আমারও রাগ হতে পারে। এর অর্থ টা কি শুনি?'

চম্‌কাইয়া চোখ মেলিয়া সুপ্রকাশ কহিল, 'বাকিটা কাল শুনব ভাই। বড্ড ঘুম পেয়েচে...'

'যথেষ্ট হয়েচে। কাল শুনে আঁর কাজ নেই।' শ্রীধর কহিল, 'খুব শিক্ষা লাভ করেচি। সহানুভূতি না থাকলে যা প্রকৃত, তা-ও প্রকৃত মনে হয় না। যা একটা জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার তার চেয়ে এক রাত্রের ঘুমই বড় হলো! দে দেখি, হাতটা বাড়িয়ে অক্সফোর্ডটা ছুঁড়ে দে...'

ঘুমের প্রাবল্যে এক সেকেণ্ডকাল সুপ্রকাশের কাছে অক্সফোর্ড ছুঁড়িয়া দেওয়া অসাধ্য কর্ম্ম মনে হইল। পরক্ষণে সে হাত-বাড়াইয়া টেবিল্ হইতে অক্সফোর্ড ডিক্সনারিটা সংগ্রহ করিয়া শ্রীধরের দিকে আগাইয়া দিল। কহিল, 'এত রাত্তিরে আবার ডিক্সনারি কেন, শুয়ে পড়।'

'শুয়ে পড়!' চটিয়া শ্রীধর কহিল, 'শুয়ে পড়লেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! বাসা-পত্তন করতে হলে অর্থের প্রয়োজন, সেটা খেয়াল আছে? পাতবি কি তোর দেবীর আসন, শূন্য ধূলায় পথের ধারে?—আজ সারা রাত জেগেই আমাকে ক্রস্-ওয়ার্ডের সল্যুশনটা বের করতে হবে। বারো হাজার টাকায় জীবনে একটা স্টার্ট পাওয়া যায়। শুনচিস্, নিচতলার সেই কম্যুনিস্ট ছোক্‌রা দু-দুবার তোর খোঁজে এসে...'

'কে, বিমল?' সুপ্রকাশ নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে কহিল।

'আর সেই কেরাণীবাবু...'

'বীরেশ্বরবাবু! এবার তর্কটা কি নিয়ে?'

'জানিনে, জানতে চাইও নে', শ্রীধর উমার সঙ্গে কহিল। 'কোনও অবান্তর কথার কচকচির মধ্যে আমি নেই। অনেক গভীরতর জিনিষের মধ্যে আমি পড়েচি, ওসব আমার কিছুতেই সহ্য হবেনা।...একটা মীমাংসার জন্য কাল ভোরবেলায়ই আবার আসবে বলে গেছে। আমিও শাসিয়ে দিয়েচি, যতবার ইচ্ছে আসুন, যে-বিষয়ে এবং যতক্ষণ ইচ্ছে তর্ক করুন, কিন্তু খবরদার, আটটার আগে নয়। তার আগে ট্যুশানিতে বের হতে পারব না...বাঃ, বেশ! ফোঁস্‌ফোঁস্ করে' নিশ্বাস ছাড়া হচ্চে! ঘুমোও, যত ইচ্ছে ঘুমোও। আমার আজ ঘুম আসবার মতো মনের অবস্থা নয়...'

চার

খবরের কাগজের অফিসের মতো এমন একটা ভালো ক্লাব পাওয়া দুর্ঘট! খবরের সাথে গুজব, কাজের সাথে গল্প এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পরিহাস এখানে সমান তালে চলে। এইজন্যই বোধ হয় দীর্ঘ সময়-ব্যাপী কাজ এত স্বচ্ছন্দে করা সম্ভবপর হয়! মামুলি অফিসের কড়াকড়ি এখানে নাই, অথচ নিয়মানুবর্ত্তিতার কিছু অভাব হয় না। কিরূপ নিয়মিত ভাবে পরের দিনের কাগজ হাতে পাওয়া যায় তাহা সুবিদিত, অথচ সংবাদপত্র অফিসের বাহিরের রূপ দেখিলে ইহা প্রায় অসম্ভব মনে হইবে।

সম্পাদক মোহিতবাবুর ঘরে বসিয়া সুপ্রকাশ এতক্ষণ এমন সব গোপনীয় চাঞ্চল্যকর খবর শুনিয়াছে যাহা কোনও নিউজ-এজেন্সিই

সরবরাহ করিতে পারে নাই, এবং মিত্রপক্ষ বা শত্রুপক্ষের মাত্র দু'চার জন প্রধান কর্ম্মচারি ছাড়া আর কারুর জানিবার কথাও নহে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, দেখা গেল, সে সব মূল্যবান গুপ্ত খবর এখানকার অন্তত অর্দ্ধ ডজন লোকের কাছে আর গোপন নাই। কিন্তু মুস্কিল এই যে, ইহাতে গর্ব্বিত বোধ করিবার উপায় নাই; অফিসের বাহিরে গিয়া একটু খোঁজ নিলেই জানা যায়, রাস্তার প্রতি দশ জন পথিকের মধ্যে অন্তত একজন তাহা আগে হইতেই জানে। অবিশ্বাসীরা ইহার নাম দিয়াছে, গুজব!

অবশেষে মোহিতবাবু কহিলেন, 'যথেষ্ট গুজব চট্‌কানো হয়েচে, এবার যাও, সবাই কাজে যাও, ছোক্‌রারা। ওহে, সুপ্রকাশ, কলকাতার এই ইভাক্যুয়েশন সম্বন্ধে আজ একটা সেকেণ্ড-লীডার লেখ দিকি। এ সম্বন্ধে রিপোর্ট মেলাই বের হচ্ছে; আরও দু'একটা সাম্পাদকীয় না লিখলে আর ভালো দেখায় না...'

'মাটি করেচে!' সুপ্রকাশ সাতঙ্কে কহিল, 'এ-নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা! আমি এর উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারব কি? বরঞ্চ অবিনাশবাবু যদি লেখেন...'

সহকারী-সম্পাদক অবিনাশবাবু প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, 'না না, ওসব আমার আসে না। জ্বলন্ত যে-কোনও সমস্যা জ্বালাময়ী ভাষাতে লিখতে দাও, জুলুমবাজ পুলিশের কর্ম্মচারির মাথা উড়িয়ে দিতে দাও, ব্যুরোক্রেসির অন্ত্যেষ্টি...'

'এটা তুমিই লেখ, সুপ্রকাশ,' অবিনাশবাবুর ক্রমবর্দ্ধমান উচ্ছ্বাসকে আর বাড়িতে দিবার সুযোগ না দিয়া মোহিতবাবু কহিলেন। 'এ তোমার উপযুক্ত বিষয়। সারাক্ষণ তো ইভাক্যুয়ি দেখবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও...'

'কিন্তু ভীত জনতার থেকে', সুপ্রকাশ যথাসাধ্য গম্ভীর ভাবেই

কহিল, 'ইম্পিরিয়ালিস্‌ম্‌, মুসলীম্‌ লীগ এবং পূর্ণ-স্বাধীনতাতে পৌঁছুতে সুবিধা করতে পারব কি?'

'তা এসব কিছু কিছু না ঢোকালে চলবে কেন?' মোহিতবাবু খদ্দরের পাঞ্জাবির প্রান্ত দিয়া চশমার কাচ মুছিয়া কহিলেন। 'আমাদের কাগজের পলিসি অনুসরণ করে' তো লিখতে হবে! একটা মর‍্যাল তো চাই।'

'একটু যদি রগড় করি আপত্তি আছে কি?'

'ওরে সর্ব্বনাশ!' মোহিতবাবু সাতঙ্কে কহিলেন, 'মানুষের এমন বিপদেও রগড় করে! আমাদের পপুলার পেপার; সাধারণের এমন দুর্দ্দিনে সহানুভূতি দেখাতে হবে। ক্ষেপেছ! ঠাট্টা-পরিহাস চলবে না। ঐ তোমার এক বাতিক। ভালো হোক, মন্দ হোক, মানুষে যা করে তাই মেনে নিতে হবে। ঠাট্টা করতে হয়, কর রেল-কোম্পানীকে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে, নয় দিল্লীর নন্দদুলালদের। তবে সাবধান, ডিফেন্স অব্‌ ইণ্ডিয়া রুলস্‌ বাঁচিয়ে···'

মোটাসোটা মানুষ, পরিপূর্ণ মুখ, গাল দুটো একটু কোলা কোলাই বলা চলে। বেশ সুপুষ্ট এক জোড়া গোঁফ জগতের সব কিছুর প্রতি অবহেলা জ্ঞাপন করিতেছে। মোহিতবাবু পচিশ বৎসর ধরিয়া সাংবাদিকতা করিতেছেন; পনেরো বৎসর ধরিয়া তিনি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৈনিক কাগজের প্রধান সম্পাদক। কাগজের স্বার্থ কিরূপে বৃদ্ধি পায়, জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের পক্ষে অপরিহার্য্য নীতি কি, এসবের পক্ষে তাহার বিচারকে প্রায় অভ্রান্ত বলা চলে।

'একটু হাল্কা করে' লিখতে পারি তো? সেকেণ্ড-লীডার বলেছিলেন না?'

'তা লেখ, কিন্তু বেশি নয়। সেকেণ্ড-লীডারই হোক, আর যাই হোক, আমাদের দেশে বেশি হাল্কা লেখা চলে না। আমরা, তোমাকে

বলতে কি, একটু গিয়ে জ্বালাময়ী ভাষা, আর এই অবিনাশ যাকে বলে 'জ্বলন্ত' সমস্যা, তারই বেশি পক্ষপাতী।'

নিজের পার্টিশান-ঘেরা খুপ্‌রিটাতে আসিয়া সুপ্রকাশ সম্পাকীয় লিখিতে বসিল। একটা জ্যান্ত ব্যাপারকে তত্ত্বে পরিণত করা একেই কঠিন কাজ; তার উপর প্রাণ-ভয়ে পলায়নের মধ্যে যদি সাম্রাজ্যবাদ, ব্যুরোক্রেসি, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রভৃতি ঢুকাইতে হয় তবে তো ব্যাপারটা রীতিমত জটিল হইয়া ওঠে। অথচ সম্পাদকীয়তে কংক্রিটের স্থান নাই; প্যাসেঞ্জার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দেবেন চাটুয্যেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও ঢুকাইতে পারা যাইবে না। অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট চিন্তা না থাকিলে সম্পাদকীয়ের গৌরব থাকে না। অথচ বারবার ইভাক্যুয়েশনের নানাদিকের নানা চিত্র মনের মধ্যে উকিঝুঁকি মারিয়া বেড়াইতেছে। 'সাংবাদিক না হয়ে আমার বোধহয় ঔপন্যাসিক হওয়াই উচিত ছিল।' মনে মনে সুপ্রকাশ বলিল, এবং ড্রয়ার খুলিয়া শাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বাহির করিল।

'এর একটা প্রতিকার আপনাকে করতেই হবে, স্যার। খবরের কাগজের অফিসে কাজ করব; দুনিয়ার সবার অভাব-অভিযোগ ছেপে মরব, আর নিজেদের ওপর যদি এমনটা জুলুম হয় তবে কি চুপ করে যেতে হবে? বলুন, আপনি বলুন স্যার, সকলের নালিশ জানাবার জায়গা পাওয়া যাবে, আর আমাদের নালিশ জানাবার সময়ই জায়গার অভাব!'

প্রুফ্‌-রীডার নকড়িবাবুর সারাটা মুখ একটা ন্যায্য প্রতিবাদের উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। চোখের নিকেল-ফ্রেমের চশমা নাকের ডগায় আসিয়া আটকাইয়া আছে; চুল চিরুণীর সংস্পর্শে বঞ্চিত, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি কদম-ফুলের কেশরের মতো কাঁটা দিয়া

আছে। গায়ে শাদা ফতুয়া, ধুতির কোঁচাটা সমুখ দিকে দোভাঁজ করা। পায়ে তালতলার চটিটা বিবর্ণ ও বহুতালিসংযুক্ত।

ফাউন্টেন পেন্‌টা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া সুপ্রকাশ কহিল, 'ব্যাপার কি, নকড়িবাবু? আপনার আবার নালিশ কি? কোথায় নালিশ জানাতে চান? জায়গা দিয়ে কি হবে?'

'সম্পাদককে একটা চিঠি লিখতে চেয়েছি, স্যার, একটা চিঠি লিখতে চেয়েছি।' নকড়ি জানাইলেন। 'স্রেফ্ এই। আর কিছু নয়। অথচ সব্-এডিটর করালীবাবু বেমালুম বলে দিলেন, এই হপ্তাটা আর হবে না, মোশায়, এক গাদা চিঠি জমে আছে, জায়গা করতে পারব না…'

'হয়েচে কি?' এত নিকটবর্ত্তী সম্পাদককে চিঠি লিখিবার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সুপ্রকাশ প্রশ্ন করিল।

'স্যার, সেইটেই তো আপনাকে বলতে এসেচি,' নকড়ি কহিলেন। 'এই এত বড়ো খবরের কাগজের অফিসে গরিব কর্ম্মচারিদের সুখ-দুঃখের কথা আর কে শোনে বলুন? তারা দেশ-বিদেশের দুঃখু-দুর্দ্দশা ঘোচাবার জন্যই মেতে আছেন। আমরা মরলুম কি বাঁচলুম, আমাদের ওপর কে জুলুম-জবরদস্তি করলে, কে তার খোঁজ নিচ্ছে…অথচ বাইরের লোকের ওপর এমন জুলুমটা হলে আমাদের কাগজেই একটা হৈ-চৈ পড়ে যেত।'

'আপনি খুব উত্তেজিত হয়েছেন।' সুপ্রকাশ ঈষৎ অধৈর্য্য হইয়া কহিল। 'নিশ্চয়ই আপনার অভিযোগের কারণ আছে। কিন্তু সেটা কি, তা এখনও বলেন নি।'

'স্যার, ছেলেটাকে নিয়ে গিয়েছিলুম মেডিক্যাল কলেজে। শার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্ত্তি করাতে। অ্যাপিণ্ডিসাইটিশের ব্যথায় নীলবর্ণ হয়ে উঠেচে; থেকে থেকে বিছনা থেকে উঠে দেওয়ালে গিয়ে মাথা

ঢুকচে। পাড়ার ডাক্তার বললেন, নিয়ে যাও এক্ষুণি, মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে ভর্ত্তি করে দাও; এক্ষুণি অস্ত্র না-করালে বাঁচান দায় হবে···তা নিলে কি? নিলে না; বেমালুম বলে দিলে, এ, আর পি কেসের জন্য বেশির ভাগ সীট্ রিজার্ভ; জায়গা নেই···'

এইবার সুপ্রকাশ অবহিত হইয়া উঠিল। নকড়িবাবু অভিযোগ করিতে হইলে একটু বেশি বাক্যব্যয় করেন; এজন্য সময় সময় বিরক্ত বোধ না করিয়া উপায় থাকে না। কিন্তু অনাবশ্যক অভিযোগ করা তাহার স্বভাব নহে, ইহাও সুপ্রকাশ বেশ জানে। ছাপাখানার এই নীরব কর্ম্মীর দল কিরূপ নিষ্ঠার সহিত অত্যন্ত দরকারী কাজ একান্ত অবহেলার মধ্যে যথোচিত ভাবে সম্পন্ন করিয়া যায়, তাহা সুপ্রকাশের অবিদিত নহে।

চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া বিস্মিত উদ্বিগ্ন দৃষ্টিটা নকড়িবাবুর অভিযোগ ও বেদনায় বিকৃত অসুন্দর মুখটির উপর রাখিয়া সুপ্রকাশ কহিল, 'ভর্ত্তি করলে না?'

'না স্যার। তবে আর বলচি কি।' নকড়িবাবু এইবার সহানুভূতির সুর টের পাইয়া অনেকটা সহজ হইয়া কহিলেন। 'আধ-মরা ছেলেটাকে আশা দিয়ে নিয়ে গিছ্‌লুম; বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলুম···'

'বললেন না কেন, ব্যথাতে ছেলেটা মরে যাবার উপক্রম হয়েচে?'

'তা আর বলিনি, স্যার! বলেছি, আপনার পা দুটি ধরি ডাক্তারবাবু, এরে বাঁচান। ব্যথায় আত্মহত্যে করতে চাইচে। আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। হলো না। মুখ খিঁচিয়ে বললেন, জায়গা নেই তো একে কি মাথার ওপরে রাখব, আহাম্মক কোথাকার!—তবেই বুঝুন, কেন উত্তেজিত হয়েচি, নিজের কাজ ফেলে কেন আপনার কাছে ছুটে এসেছি···'

'কি সর্বনাশ!' আশঙ্কায় সুপ্রকাশের মুখটাই বিবর্ণ হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। 'তারপরে? আর কোনও হাসপাতালে নিয়ে গেলেন না কেন? এ আর পি কেসের বেড-এর দরকার না হতেই এমন কড়াকড়ি! ওরাও দেখচি, বোমার ভয়ে যারা পালাচ্ছে, তাদের মতোই আতঙ্কগ্রস্ত...'

'আজ্ঞে, ঠিক আতঙ্ক নয়, স্যার,' নকড়িবাবু কহিলেন, 'এরাও রেলের বাবুদের মতো, ট্যাক্সিঅলা রিক্সঅলার মতো, সুযোগ বুঝে পকেটভারি করতে চাচ্ছেন। কিন্তু দু'দুশো টাকা, স্যার, আমি দিই কি করে? এ কি আমার সাধ্য?'

'টাকা! টাকা কেন?' সুপ্রকাশ সবিস্ময়ে কহিল।

'আজ্ঞে, ছেলেটাকে টেনেটুনে হাসপাতালের আফিস থেকে মাত্র বেরিয়েচি, অমনি এক ছোক্‌রা-ডাক্তারবাবু পিছন-পিছন এসে উপস্থিত হলেন। বল্লেন, দুশো টাকা খরচা করতে পার তো ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি। শার্জারি কেস, এ ঢোকান কি চাট্টিখানি কথা।—আর নিজের ছেলের জীবন, এর জন্য দুশো টাকা খরচা করতে ইতস্তত করচ, কি রকম বাপ তুমি? বল্লুম, ডাক্তারবাবু, ধন্যবাদ, স্যার। গরীবের ছেলের জীবনের দাম দুশো টাকাও নয়, তা কি জানেন না? বাড়িতে গিয়ে বেশ নিশ্চিন্দিতে মরতে পারবে।...তবেই বুঝচেন, স্যার সুপ্রকাশবাবু, এ আর পি নয়, বেডের অভাব নয়, জুলুম, গরিবের ওপর জুলুম। যার খুঁটির জোর নেই, তার কিছু নেই।—তবেই বলুন, স্যার, রাগব না? কাগজে একটা চিঠি লিখে এমন জুলুমের কথা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে চাওয়া কি আমার বেয়াদপি, না অন্যায় আব্দার? অথচ করালীবাবু বেমালুম বলে বসলেন...'

'আমি এর কিছু একটা ব্যবস্থা করব, নকড়িবাবু', সুপ্রকাশ কহিল, 'এক্ষুনি যা হোক কিছু করব। আপনি নিচে যান্...'

'আজ্ঞে একটা সম্পাদকীয় লিখবেন কি?' কৃতজ্ঞতায় নকড়ি বাবুর দুর্ব্বল চোখদুটিতে প্রায় অশ্রু আসিয়া জমা হইবার উপক্রম হইল। 'দিন স্যার একটা কড়া করে লিখে; আপনার কলমে জোর আছে, খুব কড়া করে কিছু লিখে দিন। আমার এতে উপকার হবে না, জানি স্যার, কিন্তু ভবিষ্যতে গরিব দুঃখীর...'

'সেটা পরে বিবেচনা করা যাবে।' সুপ্রকাশ কহিল। 'সম্প্রতি আপনার ছেলের যাতে কিছু উপকার হয়, তার চেষ্টা করচি।— এক্ষুনি সমস্ত ব্যাপারটা সার্জ্জিক্যাল ওয়ার্ডের আর-এম্-ও-র কাছে টেলিফোন করে জানাচ্ছি। আপনি নিচে যান্...। আশা করি, এতেই আপনার কাজ হয়ে যাবে...'

নাগরিকদের আতঙ্ক, নাগরিকদের প্রয়োজনের গুরুত্ব কত লোকের কত সুযোগ করিয়া দিয়াছে, সুপ্রকাশ আজ সম্পাদকীয়তে লিখবে কি সে কথা? অন্যের বিপদ কত বুদ্ধিমানের কাছে একান্ত তৃপ্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সকলের কথা লিখিবে কি? তাহাদের পরিচয় যতটা সুপ্রকাশের জানা আছে, অন্যদেরও জানাইয়া দিবে কি? সরকারী হাসপাতালের ঘটনাটা আজ অবশ্য বলা যাইবেনা; নকড়িবাবুর ছেলেকে অবিলম্বে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইবে, এই প্রতিশ্রুতির পরিবর্ত্তে সার্জ্জিক্যাল ওয়ার্ডের রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল অফিসারের অনুরোধটা আজ সে রক্ষা করিবে। কিন্তু যেখানে যে দুরাত্মা সমাজের বিপদের সুযোগ কাজে লাগাইতেছে, যেখানে যে দুর্জন দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে, যেখানে ঔদ্ধত্য মানুষকে অপমান করিতে সামান্য দ্বিধা করে না, সেখানে চিরদিন তাহার লেখনী তরবারির মতো উদ্যত হইয়া রহিবে। ইহাই তাহার সাংবাদিক হইবার গৌরব ও গর্ব্ব; ইহারই জন্য দারিদ্র্য অর্থপূর্ণ মনে হয়।

'আরে এই যে সুপ্রকাশ। সেই কবে এসেছিলাম. ঘর খুঁজে
জে হয়রাণ। তারপর আছিস্ কেমন বল ?'

পাৎলা, কালো, মধ্যবয়স্ক একজন ভদ্রলোক দরজাটা সম্পূ
লিয়া দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং শূন্য একটা চেয়ার
গন্ধে টানিয়া লইলেন।

সুপ্রকাশ কেবল সম্পাদকীয়টা আরম্ভ করিয়াছিল, চোখ উঠাইয়া
হিয়া দেখিয়া কহিয়া উঠিল, 'বিপিনদা যে! আসুন! কতকাল
র! ইতিমধ্যে দেশ কতটা উদ্ধার করলেন, না বেঙ্গল কেমিক্যালের
াজেই মেতে আছেন ?'

বিপিনবাবু চেয়ারে বসিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, 'তোদের মতো
ক্যবাগীশ যুবকই যেখানে বেশির ভাগ, সেখানে সাধ্য কি দেশ
াধীন হয়। কি মিন্‌মিনে সম্পাদকীয় লিখিস! ঠেঙিয়ে না তাড়ালে
মানেরা এমন রাজভোগ ছেড়ে যাবে ভেবেছিস? বড় বড় প্রবন্ধ
খে মরছিস কেন? ওতে কেউ কোনও দিন ভয় পায়? পারিস
া ছেলেগুলিকে ক্ষেপিয়ে দে। অহিংসা নয়, মনে হিংসা ঢুকিয়ে দে,
ড়' কেড়ে নেবার জন্যে যাতে তৈরি হ'তে পারে তার ব্যবস্থা
র। কি প্যান্‌পেনে প্রবন্ধ লিখিস তুই। এসব কি আমাদের
ালো লাগে!'

বিপিন চাটুয্যে বোমা-আমলের বড় পাণ্ডা। পূর্ববঙ্গের বিপ্লব-
াদী অনুশীলন সমিতির যাহারা প্রাণস্বরূপ ছিলেন, তিনি তাহাদের
ন্যতম। ছেলেবেলায় কি শ্রদ্ধা ও ভয়ের সঙ্গেই সুপ্রকাশ ও
াহার সঙ্গীরা ইহাদিগকে দেখিত। ইহাদের সম্বন্ধে বোমা, পিস্তল,
দেশী-ডাকাতি, সাহেব-আক্রমণ প্রভৃতি কত চাঞ্চল্যকর সংবাদই
াহারা শুনিয়াছে এবং শুনিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। নিজেদের
তরকার বীরত্বের তৃষ্ণা যেন ইহাদের অসমসাহসিক ঘটনাবলীর

বিবৃতি ও কিম্বদন্তী শুনিয়া আংশিক ভাবে তৃপ্ত হইত। তারপর ইহারা যখন গীতা, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, বীরবাণী প্রভৃতি বই লইয়া সুপ্রকাশদের ন্যায় ছোটদের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য উপস্থিত হইল, তখন তো তাহারা রীতিমত গর্ব্বিত বোধ না করিয়া পারে নাই। মধ্যরাত্রে মা-কালীর পা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গের শপথ, পিস্তল ও বোমা হাতে আসিবার সম্ভাবনা একদিন তাহাদে কৈশোর কল্পনায় বড় চাঞ্চল্যকর হইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল। কত বড় মনে হইত তখন বিপিনদা ও তাহার সঙ্গীদের!

আর আজ? মনে করিতেও সুপ্রকাশের মধ্যে একটা অপরাধী সংকোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। নতুন পরিপ্রেক্ষিতে, সন্ত্রাসবাদের অসাফল্য ও ইহার গঠন-মূলক পরিকল্পনার অভাবের দরুণ অতীতে যাহা গৌরবজনক মনে হইত, বর্ত্তমানে তাহা প্রায় করুণ হাস্যকর মনে হয়। যাত্রাদলের রাজার সঙ্গে কোথায় যেন বিপিন-দার একটা সাদৃশ্য আছে। অথচ ইহাদের আত্মত্যাগ, আদর্শ-নিষ্ঠা ও দেশপ্রীতি যে সবচেয়ে উঁচুদরের ছিল তাহাও সুপ্রকাশ অস্বীকার করিতে পারে না।

'তুই হাসিস আর যাই করিস', বিপিনবাবু কহিলেন, 'আর একবার আমরা উঠব, এটা তুই দেখে নিস্! জোর উচ্ছেদ করতে হলে চাই জোর। অহিংসা-তত্ত্বে মেতে সারাটা দেশ যে বোষ্টম হয়ে যাচ্ছে, এতে দেশেরই ক্ষতি হচ্ছে, একথাটা তোরা কবে বুঝবি, তাই ভাবি। এই বলে দিনুম, আবার আমাদেরই তোদের ডাকতে হবে...'

'আবার যখন আপনারা যুবক হয়ে ফিরে আসবেন', সুপ্রকাশ মিটিমিটি হাসিয়া কহিল, 'সম্ভবত কম্যুনিস্ট হয়ে ফিরে আসবেন অনাবশ্যক পট্‌কা আর ছুঁড়বেন না, বরঞ্চ রাশিয়ার পায়ে পায়ে

ল একটা নতুন ব্যবস্থা আনবার উদ্যোগ করবেন। দেখছেন না, াপনাদের দলের কত লোক এরই মধ্যে কম্যুনিস্ট হয়ে গেছে…'

'কিন্তু দেশের স্বাধীনতা? সেটাই যে সবার আগে দরকার। সে িকটা কি বাদই পড়ে যাবে!'

'না, তা কেন। দুটোই একসঙ্গে হবে—স্বাধীনতা এবং সাম্য।'

'উপায়?'

'এতেই তো কিছু মুস্কিলে ফেললেন। এরা কি ঠিক করেছেন. ানিনা। হয়তো মস্কো থেকে এখনও ঠিক হয়ে আসেনি।'

'আর কংগ্রেস!' বিপিনবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন।

'শুধুমাত্র স্বাধীনতা চেয়ে আহাম্মুকের একশেষ হচ্ছে।' সুপ্রকাশ গ টিপিয়া হাসিয়া কহিল।

চা ও কেক্-দ্বারা আপ্যায়ন করিবার পর সুপ্রকাশ কহিল, াক্‌গে রাজনীতি। কেমন আছেন বলুন!'

পকেট হইতে বিড়ি ও দেশলাই বাহির করিয়া বিপিনবাবু পানের ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কহিলেন, 'না, ভাল াথায়। কেমন একটা দুর্বলতা টের পাচ্ছি; সারাক্ষণই ভারি যেন রিশ্রান্ত মনে হয় দেহটা। আর দেহটারই দোষ কি বল, এর উপর ম দৌরাত্ম্যি করেচি!—তা ছাড়া, কিছুদিন ধরেই একটা খুসখুসে াশি ধরেচে, কিছুতেই যাচ্ছে না। যাক্‌গে, অনেক দিন তো কাটান াল এই পৃথিবীটাতে; কিছু তো করতে পারলাম না, শুধু াফালাফিই সার হলো। এবার জিরুতে পারলে বাঁচি…'

'তারপর, বৌদি? বৌদি কেমন আছেন?'

'গরিবের সংসারে খেটে খেটে সারা হচ্চেন। কেন যে দুঃখ দেবার ন্য এঁকে ঘরে এনেছিলাম।—যাস্ একদিন, সুপ্রকাশ। দেখা করে'

আসিস। কবে একদিন বলছিলেন, সুপ্রকাশ ঠাকুর-পো আজকাল আর আসেন না...'

'নিশ্চয়ই যাব। বলবেন, বৌদিকে, শীগগিরই একদিন যাব', সুপ্রকাশ লজ্জিত হইয়া কহিল। 'নানা আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে মেতে থাকি, কত কর্ত্তব্য যে করা হয় না।'

বিপিনবাবু উঠিয়া পড়িলেন। একটু যেন দ্বিধা করিয়া কহিলেন, 'কি সম্পাদকীয় লিখচিস রে, সুপ্রকাশ।'

'বোমার ভয়ে শহরত্যাগের কথা।'

'একটু জোরাল, মানে, বেশ একটু তাতিয়ে তোলার মতো কখনও সখনও কিছু লিখতে পারিস না?' বিপিনবাবু নির্দ্দেশ-দান করিতে যেন সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। 'একটা খোলা-সংঘর্ষের জন্য দেশটাকে তৈরি করতে পারিস না? দেখ না, চেষ্টা করে'. কংগ্রেসকে সহিংস হোক, অহিংস হোক, একটা সংগ্রামের জন্য রাজি করাতে পারিস কিনা। তবে যে নিভে যাবার আগে একবার শেষ বারের মতো জ্বলে উঠতে পারি...'

'মাথাটা একটু নিচু করে বিপিন-দা', সুপ্রকাশ কহিল। 'নইলে দরজার উপরকার কাঠের সঙ্গে টোক্কর খাবেন।'

পাঁচ

বীরেশ্বরবাবু কোণা-ছেঁড়া চামড়ার ছোট স্যুটকেসটায় গোটা দুই ধুতি-জামা, একটা কাঠের পুতুল, এক শিশি কুইনিন, এবং সম্ভবতঃ শেষোক্তের প্রতি-বিষ হিসাবে এক পোঁট্‌লা মিছ্‌রি ভরিয়া ফেলিলেন চারটার আগে আর লোক্যাল গাড়ি নাই; সুতরাং প্রতি শনিবারই তাহাকে বাধ্য হইয়া ঘণ্টা দুয়েক সময় কলিকাতাতে নষ্ট করিয়া যাইতে হয়।

পদধ্বনি

এই বিরাট শহরটা একটা মরুভূমির মতো। ইহার কোথাও এক কণা স্নেহ এবং সহানুভূতি নাই; আত্মীয়তা দেখাইবার মতো কোনও লোক নাই। শুধু অপরিচিত জন ও যানের অবিরত স্রোত, পণ্যের এবং বিপণির গর্ব্বিত সমারোহ, মাধুর্য্যহীন কর্ম্ম-স্থলগুলিতে কর্ম্মচক্রের অবিরাম ঘূর্ণন। এই অনাত্মীয় আবেষ্টনে মন হাঁপাইয়া ওঠে; কবে শনিবার আসিবে, কবে এই ইটের মরুভূমি হইতে পাড়া-গাঁয়ের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে, নিজের পরিজন ও পরিচিতের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন; এজন্য মন উন্মুখ হইয়া থাকে। এই মহানগরী এক মহা-বিলাসিনীর মতো, অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে ইহা প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া দেয়; কিন্তু কোনক্ষেত্রেই হৃদয়ের সঙ্গে ইহার সংযোগ থাকে না। ইহার চেয়ে গাছপালায় মর্ম্মরিত, অন্ধকারে সুকোমল, জোৎস্নায় রৌপ্য-স্নিগ্ধ, প্রসাধন-অপটু গ্রাম কত মধুর!

'ওঃ, আজকে শনিবার বুঝি? চমৎকার ব্যবস্থা! শনিবার হলে গাঁয়ে না ছুটে আর উপায় নেই। আর এই অব্যবস্থাকে অনিবার্য্য ভেবে বছরের পর বছর তা মুখ বুজে সহ্য করে' যাচ্ছেন! তবু একবার প্রতিবাদ করতে উঠে দাঁড়াবেন না।'

'কে, বিমল? বেশ দিয়েছ বক্তিমেটা', বীরেশ্বরবাবু বাক্স হইতে চোখ উঠাইয়া কহিলেন। 'আরে সর্ব্বনাশ! এ কি! হাতে এ রকম ব্যাণ্ডেজ কেন? মচ্‌কে-টচ্‌কে যায় নি তো?'

বিমল এই ঘরেরই অন্য সরিক। বছর কুড়ি-একুশের শ্যামবর্ণ একহারা ছেলেটি। তীক্ষ্ণ নাক, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, উৎসাহের প্রাচুর্য্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সকল ভঙ্গিতে প্রকাশমান। এর মধ্যে অবশ্য তাহার জিহ্বাটাই সর্ব্বাপেক্ষা সচল।

স্যাণ্ডাল-জোড়া দেওয়ালের একদিকে ছুঁড়িয়া দিয়া সে কহিল, 'গিয়েছে। এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। মেডিক্যাল কলেজ থেকে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নিয়ে এলুম। সবই আপনাদের অহিংসার বিভূতি! হাতটা মচ্‌কে দিয়ে অহিংস ভাবে আত্মীয়তা জ্ঞাপন করা হলো। অথচ এই অহিংসার বড়াই করতে আপনারা লজ্জা বোধ করেন না।—হাঁক দিন তো রামকেষ্টকে, এক কাপ চা দিয়ে যাক্। ক'দিনের ধাক্কায় পড়লাম কে জানে; অথচ পার্টির একগাদা কাজ জমে আছে; শীগগির না-সারলে ক্ষতি হয়ে যাবে।—তা আপনাদের কংগ্রেসের তাতে তো সুবিধেই হলো: একটা অব্যবস্থা কায়েমি রাখতে পারলে…'

'কিন্তু হাত-মচ্‌কালে কি করে হে, তাই তো বললে না', বীরেশ্বরবাবু দরজার কাছ হইতে হাঁকিয়া চায়ের ফরমাস দিয়া আসিয়া কহিলেন, 'শুধু থেকে থেকে কংগ্রেসকেই গালাগালি করচ…'

'একশো বার গালাগালি করব। করব না কেন?' বিমল কহিল, 'আপনাদের কংগ্রেস, বুর্জোয়ার কংগ্রেস, মিল-মালিকের কংগ্রেস, যাকে নিয়ে আপনারা ভাবে গদগদ হন, সেই কংগ্রেসই আমার হাত মুচ্‌কে দিয়েছে…'

'বল কি হে, ছোকরা!' বীরেশ্বরবাবু অবাক হইয়া কহিলেন;

'আলবৎ কংগ্রেস! আপনাদের অহিংস কংগ্রেস!' বিমল উত্তেজনার সঙ্গে কহিল। 'দুটো ক্লাসের মধ্যে ছুটি ছিল। কথায় কথায় লেগে গেল, কংগ্রেসের তাঁবেদার ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের লড়াই। এমন 'সিলি' কথা বলে, কাঁহাতক সহ্য হয় বলুন মশায়? দিলুম একখানা ঘুষি বসিয়ে। ব্যস্, যত ব্যাটা ভীরুর বাচ্চা, একে একে লড়াই করতে আসবার সাহস নেই, দল বেঁধে সব ঝাঁপিয়ে পড়ল। দলে এখনও ওরাই ভারি। অহিংসা ভুলে মেরে ভিতরকার

বুর্জ্জোয়া ব্যুরোক্রাটই বেরিয়ে এল।—কুছ্‌পরোয়া নেই। হাত ভেঙেচে, আবার জোড়া লাগবে। কিন্তু কংগ্রেসের প্রেস্টিজে যে ঘা মেরে এলাম…'

'কিন্তু আগে তুমিই ঘুষি মেরেছিলে বললে না?' বীরেশ্বরবাবু তর্কজাল ঠিকমত অনুধাবন করিতে না পারিয়া কহিলেন।

'তা মেরেছিলাম, মেরেছিলাম। তা বলে কংগ্রেস-আদর্শ এমন করে' বিসর্জ্জন দিতে হবে?' বিমল চটিয়া কহিল। 'পুলিসের হাতে মার খেয়ে কংগ্রেস-কর্ম্মী কখনও মার ফিরিয়ে দেয়? তবে আমাদের বেলায় নতুন ট্যাকটিকস্‌ কেন? ভেবেছে, আমরা দুর্ব্বল, তাই অনায়াসেই আমাদের বেলায় অহিংসা-নীতি বিসর্জ্জন দেওয়া চলে। দাঁড়াও না বাছাধনেরা, সকল ছাত্র-প্রতিষ্ঠান আমরা ক্যাপ্‌চার করব, সকল সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে হাত করব, আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জোরে জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করব। তখন দেখি তোমাদের এই দেমাক্‌ থাকে কোথায়? পেটে খেলে তবে পিঠে সয়। কংগ্রেসের একটা ইকনমিক্‌ প্রোগ্রাম নেই, দেশ-প্রেমের ফাঁকা উচ্ছ্বাস চট্‌কে কতদিন আর ব্যবসা চালাবে…'

'সুপ্রকাশবাবু কি একটার নাম বলছিলেন না সেদিন?' বীরেশ্বরবাবু স্মৃতির সাহায্য লইলেন। 'কংগ্রেসের ইকনমিক প্ল্যানিং কমিটি না কি নাম বললেন? জওহরলাল নেহেরু যার সভাপতি…'

'সুপ্রকাশদার কথা ছেড়ে দিন।' বিমল কহিল। 'কংগ্রেসের আওতায় বড় হয়ে উঠেচেন, তার যুক্তির প্রভাব কিছুতেই এড়াতে পারছেন না। নেহাৎ ওর ব্যক্তিগত মতামত জানি বলে, নইলে বাইরে থেকে অনায়াসে ওকে বুর্জ্জোয়া মনে করতে পারতাম। তবু তো সোস্যালিস্‌ম্‌, সম্ভবতঃ স্টেট্‌ সোস্যালিস্‌মের বেশি এগুতে পারেন নি…'

'আগে দেশটা তো স্বাধীন হওয়া চাই।' কংগ্রেসের সমর্থক কেরাণী বীরেশ্বরবাবু প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন।

'স্রেফ্ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করে আপনার কি সুবিধেটা হচ্চে মশায়?' বিমল উত্তেজিত হইয়া উঠিল। 'শাদা কর্ত্তার জায়গায় কালো কর্ত্তা এসে কাঁধে চেপে বসবেন। কি সুবিধে হবে তাতে আপনার, আমার, হাজার হাজার অবজ্ঞাত, শোষিত, নীরব কর্ম্মীর? উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাওয়ার দরুণ তখনও আপনার কলকাতা শহরে স্ত্রীপুত্রপরিবার এনে রাখবার মতো অবস্থা হবে না, প্রতি শনিবার এমনি করেই আপনাকে দেশে ছুটে যেতে হবে। একবার দেখচেন তো, ক্যাপিটালিস্ট আর মিল-মালিকদের সঙ্গে কংগ্রেসের মাখামাখিটা? একমাত্র গান্ধীর জন্যই আপনারা বেঁচে আছেন, নইলে ক্যাপিটালিস্টদের কাছে ঘুষ খেয়ে তাদের স্বার্থবৃদ্ধি করার অভিযোগ কংগ্রেসকে শুনতে হ'তো—দেশের জনসাধারণের কাছে মুখ তুলে দাঁড়াবার মতো আর মুখ থাকত না।'

শনিবারটা সুপ্রকাশের ছুটি। একথাটা তার বন্ধুবান্ধবদের প্রায় সবারই জানা আছে। বেশিক্ষণ ধরিয়া আড্ডা দিতে হইলে এই দিনের দুপুরটাই বন্ধুরা বাছিয়া লয়।

শুভেন্দু আসিয়াছিল দুটোর পরেই। এখন চারটে, তবুও তার কথা শেষ হয় নাই।

চুরুটের নিঃশেষিত-প্রায় অংশটুকু জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শুভেন্দু কহিল, 'ছুঁড়লাম তো মা গঙ্গা বলে, এবার নিচেকার কোনও ব্যক্তির জন্য দমকল না ডাকতে হয়। তারপর বল, সুপ্রকাশ, কবে যাচ্ছিস আমাদের বাড়ি। পাড়া গাঁ-কে পাড়াগাঁয়েও একদিন বাস

করা হবে, আর তা ছাড়া আমাদের ফ্যাক্টরিটাও দেখে আসতে পারবি! তুই যখন দেখেছিলি, তখন সেটা একটা ওয়ার্কশপ বই আর কিছু ছিলনা, এখন পূর্ণ-পক্ষ ফ্যাক্টরি; হন্দরে হন্দরে স্ক্রু বল্টু, মাইলের পর মাইল লোহার রড্, আরও কত কি বেরিয়ে আসচে…'

'ধন্য যুদ্ধ! বেশ লাল হয়ে উঠতে সাহায্য করে, তাই না রে?' সুপ্রকাশ ঠোঁটের প্রান্তভাগটা উজ্জ্বল করিয়া কহিল।

'তা আর নয়', শুভেন্দু কহিল। 'এ যে রীতিমত যুদ্ধ-প্রচেষ্টা! জগতে ন্যায় ও ধর্ম্ম এবং গণতন্ত্রের জয়জয়কারে সাহায্য করচি। নিজেরা পরাধীন? কুছ্ পরোয়া নেই, কিন্তু জগতের স্বাধীনতা বাঁচাতেই হবে।' শুভেন্দুর মুখে স্পষ্ট দুষ্ট হাস্য ক্রীড়া করিতেছে।

শুভেন্দু সুপ্রকাশের সবচেয়ে ধনী বন্ধু। ওর বাবা পূর্ণেন্দু ভূষণ রায় বাংলাদেশের একজন নামকরা শিল্পপতি। নানা কাপড়ের মিল, ব্যাঙ্ক ও ইন্‌স্যুরেন্স কোম্পানীর সহিত তিনি সংযুক্ত। কিন্তু গত পাঁচ-সাত বৎসর ধরিয়া তিনি লিলুয়ার লোহার কারখানাটি লইয়া পড়িয়াছেন। অসাধারণ চেষ্টা ও কর্ম্ম-দক্ষতার ফলে, এবং অবশেষে যুদ্ধের সুবিধায় কারখানাটা বেশ পোক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। স্ক্র্যাপ্ আয়রণ বা বাজে লোহা-লক্কড় গলাইয়া এখানে কাজ হয়। স্ক্র্যাপ্ দিয়া যেসব কারখানায় কাজ চালানো হয়, তার মধ্যে এই কারখানাটি বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে বলা চলে।

পূর্ণেন্দুবাবুকে সুপ্রকাশের ভালো লাগে। লড়িয়ে কম্যুনিস্টদের বই পড়িয়া ক্যাপিটালিস্টদের চেহারা এবং আচরণ সম্বন্ধে যে অপ্রীতিকর ধারণা হয়, তিনি মোটেই সে ধরণের নহেন। সহাস্য মুখ, কর্ম্মঠ, সদয় চেহারার লোক। বুদ্ধিমানের মতো কথা কহিতে পারেন, নতুন মত এবং ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা অসহ্য মনে করেন না। একটু চাপিয়া ধরিলে যেসব মালিক মজুরদের জন্য অসুস্থতা ও বার্দ্ধক্য ইন্‌স্যুরেন্সের

ব্যবস্থা করিবে এবং মুনাফা-বণ্টন নীতি আংশিক ভাবে স্বীকার করিয়া লইবে, তিনি সে শ্রেণীর লোক।

শুভেন্দু কহিল, 'লিলুয়ার বাগান-বাড়িতে আছি ভালো। প্রথমে এটাকে বাবার খামখেয়ালি মনে করে মনে মনে প্রতিবাদ বোধ করেচি। এখন দেখচি, ভালোই আছি, শহরের হৈ চৈ-এর পাল্লার বাইরে থাকবার একটা মোহ আছে। আসছে শনিবার আয়। ভোরের দিকেই চলে আসিস। কারখানাটা আগাগোড়া ঘুরিয়ে দেখাব।—হ্যাঁ, ভালো কথা, শহরে আসচি শুনে স্নীলা বললে, দাদা সুপ্রকাশ বাবুর সঙ্গে কখনও তোমার দেখা হয় না? একেবারে যে ডুমুর-ফুল হয়ে উঠেচেন।'

সুপ্রকাশ হাসিয়া কহিল, 'ফিরে গিয়ে বলিস সুনীলাকে, আমি সোস্থালিস্ট হয়ে উঠেচি, এমন কি শীগ্‌গিরই কম্যুনিস্ট হয়ে উঠতে পারি। পাছে মনে ব্যথা দিই, এজন্য ক্যাপিটালিস্টদের সম্প্রীতি এড়িয়ে চলছি...'

'তাতে সুবিধে হবেনা', শুভেন্দু কহিল। 'সে-ও সোস্থালিস্ট হয়ে উঠেচে। মজুরদের উপর আমাদের অবহেলায় সে সর্ব্বক্ষণ চটে উঠচে, বাবার কাছে সারাক্ষণ ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে' ওর মাইনে বাড়াচ্চে, তার মাইনে বাড়াচ্চে; এই তৈরি করে দিচ্চে, ওই তৈরি করে দিচ্চে, মজুরের ছেলেপিলেদের জন্য ইস্কুল খুলেচে। ও-ই তো আমাদের ফ্যাক্‌টরির ডি-ফ্যাক্‌টো ওয়েলফেয়ার-অফিসার...'

'বেশ যাব', খুশি হইয়া সুপ্রকাশ কহিল। 'আসচে শনিবারই যাব। তবে গবর্ণরদের মতো কণ্ডাকটেড্‌ টুরের ব্যবস্থা করো না। যেখানে খুশি যাব, এমন কি ফিরে এসে ইচ্ছে করলে কাগজে নিন্দে করবারও অধিকার দিতে হবে। দেখা যাবে, তোমাদের ওয়েলফেয়ার-অফিসার মজুরদের হিত সম্বন্ধে কতখানি সজাগ। কেমন আছে সুনীলা?'

উঠিয়া পড়িয়া শুভেন্দু কহিল, 'অ্যালাইভ্ এণ্ড কিকিং। চলি এবার। ভুলিস না কিন্তু। শ্রীধরের সঙ্গে দেখাটা হলোনা, সারাক্ষণ কি করে টো-টো করে ঘুরে...'

সুপ্রকাশ বলিতে যাইতেছিল, 'প্রকৃত প্রেম', কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বিত বন্ধুর প্রতি পরিহাসটা একটু রূঢ় হইবে বিবেচনা করিয়া কিছু বলিল না।

ছোট ড্রইংরুমটা হইতে চুরুট ও তীব্র সুগন্ধির কড়া গন্ধের সঙ্গে অপরিমিত হাস্যোচ্ছ্বাস ভাসিয়া আসিতেছে। সবগুলি আলো জ্বালান হইয়াছে; সবগুলি ফুলদানি তাজা ফুলে পরিপূর্ণ। চাকর-বেয়ারারা অমলিন উর্দ্দি পরিয়া ফিট্‌ফাট্; বাহিরের হ্যাট্-র‍্যাকে ফেল্টের টুপি ও একাধিক ওভার-কোট।

বড় সোফাটার একপ্রান্তে সুমিতা জর্জ্জেট শাড়ি ও মখমলের চটিতে ঝলমল করিতেছে।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ভূপতি চাটুয্যে বসিয়াছে সুমিতার দক্ষিণ দিকে পিয়ানোর টুলটা টানিয়া। তার পাশেই সুমন্ত বর্দ্ধন, সিনেমার এক-ডাকে চেনা ডিরেক্টর। তাহার পরেই অতি বিখ্যাত মঞ্চ ও চিত্র-অভিনেতা ত্রিদিব সান্ন্যাল কৌচটায় বেশ আরাম করিয়া বসিয়া অনবরত চুরুট পোড়াইতেছেন। সুমিতার সোফার অন্যপ্রান্তে বর্ণ ও বিন্যাসে বেশ প্রদীপ্ত হইয়া বেগম আয়েষা তার সুর্ম্মা-আঁকা বড় বড় চোখ হইতে অযাচিত ঔদার্য্যের সঙ্গে সকলের প্রতি কটাক্ষ বিতরণ করিতেছেন। তার বাম পাশে কিছুটা দূরে অবশিষ্ট কৌচটায় সাবিত্রী ব্যানার্জ্জি কিছুটা উপেক্ষিত বোধ করিতেছে। ডিরেক্টর অম্বুজ দত্ত কি

একটা জরুরি কাজে আট্‌কা পড়িয়া শেষ মুহূর্ত্তে আসিতে পারিবে না জানাইয়াছে; ফলে সাবিত্রীর উৎসাহও বাষ্প হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে।

নেকটাইয়ের গিঁঠটা আরও ক্ষীণ করিবার অনিচ্ছাকৃত চেষ্টা করিতে করিতে ভূপতি কহিল, 'তারপর শোন, কি করে' কার্য্য উদ্ধার করলাম: প্রত্যেকটা খেজুর গাছ ওপ্‌ড়াবার খরচ টেণ্ডারে দিয়েছি আট আনা; অথচ কুলি-দুর্ভিক্ষের দিনে কম্‌সে কম পাঁচ-সিকে করে খরচ পড়চে। এদিকে দুমাসের মধ্যে এরোড্রাম রেডি হওয়া চাই…'

'তা টেণ্ডারে আট আনা খরচ দিতে গেলে কেন?' সুস্মিতা না বুঝিয়া কহিল।

'তা নাহলে টেণ্ডার অ্যাক্‌সেপ্‌টেড্‌ হবে কেন?' ভূপতি কহিল। 'এই হচ্ছে এসব ওয়র্‌ কনট্রাক্‌টের ট্রিক্‌স্‌। গবর্ণমেণ্টের সব ব্যাপারেই এই রকম। সামনে দিয়ে পিঁপড়েটি যেতে দেবে না, পেছন দিয়ে হাতি চলে যায়…'

ভূপতি লম্বাটে আধময়লা-গোছের দোহারা-ঘেঁষা লোক। প্রশস্ত মুখমণ্ডলে স্থূলতা একটু বেশি: চোখে হুঁসিয়ার-লোক সুলভ বিজ্ঞ দৃষ্টি; হাসিতে বেশ একটু অলস হিসেবী-ভাব।

বেগম আয়েষা অধৈর্য্য হইয়া মদির কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'এত দেরি করতে পারো তুমি বাজে কথা বলে। কি করলে তাই বলো? শুধু শুধু আমাদের অনিশ্চয়ের মধ্যে রাখচো, ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো। আট আনা পেয়ে পাঁচসিকে ব্যয় করলে?'

'সবুরে মেওয়া ফলে, বেগম-সাহেবা,' সিগ্রেটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভূপতি কহিল। 'ব্যবস্থা হয়ে গেল। যেমন করে' অর্ডার পাওয়ার, টেণ্ডার মঞ্জুরের, ব্যবস্থা হয়। আধাআধি বখ্‌রা হলো। খেজুর গাছের সঙ্গে হাজার তুলসী গাছও উপড়ে ফেলা হলো…

হিসেব পুষিয়ে গেল।—কিন্তু সাবধান, এ ট্রেড্-সিক্রেট, কারুর কাছে বলা নিষেধ…'

ত্রিদিববাবু মধ্যবয়স্ক, স্বল্পবাক্ লোক। স্টেজে তিনি এত অজস্র কথা বলেন যে, বাহিরে তাহার বাক্-সংযম অভ্যাস না করিলে চলে না। কিন্তু এমন চাঞ্চল্যকর বিবৃতিতে তিনিও আকৃষ্ট ও কৌতূহলাক্রান্ত না হইয়া পারিলেন না। সার্জের জামাটার একপ্রান্তে চশমার কাচ ঘষিয়া তিনি কহিলেন, 'মশায়, মনে করবেন না, আপনার ব্যবসায় প্রতিযোগিতা করবার কোনও দুরভিসন্ধি আছে। কিন্তু বখ্রার ব্যবস্থা কার সঙ্গে করতে হয়?'

'কারুকেই বখ্রা থেকে বাদ্ দিলে চলে না, মোটামুটি এটা মনে রাখতে পারেন।' ভূপতি বিজ্ঞের মতো ভঙ্গিতে জানাইল। 'গ্যারিসন্ এঞ্জিনিয়ার, এস ডি. ও থেকে চুনোপুঁটি সব্বাইকে খুসি না করলে মিলিটারি কন্ট্রাক্ট আর আকাশে চাঁদ, দুটো পাওয়াই সমান সহজ। সাপ্লাই-ডিপার্মেণ্টের অবস্থা আরও চমৎকার! চোর কর্ম্মচারি সব জায়গায়ই কিছু না কিছু পাওয়া যায়।—তবে হ্যাঁ, এ কথা বলব, এ-খেলায় আনন্দ আছে। ভিরু হিসেবী লোকের এখানে দন্তস্ফুট করা দুঃসাধ্য। এ তো শুধু ইন্ভেস্টমেণ্ট নয়, রীতিমতো বুদ্ধির ঠোকাঠুকি, চোরের উপর রীতিমত বাটপাড়ি…'

'ওয়র্ কন্ট্রাক্ট্ থেকে কথাটা অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না?' অবশেষে সাবিত্রী ব্যানার্জি অধৈর্য্য হইয়া কহিল। 'সুমন্তবাবু এর পর কি বই নিচ্ছেন, সে গল্পটাই বরঞ্চ বলুন না কেন? সবাই আমরা ইণ্টারেস্ট নিতে পারব।'

'চমৎকার প্রস্তাব', বীরত্বের সঙ্গে ভূপতি কহিল। 'আফ্টার অল্, টাকাটা হচ্ছে ছবির গদ্যের দিক; এর রসের দিকে আছে গল্প আর তোমাদের অভিনয়…'

'কিন্তু গল্পের দিকটা ছবির চেয়ে আরও চক্‌চকে', বেগম আয়েষা ঠোঁট-সংস্কার করিতে করিতে কহিলেন। 'আই স্বে, ভূপতি, টাকা দিয়ে আর কি করবে। তুমি নিজেই একটা স্টুডিও খোল না কেন? সুমিতা হবে তার হেরোয়িন্; তার পার্মানেণ্ট নায়িকা...' কৌতুকের সঙ্গে একটু যেন ঈর্ষ্যার ঝঙ্কার তুলিয়া বেগম আয়েষা পাউডারের তুলি বাহির করিলেন।

'সুমিতার নায়িকা হ'তে আমার স্টুডিও-র জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।' গম্ভীর ভাবে ভূপতি কহিল। আয়েষাকে আর সে আমল দিতে চায়না; তার ঈর্ষ্যাটাকে আজকাল অনধিকার বলিয়া মনে হয়। অথচ এক সময়ে কত ঢলাঢলিই না করিয়াছে এই পিতৃপরিচয়হীনা মেয়েটার সঙ্গে। কত টাকা উড়াইয়াছে।

সুমন্ত বৰ্দ্ধন কহিল, 'গল্প পাওয়া যায় না, সারা বাংলা-সাহিত্য খুঁজে একটা পছন্দসই গল্প পাওয়া যায় না, একথা কি আপনারা বিশ্বাস করবেন? অথচ এই সমস্যায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, আমাদের মতো চিত্র-নির্ম্মাণ যাদের ব্যবসা, তারা হাবুডুবু খাচ্ছি। বাংলা সাহিত্যের এটা অসহ্য দৈন্য, একটা অবিশ্বাস্য দৈন্য। কি হচ্ছে আজকালকার সব বই?—আইডিয়ালিস্‌ম্, কম্যুনিসম্, মন-বিশ্লেষণ, নতুন নতুন ভঙ্গিমার নিরর্থক তরঙ্গ। অথচ একটা তাজা টগবগে টসটসে গল্প সারা রাজ্যি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে, মানে একান্ত বাধ্য হয়ে, আমাদের নিজেদেরই গল্প তৈরি করে' নিতে হয়...'

বেশ একটু ভাব-অলস দৃষ্টি, আদুরে গোপালের মতো গোলগাল চেহারা সুমন্তের। এক সময়ে থিয়েটারে শ্রীকৃষ্ণ সাজিত, এখন আর অভিনয় করে না, পর পর তিনটি কোম্পানীতে লাল-বাতি জ্বালিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া একজন পাকা চিত্র-পরিচালক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

'তাতে একটা সুবিধা আছে, সুমন্তবাবু,' একবার বাঁকা কটাক্ষে ভূপতির দিকে ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টি হানিয়া প্রায় অনাবৃত ইঙ্গিতের সঙ্গেই আয়েষা কহিল, 'নায়িকা পছন্দ হবার পর তার উপযুক্ত করে' গল্প লিখিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা যায়···শুনচিস, ভাই সুমিতা, চকোলেটের ট্রেটা এগিয়ে দে না···'

সুপ্রকাশ কহিল, 'দিদি এ যে রীতিমত উৎসবের ব্যাপার। এর মধ্যে ছাপাখানার ভূতের স্থান কোথায়? আমাকে ডেকে আপনি ছন্দভঙ্গ করবার ব্যবস্থা করেচেন।'

'কিন্তু নিজে বেঁচেছি', সুজাতা কহিলেন। 'বস ভাই তুমি এই বেতের চেয়ারটায়। মিণ্টু এতক্ষণ সু-মামা সু-মামা করছিল, কিন্তু একটু আগে তাড়াতাড়ি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। ছোটদের লক্ষ্য করবার, বুঝে নেবার ক্ষমতা আশ্চর্য্য রকম বেশি। সকলের সংস্পর্শে ওর না আসাই উচিত।'

সুজাতা বেশ জানেন, সুমিতার বন্ধুদের মধ্যে সুপ্রকাশের আনন্দ পাইবার কথা নহে। উহাদের চিন্তা ও আচরণ হইতে সুপ্রকাশের প্রকৃতি একেবারেই আলাদা জগতের। তবু তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন।

সুমিতা যখন তাহার বন্ধুদের নিমন্ত্রণের জেদ করে, তখন তিনি এই সামান্য অনুরোধ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে যখন তিনি এই বিচিত্র নিমন্ত্রিতদের পরিবেশে নিজেকে গৃহস্বামিনী হিসাবে কল্পনা করিলেন, তখন অকস্মাৎ নিজেকে ভারি দুর্ব্বল, ভারি অশক্ত মনে হইল। মনে হইল, অবলম্বন করিবার মত পরিচিত এবং শক্তিমান কাহাকেও প্রয়োজন। নিরুপায় হইয়া তিনি

রাতে আসিয়া আহার করিবার জন্য সুপ্রকাশকে টেলিফোন করিয়াছিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে মিণ্টুকে ঘুম পাড়াইবার অজুহাতে তিনি নিজের শয়ন-কক্ষে আসিয়াছেন। মিণ্টু পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি আর কলহাস্যমুখর, অতিথিপূর্ণ ড্রইং-ঘরে ফিরিয়া যান নাই; সুপ্রকাশের জন্য অপেক্ষা করিয়াছেন। একবার আশঙ্কিত হইয়া ভাবিয়াছেন, সুপ্রকাশ আসিবে তো? টেলিফোনের খবরটা তাহার কাছে পৌঁছিয়াছে তো? ভূপতির ভিতরের পকেট হইতে একটা চ্যাপ্টা বোতলের মাথা উঁকি দিতে দেখিয়াছেন, এখানেই কি ওরা মাতামাতি শুরু করিবে? না, না, এতটা সাহস নিশ্চয়ই হইবে না।

'এত ভয় আপনার!' একটু দুষ্টু হাসিয়া সুপ্রকাশ কহিল। 'এরা তো ভয়ঙ্কর কিছু নয়; এদের দলেও অন্যান্য সকল দলের মতো ভালো আছে, মন্দও আছে। কি করবে ওরা আপনাকে…'

'আমাকে নয় ভাই।' সুজাতা কহিলেন, 'ভয় আমার নিজের জন্য নয়। ভয় সুমিতার জন্য।'

'এটা আরও অসার,' সুপ্রকাশ কহিল। 'ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনার বাড়ির বাইরে ওদেরই সঙ্গে সুমিতা মেশে, এরাই তার অন্তরঙ্গ: বাড়িতে পাহারা দিয়ে কাকে আপনি বাঁচাবেন, দিদি? চলুন, ও-ঘরে যাই। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ওরা আপনারই নিমন্ত্রিত; আতিথেয়তার ত্রুটি ঘটতে দেবেন কেন?'

ত্রিদিববাবু যাইবেন গ্রে স্ট্রীটে। তিনি নিজেই তার গাড়িতে সুপ্রকাশকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব

করিলেন। খবরের কাগজের লোকের সঙ্গে সদ্‌ভাব রাখা জনসাধারণকে লইয়া যাহাদের কারবার করিতে হয়, এমন সকলের পক্ষেই প্রয়োজন; উহারা, শনিঠাকুরের মতো, ভালো করিতে না পারুক মন্দ করিতে পারে যথেষ্ট। অন্তত ঘণ্টা দেড়েক হয় ট্রাম বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং এমন একটা সঙ্গত সুবিধাজনক অনুরোধ সুপ্রকাশ প্রত্যাখ্যান করিল না।

বিদায়ের পূর্ব্বে সুমিতা সুপ্রকাশকে একবার একান্তে লইয়া গেল। একটু নাটুকে ভঙ্গিতে অত্যধিক বিনয়-সহকারে হাত জোড় করিয়া কহিল, 'সে রাতের অনাচারের জন্য এই করজোড়ে ক্ষমা চাইছি। আপনি এমন পণ্ডিত, চরিত্রবান, বিশ্বামিত্র টাইপের লোক, আপনার সঙ্গে অমন পরিহাসটা করা কিছুতেই আমার উচিত হয়নি। সেদিন একটু বেশি মেতে ছিলাম বলেই এমন সনাতন সত্যটা...'

'ভয় নেই। একটু বেশি মেতে থাকবার কথাটা', সুপ্রকাশ গম্ভীর মুখেই কহিল, 'মুখের অকৃপণ গন্ধ থেকেই টের পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু এই মাত্‌বার অবস্থাটা সকল ক্ষেত্রেই খুব দূরদর্শিতা হবে না, এই কথাটা স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি।'

'দেমাক, দেমাক, কেবল দেমাক,' মুহূর্ত্তে চটিয়া গিয়া সুমিতা কহিল। 'এত আপনার দেমাক! নিজেকে ছাড়া আর কাউকে মানুষই মনে করেন না। জগতে সবাই দুশ্চরিত্র, সবাই সুবিধা নেবার জন্য ফন্দি এঁটে আছে, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, শুধু আপনি, একমাত্র আপনি আছেন, ভীষ্মদেব, যুধিষ্ঠির আর বিদ্যাসাগরের কম্বিনেশান। ভাঙবে, ভাঙবে আপনার গর্ব্ব এই বলে দিলাম...'

ব্ল্যাক-আউটের রাত্রির মধ্যে শ্লথ-গতিতে ত্রিদিব সান্ন্যালের মোটরটা চলিয়াছে।

'একদিক থেকে আমার মনে হয়,' সুপ্রকাশ অন্ধকারে চাহিয়া

কহিল, 'অভিনয়ের মতো এমন বিচিত্র অন্য কোন কাজ নেই। সত্যি করে বলুন তো, ত্রিদিববাবু, নিজের বৃত্তিটা কি-রকম লাগে? অনেক হাততালি পেয়েছেন জীবনে, অনেক প্রশংসা, অনেক টাকা, অনেক স্তুতি। সত্যি কি সুখী হয়েছেন?'

ত্রিদিব একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই চাহিলেন। এ ছেলেটা হঠাৎ তাহার মনের কথাটা এমন আশ্চর্য্য উপায়ে টের পাইল কি করিয়া? এই মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের যবনিকার উপরে ঠিক এই সময়ে তিনিও যে নিজের কীর্ত্তিকলাপের আলেখ্যগুলি চলচ্চিত্রের ছবির মতো দেখিয়া লইবার জন্য মনের মধ্যটা হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন। সুখী হইয়াছেন কি? দেশজোড়া করতালির মধ্যে নিজের আনন্দ এবং সার্থকতা কি খুঁজিয়া পাইয়াছেন?

সংক্ষেপে কহিলেন, 'যা চক্‌চক্ করে, তা-ই সোনা নয়, ইংরেজিতে একটা কথা আছে না, সুপ্রকাশবাবু?'

'কিন্তু আপনাদের কাজ কত কম একঘেয়ে, ভেবে দেখুন।' সুপ্রকাশ কহিল। 'দিনের পর দিন একই কর্ত্তব্যের অনুবৃত্তি করে' জগতের সকল কর্ম্মী হাঁপিয়ে ওঠে, কাজ থেকে আনন্দ পাওয়ার শক্তি লোপ পায়, বোঝা মনে হয় কর্ত্তব্যকে। আপনারা তো দিনের পর দিন বদ্‌লে যান, নতুন ভূমিকায় নতুন মানুষ হয়ে নতুন ভাব ফুটিয়ে তোলেন। কাজে এমন বৈচিত্র্যের সৌভাগ্য আর ক'জনের হয়?'

ত্রিদিববাবু একটু হাসিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না। গাড়ি কলুটোলায় মোড় লইল।

'সুখী হয়েচি কিনা, জিজ্ঞাসা করছেন,' সহসা ত্রিদিববাবু যেন অনেকক্ষণের চিন্তা হইতে জাগিয়া উঠিলেন, 'না হইনি। নিশ্চিত হইনি, একেবারেই হইনি। কি হতে চেয়েছিলাম, আর কি হয়েছি! জীবনে

সত্যিকারের কিছু করতে চেয়েছিলাম ; যত সামান্য হোক, যত ক্ষুদ্র হোক্ ভূমিকা, জীবনের কাজে জীবনটাকে লাগাতে চেয়েছিলাম ; হাকিম, মাস্টার, উকিল, মিস্ত্রী-মজুর কিছু-একটা হ'তে চেয়েছিলাম। কি হলাম ? আগাগোড়া মিথ্যে, আগাগোড়া সাজান, প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত নির্জ্জলা মেকী। জীবনকে আগাগোড়া প্রবঞ্চনা। না, হইনি সুখী, একদিনও হইনি। হাততালিতে গর্ব্বিত হয়েছি, প্রশংসায় ফুলে উঠেচি, মেক-আপ্ করা জীবনটা থেকে আনন্দ কখনো পাইনি।··· কোন্‌টা আপনার হোটেল, শোফারটাকে একটু বলে দেবেন। খাওয়াটা একটু বেশি হয়েচে, রাতে ঘুম এলে হয় ?'

'দুঃখ করবেন না', সুপ্রকাশ দরজা খুলিয়া স্তব্ধগতি মোটরটা হইতে নামিতে নামিতে কহিল, 'দৃষ্টিটা একটু বাড়িয়ে দেখতে গেলে, আমরা কেই বা অভিনয় ছাড়া আর কিছু করচি ? জগত-জোড়া পুতুল-নাচে আমাদের কারুরই এর-চাইতে বড় সার্থকতা নেই।— পৌঁছে দেবার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।' কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্তও সুপ্রকাশ যাহাকে ভিন্নধর্ম্মী অনাত্মীয় এবং কিছুটা অবজ্ঞার পাত্র মনে করিয়াছে, অকস্মাৎ তাহার জন্য সুপ্রকাশের মনটা করুণায় সহানুভূতিতে আপ্লুত হইয়া গেল।

সাত

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বড় একটা গাছের বাসায় যখন কয়েক হাজার পাখি ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি-বাসের আয়োজনের পূর্ব্বে দৈনিক সংবাদ আদান-প্রদান শুরু করে, তখন কিরূপ কলরব হয় যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা হিন্দুস্থান আয়রন্ ওয়ার্কসের সীমানার একপ্রান্তের এই বাড়িটার কোলাহলের কিছুটা আন্দাজ করিতে পারিবেন। হলুদ

রঙের দোতলা ছোট দালানটি। সামনের অঙ্গনের সবুজ ঘাস সমান করিয়া ছাঁটা; তারের বেড়ার কাছ দিয়া সারিবন্দী বসিয়া মর্স্তমি রঙিন ফুলগুলি কারখানার কালো কালো টিনের শেড্‌গুলির দিকে চাহিয়া মিটমিট হাসিতেছে। কিন্তু এই দালানের বিভিন্ন জানালা দিয়া ছোট ছোট যে মুখগুলি উঁকি দিতেছে, কৌতুক ও কৌতূহল তাহাদের আরও বেশি।

উপরতলাটা কুলি-মেয়েদের কোলের শিশুদের খেলা দিয়া রাখিবার জায়গা। বহু ছোট ছোট খাটিয়ায় বিছানা পাতা; ছাতের বর্গা হইতে এখানে ওখানে কয়েকটা দোল্‌না ঝুলিতেছে। কাঠের ঘোড়া, গরুর গাড়ি, ছোট-বড় ডল্‌, ভেঁপু-বাঁশি প্রভৃতি হরেক রকম খেল্‌না সংগ্রহ করা আছে। কুলি-মেয়েরা কারখানার কাজে যাইবার সময় এখানে ছেলেপিলেদের রাখিয়া নম্বরী টিকেট লইয়া তবে আদত কারখানায় প্রবেশ করিতে পারে। আবার বেলা বারোটায় দুপুরের বিশ্রামের জন্য সিটি বাজিলে মায়েরা আসিয়া নিজ নিজ ছেলের ভার গ্রহণ করে। দুইজন মধ্যবয়সী নার্স শিশুদের তত্ত্বাবধান করে, পরিচর্য্যা করে, এবং বেশি জ্বালাতন করিলে এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া চড়-চাপড় বসাইয়া দেয়। শিশুদের মারধোর করা সম্বন্ধে সুনীলাদির কড়া নিষেধ আছে, তাই এ-বিষয়ে একটু হুঁসিয়ার হইতে হয়।

কারখানায় নারী-শ্রমিকের আধিক্য থাকিলে ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট অনুসারে শিশুদের জন্য এইরূপ 'ক্রেশ্‌' বা 'শিশু-সদন' রাখা আবশ্যিক, যদিও নানা অজুহাত দেখাইয়া অধিকাংশ কারখানার মালিকই এই হাঙ্গামা হইতে রেহাই পাইবার ব্যবস্থা করেন। সেসব জায়গায় কারখানার আশেপাশে কোথাও বুড়ি আত্মীয়স্বজনের তত্ত্বাবধানে শিশুদের রাখিয়া মায়েরা কাজে যায়। রৌদ্রে, ধূলায়, ধোঁয়ায় শিশুরা গরু-বাছুরের মতো চরিয়া বেড়ায়; চিৎকার, ক্রন্দন, একের সঙ্গে

অপরের মারামারি কামড়া-কাম্‌ড়ি লাগিয়াই থাকে; অখাদ্য খাইয়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ইহারা আগাছার মতো বাড়িতে থাকে।

হিন্দুস্থান আয়রন ওয়ার্কসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পূর্ণেন্দুভূষণ রায় এই অবহেলা ঘটিতে দেন নাই। কিন্তু এই সুবিধাটুকুর উপরেও যে সুবিধার ব্যবস্থা হইয়াছে সেটা তার মেয়ে সুনীলার কাজ।

'ক্রেশে'র নিচতলার ঘরগুলি সবই ইস্কুল-ঘর। এখানে মণ্টিসেরি-প্রথায় শিক্ষিত দুইজন শিক্ষয়িত্রী আছেন। তাদের ডাইরেকট্রেস্ সুনীলা নিজে। মজুরদের একটু বড় ছেলেমেয়েরা এখানকার ছাত্র-ছাত্রী। বেশ মজার জায়গা এইটা তাদের কাছে। রঙিন বল্‌গুলি গণিতে পারা খেলা ছাড়া আর কি? ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ হইতে পর্দায় হাঁস, মুর্গি, গরু, বাঘ, সিংহ, হাতি, সমুদ্র, পাহাড়, তারপর অদ্ভুত রকম কি সব ছবি পড়ে—সেগুলি নাকি বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, আরও কত কি। চেঁচাইয়া ছড়া পড়িতে কার আর ভালো না লাগে? আর বড় বড় কালো বোর্ডগুলিতে নীল রঙের খড়িমাটি দিয়া পড়া লিখিতেই বা মন্দ কি? বাড়ির চাইতে এটা ঢের ভালো জায়গা! আর 'দিদি' যখন লজেঞ্চুষ দেন, তখন সৌভাগ্যের তো আর তুলনাই হয় না।

অকস্মাৎ পক্ষীনীড়ের অসংখ্য কণ্ঠের কলরব যেন মন্ত্রে থামিয়া গেল। চারিদিক হইতে সন্ত্রস্ত, সসম্ভ্রম চাপা-শব্দ উঠিল—'দিদি!' 'দিদি'! শাসন-মানা সম্বন্ধে যেসব বাচ্চা-বিদ্রোহীর আপত্তি ছিল, তাহারাও পলকে নিজ নিজ জায়গায় গিয়া ভালো ছেলের মতো বসিয়া পড়িল।

পরক্ষণেই একটা গম্ভীর অর্গ্যানের ক্ষীণীভূত শব্দের সঙ্গে শতগুণ প্রবলতর সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিল—'জনগণমন অধিনায়ক জয়হে, ভারত-ভাগ্যবিধাতা'। শত শত শিশু-কণ্ঠ হইতে 'জয়হে জয়হে' শব্দ যেন দূরের শেড্‌গুলির দিকে পর্য্যন্ত রওনা হইয়া গেল; পক্ষী-নীড়টা গম্ গম্ করিতে লাগিল।

দালানের সিঁড়িতে সুনীলা যখন পা দিল তখন পরম তৃপ্তিতে তাহার সুন্দর মুখটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সুনীলা একুশ বাইশ বছরেরস প্রতিভ মেয়ে। সুঠাম সতেজ দেহ, সাধারণ বাঙালি মেয়ের চাইতে অনেকটা লম্বা; পরিষ্কার রঙের উপর যেন গাছপালার ছায়ার আমেজ লাগিয়াছে। মুখটা খুব লম্বাটে নয়; কপালটা হয়তো একটু বেশি চওড়াই হইবে। চোখের দৃষ্টি মনন-ক্ষমতায় গভীর, কিন্তু স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় কমনীয়। সরল ভুরুতে এবং আঁট ঠোঁটে শক্তি এবং সরলতা মেশানো। আতাম্র চুলগুলি পিছনে টানিয়া খোঁপা বাঁধা হইয়াছে। গায়ে পশমী শাদা ব্লাউজের দৃশ্যমান প্রত্যন্তগুলিতে নীল সরু রেখা; মিলের মিহি শাড়িটাও ফিকা-নীল রঙের। পায়ে কালো স্যুয়েডের জুতো। অনাবৃত হাত দুটি সুডৌল ও স্বাস্থ্যপূর্ণ। কব্‌জির কাছে এক গাছ করিয়া সোনার চুড়ি; গলায় পেণ্ডেণ্ট-দোলানো সরু শিকলির হার; কানের পদ্মের ডিজাইনের কানবালা দোদুল্যমান নহে। রৌদ্র হইতে বাঁচিবার জন্য সে আতপত্র-ছাতা এবং রঙিন কাচের গগ্‌ল্‌স্‌ ব্যবহার করে। ইহা ছাড়া আধুনিকতার আর কোনও উগ্রতা নাই। মুখ ও ঠোঁট রঙের প্রলেপ-বর্জ্জিত; আঙুলের নখর অরঞ্জিত স্বাভাবিক বর্ণ, ব্লাউজের ছাঁটে ভব্যতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।

সুনীলা বাংলা-সাহিত্যে এম্‌-এ পাশ। বাংলায় এম্‌-এ পড়াটা ভালো ছাত্রেরা খুব সম্ভ্রান্ত মনে করে না। এই মনোবৃত্তির প্রতিবাদ-স্বরূপই সুনীলা বাংলা নেয়, নহিলে বি-এ তে তার ইতিহাসে অনার্স ছিল।

তার এম্‌-এ পাশের কিছুদিন পরেই পূর্ণেন্দুবাবু লিলুয়ার বাগান-বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কারখানার এই

সান্নিধ্য সুনীলার মনে নতুন কর্ত্তব্যের প্রেরণা জোগাইল। মজুরদের ছেলেপিলেরা, যাহারা অনাদর ও অবহেলায় দিনমান কাটাইতে বাধ্য হয়, সামান্য চেষ্টা ও কিছু অর্থব্যয় করিলেই তাদের মানুষ করিয়া তোলা যায়। সমাজের এই সম্ভাব্য-শক্তি কেন তবে অপচয় হয়? কোন্ অধিকারে মানুষের এতগুলি সন্তানকে ভবিষ্যৎ সুযোগ ও সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত করা হইবে? মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ ও সমৃদ্ধিই কি সমাজের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত? শাস্ত্রে যাহাদের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলিয়াছে, কারখানার এই অবজ্ঞাত মজুর-সন্তানেরা কি তাহার মধ্যে পড়ে না? সুনীলা নিজের শক্তির ও সহানুভূতির নতুন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইল।

গান সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শ'খানেক ছোট ছেলেমেয়ে হাত জোড় করিয়া কহিল, 'নমস্কার, দিদি, নমস্কার', 'নমস্তে, দিদি, নমস্তে।'

সুনীলা হাসিয়া কহিল, 'নমস্কার, তোমরা বস।'

একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে বহু বর্ণের কাপড়ে তৈরি জামা ও ঘাগ্‌রা পরিয়া বেশ গর্ব্বিত বোধ করিতেছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'আজ কাহিনী বলবে না, দিদি? আজ যে শনিচর...'

'বলব বৈকি!' সুনীলা দাঁড়াইয়া রহিয়াই কহিল, 'এখনও তো সময় হয়নি। আমি ওপর তলাটা ঘুরে আসি, তারপর বলব। কিন্তু সব্বাই শোনো। আজ কলকাতা থেকে এক বাবু এসেচেন। উনি খবরের কাগজের লোক। একটু পরেই তোমাদের দেখতে আসবেন। উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার জানাবে। আর কেউ যেন একটুও গোলমাল করো না। তবে উনি কলকাতায় গিয়ে কাগজে তোমাদের নিন্দে ছেপে দেবেন। আর যদি ভালো হয়ে থাক, তবে কাগজে তিনি তোমাদের ছবি তুলে দেবেন। তোমরা যদি খুব মন দিয়ে পড়া

করো, গায়ে ময়লা না মাখো, রোজ দাঁত মেজে চক্‌চকে রাখো, ঝগড়া না করো, তবে তোমাদের একদিন মোটর-বাস্‌-এ ক'রে খবরের কাগজের অফিসে নিয়ে যাব,—দেখো কেমন করে খবরের কাগজ ছাপা হয়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দিদি, আমরা ভালো হয়ে থাকব; পড়া করব, দুষ্টুমি করব না', একগাদা ছেলেমেয়ে অতি সহজেই ভালো হইবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া বসিল। এমন প্রতিশ্রুতি রোজই দেয়, এবং প্রয়োজন হইলে বিনা দ্বিধায় ভঙ্গ করে।

একটি হাফ্‌-প্যাণ্ট ও ছেঁড়া শার্ট পরা ছেলে কৌতূহল-উজ্জ্বল চোখ মেলিয়া কহিল, 'দিদি, আজ কোন্‌ গল্প বলবে? মহাভারতের গল্প?'

সুনীলা রওনা হইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। ফিরিয়া কহিল, 'আজ বলব, আনন্দমঠ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন মস্ত বড় লেখক ছিলেন। বাংলাদেশে এত বড় লেখক দু'একজনের বেশি হয়নি। তার লেখা এই গল্প…'

'হ্যাঁ, দিদি, হ্যাঁ'। আনন্দমঠ, আনন্দ মঠ।' একগাদা ছেলেমেয়ে আবার সহর্ষে চেঁচাইয়া উঠিল।

'এই যে বাজে লোহা-লক্কড়ের স্তূপ দেখছিস্‌, এইবার চেয়ে দেখ্‌ কেমন অবলীলাক্রমে এগুলিকে ইলেকট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক লিফ্‌ট্‌ দিয়ে ওপরে তুলে নেওয়া হচ্চে। চুম্বক-লোহাকে সূচ টানতে দেখেছিস; এইবার চেয়ে দেখ চুম্বকের শক্তি। ঐ নেমে আসচে পাথরটা, জগদ্দল পাথরের মতো, কিন্তু ওটা মোটেই অচল পাথর নয়। মন্ত্রের মতো শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে স্ক্র্যাপ্‌গুলিকে বাস্কেটে চার্জ্জ করবে। ক্রেন্‌-এ

ক্রেন্-এ চলে যাবে এগুলি উই ইলেকট্রিক ফার্ণেসটার ওপরে। ওর মধ্যে লুকানো আছে প্রায় দু হাজার সেণ্টিগ্রেডের উত্তাপ। বাস্কেটের তলাটা মাত্র পাটের দড়ি দিয়ে আটকান; উত্তাপের স্পর্শ পাওয়া মাত্র এগুলি মাকড়সার বাসার মতো ঝল্‌সে উধাও হয়ে যাবে,—স্ক্র্যাপ্‌গুলি হুড়মুড় করে' গিয়ে পড়বে জ্বলন্ত ফার্ণেসের মধ্যে। তরল লোহার গলিত স্রোত টবে টবে ভর্ত্তি হয়ে উঠবে…'

বিস্ময়াবিষ্ট সুপ্রকাশের কাছে শুভেন্দু লোহার কারখানার প্রধান প্রক্রিয়াগুলি দীপ্তকণ্ঠে ব্যাখ্যা করিয়া চলিল। খাকি ফুল্-প্যাণ্টের উপর অস্ট্রেলীয় বুশ-্শার্ট পরণে, মাথায় শোলার টুপি, চোখে বড় গগ্‌ল্‌স্।

যন্ত্রের আর্ত্তনাদ, লোহা-পিটানোর শব্দ, মজুরদের কোলাহল, ডায়নামোর অবিরাম গর্জ্জন, মেরামত-মিস্ত্রীদের হাতুড়ের ঠক্‌ঠক্ মিলিয়া একটা অখণ্ড শব্দজাল সৃষ্টি হইয়াছে। চিৎকার করিয়া কথা না বলিলে কথা শুনা যায় না। শত শত লোক যন্ত্রগুলির মতোই অবলীলাক্রমে কাজ করিয়া যাইতেছে; যন্ত্র হইতে ইহাদের বিভিন্ন মনে করা কঠিন, এমনই কড়া শৃঙ্খলা। মেশিনের কালিতে ভূতের মতো চেহারা, পরিশ্রমে কঠিন মুখাকৃতি-সম্পন্ন এই লোকগুলি ভাঙ্গা লোহার টুক্‌রা, পোড়া ধাতু এবং ছাইয়ের গাদার সঙ্গে কি আশ্চর্য্য রকম মানাইয়া গিয়াছে, তাহা সুপ্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু এজন্য অভিযোগ করিয়া বসার মানে হয় না। কারখানার তুলনায় ধান-ক্ষেতের সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া যাহারা কদর্য্য কারখানাগুলি তুলিয়া দিয়া দেশটাকে একটা অখণ্ড কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতে চায়, সুপ্রকাশ সে দলের নহে। নতুন সৃষ্টি, নতুন সুবিধা, নতুন সভ্যতার জন্য মানুষকে চিরকালই কষ্ট করিতে হইয়াছে। শুধু দেখিতে হইবে, কষ্টটা প্রয়োজনের চাইতে যেন অতিরিক্ত না হয়, মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ যেন বহুর ~~অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ~~

ক্রেন্‌-টা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক চার্জ্জ-করা পাথরটাকে স্টিমারের নোঙ্গর-ফেলার মতো শব্দ করিয়া সুউচ্চ টিনের শেডের লৌহ-দণ্ড আকীর্ণ ছাদ হইতে নিচের ভাঙ্গা, টুক্‌রা, ঝঙ্কার-পড়া লোহার স্তূপের উপর নামাইয়া দিল। পলকে যেখানে যত ছোটবড় লৌহখণ্ড ছিল, একপাল তৃষ্ণার্ত্ত কুকুর-শাবকের মতো পাথরটাকে খাব্‌লাইয়া ধরিল। সুইচ্‌-রুমের যন্ত্রী এবার নতুন বোতামটা টিপিয়া দিলেন। পলকে ক্রেনে টান পড়িল। ছাদের লৌহ-বর্ত্মের রহস্যময় পথে তাহার সশব্দ কর্ত্তব্য শুরু হইয়া গেল।

'ছেলেবেলায় সার্কাসে দেখতাম, তাঁবুর উপর থেকে ঝোলানো দড়িতে ট্রাপিজ খেলা', সুপ্রকাশ গর্ব্বিত শুভেন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিল। 'সেই খেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। হাততালি দেব কিনা, বুঝতে পারচি না।'

'এখনও নয়', শুভেন্দু কহিল। 'সার্কাসটা এখনও বাকি আছে। কাজের জন্য, তা সে যত বড় কাজই হোক, কেউ হাততালি দেয় না; তাকে ছোট প্রতিপন্ন করবারই চেষ্টা করে। মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য এই যে বিরাট ব্যবস্থা, এতে আজকালকার সমাজ-হিতৈষীরা ক্যাপিটালিস্টদের শয়তানি ছাড়া অন্য কিছু লক্ষ্যই করতে পারে না। একটা কারখানার মধ্যে শ্রমিকদের ওপর জুলুম ছাড়া তারা আর অন্য কিছুই লক্ষ্য করতে পারে না। এর পিছনে যে-পরিকল্পনা, পরিকল্পনাকে রূপ দেবার যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং কর্ম্মদক্ষতা, সুষ্ঠু পরিচালনার শ্রম এবং দায়িত্ব, এসবের কোনও মূল্যই নেই। কারখানার মধ্যে এক আছে শ্রমিক; তাদের সমস্যাই একমাত্র সমস্যা, তাদের কাজই কাজ, উৎপাদনের তারাই হলো একমাত্র উৎস!—আমাদের এ-কারখানা খুব বড়ো নয়, তা জানি। কিন্তু এখানেও অর্গানিসেশনের জন্য কতটা পরিশ্রম ও পরিকল্পনার প্রয়োজন, কিছু বুঝতে পেরেচিস কি?'

'যারা অর্গানিসেশন বা ক্যাপিটালকে অবান্তর মনে করেন, আমি তাদের দলে নই, একথাটা সাধারণভাবে প্রথমেই বলে রাখতে পারি।' সুপ্রকাশ অভিমানাহত বন্ধুর আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল। 'কিন্তু সমস্যাটা ঠিক তা নয়। উৎপাদনের এজেণ্টদের মধ্যে শ্রম এবং শ্রমিকদের স্থান খুব বড়ো। কিন্তু পুঁজিবাদী পুঁজির সহায়তায় এবং সংগঠনকারী বুদ্ধির সহায়তায় মুনাফার এতখানি অংশ দখল ক'রে বসেন যে, কারখানার অন্য এবং অধিকাংশ মানুগুলির জন্য বড় বেশি অবশিষ্ট থাকে না! সেই অংশটা যখন তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তখন দেখা যায়, তাতে তাদের দুবেলা খাওয়ার মতো ব্যবস্থা হ'তে পারে না, উপযুক্ত পরিধেয় কেনা অসম্ভব হয়, রোগের চিকিৎসার পয়সা জমানো সম্ভবপর হয় না, ছেলেমেয়েদের দুগ্ধ বা শিক্ষার ব্যবস্থা অকল্পনীয়; পিটুলি-গোলা খাইয়ে শিশুগুলিকে গরু-বাছুরের মত পথে-ঘাটে ছেড়ে দিতে হয়। উপযুক্ত ঘর-বাড়ির অভাবে প্রকৃতির দেওয়া আলো-হাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়, শ্লীলতা বিসর্জ্জন দিতে হয়, পারিবারিক জীবনের পবিত্র স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। অশিক্ষায়, অনাদরে, অবজ্ঞায়, অতি-পরিশ্রমে সুস্থ আনন্দের অভাবে, দারিদ্র্যের চাপে মানুষগুলি আর মানুষ থাকে না··· সোশ্যালিস্‌ম্ এরই প্রতিবাদ, আর কিছু নয়।'

'আমরা আমাদের শ্রমিকদের জন্য কি ব্যবস্থা করেচি', শুভেন্দু অনেকটা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কহিল, 'এক্ষুণি তোকে দেখাব। তাদের বাসা-বাড়ি, তাদের জলের কল, তাদের স্যানিটারি প্রিভি, তাদের বিভিন্ন বিশ্রামাগার আর ক্লাব কি কি করা হয়েচে, তোকে দেখাব। আর সবার ওপরে আছে মজুর-মেয়েদের শিশুদের জন্য আমাদের ক্রেশ আর শিশুদের মণ্টিসারি-স্কুল—সুনীলার নিজের হাতে গড়া। একবার দেখে তবে অভিযোগ করিস।'

'অভিযোগটা তোদের কারখানার বিরুদ্ধে নয়, কোনও একটি কারাখানার বিরুদ্ধে নয়', সুপ্রকাশ অগ্রসর হইতে হইতে স্নিগ্ধ মুখে কহিল। 'এ অভিযোগ ক্যাপিটালিস্ট-ব্যবস্থার প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তোরা সহৃদয় ব্যবস্থা করেচিস, আরেক মালিক করছে না। এটা কি মালিকদের মর্জ্জির ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে? শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সমাজ-চেতনা জাগ্রত হওয়ার পর ক্রমে ফ্যাক্‌টরি আইনগুলো প্রবর্ত্তিত হলো; মালিকদের অনুগ্রহের উপর আর মজুর-দের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, কার্য্যকাল এবং অত্যাবশ্যক সুখ-সুবিধার ব্যাপারগুলি ছেড়ে দেওয়া হলো না, সমাজ এ-সম্পর্কে কর্ত্তব্যের স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিলে। সমাজতন্ত্রীরা চাইচে, এই সমাজ-চেতনার প্রসার। শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার যে-ব্যবস্থা হয়েচে, তা যথেষ্ট নয়। তাকে আরও বাড়াতে হবে, তাদের জন্য একটা ভদ্র-জীবন সম্ভবপর করে তুলতে হবে। মুনাফায় তাদের অংশটাই বড় করতে হবে...'

'এর জন্য, যারা পরিকল্পনা করে, বুদ্ধি জোগায়, সংগঠন করে তাদের অনাবশ্যক বলে তুলে দিতে হবে, কেমন? সোশ্যালিস্টরা তো ন্যূনতম পারিশ্রমিকের হার বেঁধে দিয়েই সন্তুষ্ট হবে না; তারা যে চায় কারখানাকে সেক্রেটারিয়েটের দপ্তরে টেনে নিয়ে যেতে,—আই. সি. এস. কর্ম্মচারি দিয়ে কারখানা চালাবে!' সব্যঙ্গে শুভেন্দু কহিল। 'যোগ্যতা পরীক্ষা-পাশ দিয়ে নির্ণীত হয় না, সুপ্রকাশ, কার্য্যে সাফল্য দিয়ে কর্ম্ম-দক্ষতা নির্ণীত হয়। তোদের সোশ্যালিস্ট স্টেট্ দক্ষ লোক খুঁজে বের করবে কি করে?'

'যাদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে, তাদের সুযোগ দিয়েই সম্ভবত' সুপ্রকাশ কহিল। 'তাছাড়া অপেক্ষাকৃত ছোট কারখানা, যা কী-ইণ্ডাস্ট্রি বা হেভি-ইণ্ডাস্ট্রির পর্য্যায়ে পড়ে না, সরকারী নজরের তলায় সম্ভবত ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসাবেই তা চলবে। তাদের থেকে কী-

ইণ্ডাস্ট্রিগুলির জন্য উপযুক্ত লোক-সংগ্রহ করাও চলতে পারে—আরে, সুনীলা যে! একটু আগে এলেই ক্যাপিটালিস্ট ভার্সাস সোস্যালিস্টের তর্কের প্রথম দিকটা শুনতে পেতে…'

সুনীলা কখন অজ্ঞাতসারে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কেহ টের পায় নাই।

'রাখুন আপনার তর্ক,' সুনীলা কৃত্রিম রাগের সঙ্গে কহিল। 'আমার ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা একঘণ্টা ধরে' হাঁ করে' আপনার জন্যে বসে আছে, আর এদিকে আপনি কারখানার গরমের কল্যাণে তর্ক জুড়ে দিয়ে বসেচেন। চলুন, শীগগির, আর দেরি নয়।'

'এতে আমি আনন্দের সঙ্গেই রাজি হবো', সুপ্রকাশ মৃদু হাসিয়া কহিল। 'এই শব্দ আর গরম, কালি আর ছাই, আমাদের মতো ভদ্র-লোকদের পীড়া দেয়। এসব কুলিরই উপযুক্ত!—কিন্তু সার্কাসটা তো এখনও দেখা হলো না। কোথায় রে সেটা, শুভেন্দু?'

'আর একটু এগিয়ে যেতে হবে', শুভেন্দু কহিল। 'গলিত-লোহা 'ট্যাপ্' করে' 'মোল্ড্'-এ ছেড়ে দেওয়া হয়। তার কিছু হয় 'বিলেট্স্' আর অবশিষ্টটা 'কাস্টিংস্'। এই বিলেট্গুলিকে আবার আগুনে ফেলে সমুদ্রের বুক থেকে ওঠা সূর্য্যের মতো লাল করে' তোলা হয়। এইবার শুরু হবে সার্কাস। সার্কাস না-বলে সাপ-খেলানো বলাই ভালো। এই আগুনের গোলাগুলিকে তৈরি-মালে পরিবর্ত্তিত করবার জন্য, বিভিন্ন আকার ও আকৃতির 'রড্' বানাবার জন্য বড় বড় চিম্টে দিয়ে চেপে ধরে' কারিগরেরা যখন 'পাস্'-এর মধ্য দিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করে দেয়, তখন সে এক দৃশ্য! সে যেন আগুনের সাপ নিয়ে কিলিবিলি খেলা, সে যেন ওস্তাদ বাজিকরের অবিশ্বাস্য ভেল্কি…'

'নমস্কার ভেল্কিতে। ওর মধ্যে আমি নেই। আপনি গিয়ে দেখে আসুন, আমি চলি।' বলিয়া সুনীলা ফিরিয়া দাঁড়াইল। 'ও-দৃশ্য

সহ্য করবার মতো আমার নার্ভ যথেষ্ট শক্ত নয়। মানুষের ছেলেগুলিকে দিয়ে, ভগবান জানেন, চার পাঁচশো না কত ডিগ্রি উত্তাপের মধ্যে আগুনের ভাঁটার ভেল্কি খেলাও। সামান্য হাত-ফস্‌কে গেলে এই খেলার যে পরিণাম হয়, তা দেখে সহ্য করবার মতো আমার শক্তি নেই। কত টাকা, কত টাকা এদের মাইনে দাও যে এরা এসব করে? এই উত্তাপে কাজ করে কতদিন ওরা বাঁচে?…'

'চল্‌রে, সুপ্রকাশ, ওটা বিকেলে দেখাব', শুভেন্দু হাসিয়া কৃত্রিম আতঙ্কের সঙ্গে কহিল। 'একবার সোশ্যালিস্টের তর্কের মধ্যে পড়েছিলাম, আবার যদি হিউম্যানিস্টের তর্কের মধ্যে গিয়ে পড়ি, তবে নির্ঘা' ইন্‌সম্‌নিয়ায় আক্রান্ত হতে হবে…'

'সেই ভালো', স্মিত হাসিয়া সুপ্রকাশ কহিল। 'তা ছাড়া শীতকালেও এই গরমটা সোশ্যালিস্টের পক্ষে খুব আরামদায়ক মনে হচ্চে না। আবার তর্ক বেরিয়ে আসতে পারে…'

'ওরে সর্ব্বনাশ!' শুভেন্দু সাতঙ্কে কহিল।

আট

'স্কুল-কলেজে যখন পড়তাম, প্রাইভেট-টিচার রাখার জন্য কেন জেদ করতাম জানেন?' সুনীলা কাচের দেওয়াল ভেদ-করিয়া-আসা রৌদ্র-খণ্ডটুকুতে নক্‌সা-আঁকা চাম্‌ড়ার স্যাণ্ডাল-পরা পা-জোড়া আগাইয় দিয়া বলিল।

'না, জানিনে।' সুপ্রকাশ বিলিতি ম্যাগাজিনটা পাশের বেঁটে টেবিলটাতে অ্যাস্‌-ট্রে চাপা দিয়া কহিল। 'সম্ভবত আমার বন্ধু শ্রীধরের মতো দুর্ভাগাদের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাবার জন্য। না আর কিছু?'

'খাটুনি এড়াবার জন্য।' হাসিয়া সুনীলা কহিল। 'আর কিছুই নয়।'

'জীবন্ত মেড্-ঈজী জোগাড় করতে বল? তারা কি তোমার হয়ে পড়ে দিতেন?'

'না, পড়ে চুম্বকটুকু আমাকে বলে দিতেন।' সুনীলার চোখে স্পষ্ট একটা অভিসন্ধির ইঙ্গিত। 'আজ আক্ষেপ হচ্চে, মাস্টারমশায়রা কোথায় গেলেন? জানতে হলেই কষ্ট করে' পড়তে হয়। বইয়ের নাম জোগাড়, বই সংগ্রহ, চোখ-খারাপ করে পাঠ, এসব কি কম হাঙ্গামা? তার চাইতে কেউ যদি বলে দেবার থাকে—এমন কেউ, যে অনেক জানে, অনেক ভাবে, প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্ব এবং মতকে বিচার করতে পারে, তাকে যদি পাওয়া যায় কাছাকাছি, কত সুবিধে হয় তবে; কত পরিশ্রম আর হাঙ্গামা বেঁচে যায়, কত অল্প সময়ে কত বেশি জানা সম্ভব হয়। ভারি লোভ হচ্ছে...'

'সত্যি তো', একটু কৌতুকের সুরেই সুপ্রকাশ কহিল। 'এমন লোক কোথায় পাওয়া যায়?'

'এমন লোক কাছেই আছে।' সুনীলা তার সশ্রদ্ধ চোখের প্রসন্ন দৃষ্টিটা সুপ্রকাশের ঈষৎ-বিব্রত মুখের উপর বুলাইয়া লইয়া কহিল।

'বক্তৃতা! আমি! ওরে সর্ব্বনাশ!' সুপ্রকাশ সুহিল। 'কি বলতে হবে?'

'দয়া করে যদি বর্ত্তমান রাশিয়ার সংগঠন ও শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলেন, তো উপকৃত হই। নির্ভরযোগ্য বই বেশি পাইনে, নামও বেশি জানিনে। অথচ এত বড় একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট সম্বন্ধে এতটা কম জানব, এতে সঙ্কোচে মরি।'

'বেশ, সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষার ব্যবস্থা ও নারীর স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।' সুপ্রকাশ কৌচে সোজা হইয়া বসিয়া কহিল।

'এর দুটোতেই তুমি ইণ্টারেস্টেড্: কিন্তু বক্তৃতাটা কি ভয়ঙ্কর জিনিস জানো তো। ওতে লোক ক্ষেপে ওঠে। এই যে বক্তৃতা করে' লোক-ক্ষেপানো বলে একটা কথা আছে, তার প্রকৃত অর্থও তাই। বক্তার উপর শ্রোতারা ক্ষমাহীন অধৈর্য্য ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।'

'সে ভয় আপনার নেই।' সুনীলা ঠোঁটটা অপ্রকাশ হাসিতে উজ্জল করিয়া কহিল।

স্টাডির এক দিকের দেওয়াল সম্পূর্ণ কাচের; শীতের রৌদ্র তাহা দিয়া অনায়াসে প্রবেশ করিয়া সোফা, কৌচ, কার্পেট, রাইটিং-টেবিলের উপরকার টুকিটাকি, বইয়ের শেল্‌ফ্, অ্যালাবেস্টারের মূর্তি প্রভৃতির উপর নানা ধরণের জ্যামিতিক নক্সা আঁকিয়া দেয়। খোলা জানালা দিয়া মর্শুমি-ফুলে রঙিন, নানা রকম শৌখিন ও প্রকাণ্ড গাছের ছায়া-ফেলা বাগানটা চোখে পড়ে। বড় ইঁদারাটার উপর জল-উত্তোলনের সরঞ্জামগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ফাঁসির মঞ্চ বলিয়া মনে হয়; তার ঠিক পিছনের বিরাট বটগাছটা যেন গাছ নয়, নানা রহস্যে ঘেরা একটা আলাদা জগৎ,—রূপকথার ভূতে-রাক্ষসে, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী আর রাজপুত্রে, তালদীঘি আর ডাকাতে রহস্যময়; বই পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক হইয়া সুনীলা এলোমেলো কল্পনা করিতে ভালো-বাসে; পড়ার এই ঘরটা তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা।

বাবার বোর্ড অব্ ডিরেক্টর্সের মিটিং আছে; মায়ের অল্-ইণ্ডিয়া উইমেনস্ অ্যাসোসিয়েশনের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে যোগ না দিলেই নয়। তাহারা গিয়াছেন কলিকাতায়। পূর্ণেন্দুবাবু সুপ্রকাশকে রাতে থাকিয়া যাইবার জন্য রাজি করাইয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'এই বুড়োর সঙ্গে বড় রকম একটা আলোচনা না করে' কিছুতেই ছুট পাবে না। এমন অদিনে ডিরেক্টরদের মিটিং পড়েছে, আগে কি জানতাম। তোমাদের কাছে থেকে নতুন প্রেরণা পাই, নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে

পরিচয় হয়, দৃষ্টিকোণটা ঝালিয়ে নেবার সুযোগ ঘটে।—সুনীলা-মা আর শুভেন্দু রইল। সন্ধ্যার আগেই আমরা কলকাতা থেকে ফিরে আসব।'

ভাই ও বোনে এতক্ষণ ধরিয়া সুপ্রকাশের সঙ্গে হল-ঘরে বসিয়া বসিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের অভ্রান্ত উপায়গুলির আলোচনা করিয়া কাটাইয়াছে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মিত্রশক্তিবর্গের ঘোষণা সাধুতায় যিশুখৃষ্টকে লজ্জা দিয়া ছাড়ে; কিন্তু যুক্তির যে রহস্যময় ভেল্কিবাজীতে এই সঙ্গে ভারতবর্ষের পরাধীনতা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় তাহাও একান্ত উপভোগ্য। ইংরেজের কীর্ত্তিকলাপের এই দিকটা আলোচনা করিয়া প্রাচ্যদেশগুলির একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই কৌতুক অনুভব করে; চীনের দিকে, ভারতবর্ষের দিকে, ইরাক, ইরান, ঈজিপ্টের দিকে সকলেই আঙুল দেখায়। তাহাতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের কিছুই আসিয়া যায় না।

বড় ঘড়িটাতে তিনটা বাজিবার শব্দ হইবার পর শুভেন্দুকে রণে ভঙ্গ দিতে হইল। কারখানাতে জরুরি কাজ ছিল; একবার না গেলেই নয়। সুপ্রকাশকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল; উত্তপ্ত লোহার 'বিলেট্' দিয়া অগ্নিময় সাপ-খেলা দেখাইবার প্রলোভন দেখাইতেও কার্পণ্য করে নাই। কিন্তু সুনীলা যাইতে দিল না, শুভেন্দুকে চায়ে আসিতে দেরি না হয় সে-বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়া, সুপ্রকাশকে সে লইয়া গেল স্টাডিতে।

এখানে সে আর পরিহাস-চটুল মেয়ে নয়; এটা তার পড়ার জায়গা। সর্ব্বপ্রকার চাপল্য, সকল অসার তর্ক ও অনুচিত আলস্য-বিলাস বর্জ্জন করিয়া এখানে প্রবেশ করিতে হয়। চিত্তের যেটা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র পরিক্রমা, এখানে তাহারই যাত্রারম্ভ। এখানে যদি গল্প করিতে হয়, তবে সে-গল্পের পশ্চাতে বস্তু থাকা

চাই। এখান হইতে চিন্তার ও মননের পথে তীর্থযাত্রা করিতে হইবে। ড্রইং-রুমের সুনীলার সঙ্গে মজুর-শিশুদের ইস্কুলের পরিচালিকার তফাৎ যতটা, এখানকার সুনীলার তফাৎ তার চাইতে কম নয়।

সুপ্রকাশ বক্তৃতা দেওয়াকে ভয় করে, মাস্টারি করা তার পক্ষে আরও আতঙ্কের বস্তু। তবু আজ সুনীলার অনুরোধ এড়ান সম্ভবপর হইল না। অনেক কথা সে বলিল, অনেক তথ্য জানাইল, অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিল।

'এতো! এতোটা, এতটা স্বাধীনতা!' সুনীলা সবিস্ময়ে কহিল। 'রঘুনন্দনের দেশের মেয়ে আমরা, মেয়েদের এতটা স্বাধীনতা যে কল্পনা করতেও ভয়ে মরি।'

'শুধু রঘুনন্দনের দেশ কেন,' সুপ্রকাশ কহিল, 'প্যাঙ্কহার্স্টদের দেশও এরকম স্বাধীনতার কথা শুনে ভয়ে পিউরিটান্ হয়ে ওঠে। বিবাহ-বিচ্ছেদের সহজতা, অবিবাহিতা মাতার সন্তানের প্রতি বৈষম্যের অভাব, কর্ম্মক্ষেত্রে, উৎসবে এবং বন্ধুত্বে পুরুষের সাথে নারীর সমকক্ষতার কথা শুনে ভদ্রনারীরা দেশ-বিদেশে মূর্চ্ছা যান। কিন্তু যারা সাম্যের আদর্শ প্রচার করতে চায়, বৈষম্য তারা রাখবে কোন্ মুখে? গোড়ামি আর অযুক্তির বন্ধন থেকে যারা মানুষকে মুক্তি দিতে চায় তারা মানুষের ব্যক্তিগত আচরণের স্বাধীনতা রোধ করবে কোন যুক্তিতে? সাম্যের অধিকার সেখানে ইস্কুলের ছাত্রদের কাছেও টেনে নেওয়া হয়েছে।'

'কি অধিকার?' সুনীলা চোখের পক্ষ্ম ঊর্দ্ধায়িত করিয়া প্রশ্ন করিল।

'মাস্টারদের সমালোচনা করবার অধিকার। খারাপ আর নির্য্যাতন-বিলাসী মাস্টারের সেখানে রেহাই নেই। প্রতি ইস্কুলে রয়েছে খোলা-খবরের কাগজ, ব্ল্যাক-বোর্ড। মাস্টারদের সম্বন্ধে অনায়াসে

সেখানে মতামত ব্যক্ত করতে পার। কর্তৃপক্ষ সেসব সমালোচনার হিসেব নিয়ে থাকেন; অপ্রিয় মাস্টারকে জবাবদিহি হতে হয়…'

'আমি ভাবচি', সুনীলা চোখ কৌতূহল-উজ্জ্বল করিয়া কহিল, 'আমার ইস্কুলে এ-ব্যবস্থা থাকলে আমার সম্বন্ধে আমার ছাত্রছাত্রীরা কি লিখত!'

'হয়তো ভালোই লিখত।' সুপ্রকাশ কহিল। 'শিশুরা যেমন লোক চেনে, এমন আর কেউ নয়।'

'আর আমি আপনার সম্বন্ধে কি লিখতাম জানেন?' লজ্জা ও গর্ব্বের মিলিত আভায় অপরূপ হইয়া সুনীলা কহিল, 'লিখতাম, আপনি একজন চাটুকার…মন রেখে চলতে আপনার জুড়ি নেই!—আচ্ছা, সত্যি বলুন, এই যা করছি, কিছু কি হচ্চে? আমার মজুর-শিশুদের ইস্কুলের কথা বলচি। এদের কিছু কাজে লাগা ছাড়া আর কিছু করবার মতো যে ক্ষমতা নেই।'

'গোড়া সাম্যবাদীরা এটা কিছুতেই ভালো বলবে না।' সুপ্রকাশ গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া কহিল: 'তারা বলবে, এটা অতীব অনুচিত আচরণ হচ্চে।'

'কেন?' সবিস্ময়ে সুনীলা চাহিল।

'শ্রমিকেরা কৃতজ্ঞ বোধ করতে থাকলে', সুপ্রকাশ মুখ-টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'শ্রেণী-সংগ্রাম আরম্ভ হ'তে দেরি হয়ে যাবে যে!'

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পূর্ণেন্দুবাবু সস্ত্রীক ফিরিয়া আসিলেন। ড্রইংরুমের সবগুলি আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইল। পারিবারিক মজ্‌লিস জমিয়া উঠিল। পাশের খানা-কামরা হইতে প্লেট-চামচের শব্দ আসিল ভাসিয়া, বুড়ো বেয়ারাটা বারবার আসিয়া বড়ো মেম-সাহেবের কাছ হইতে উপদেশ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেল।

সৌদামিনী আকৃতিতে অনেকটা বর্ষিয়সী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শ্রেণীর। চলন-বলনে তার ওজন করা গাম্ভীর্য্যও রাজোচিত। স্বামীর সাফল্যের গর্ব্বটা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া উগ্রতা বর্জ্জন করিলেও সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। তিনি নড়েন কম, কথা বলেন কম এবং বেশ বিলম্বিত স্বরেই হুকুম-ফরমাস করেন। আভিজাত্য খর্ব্ব করিতে পারে, এমন কিছুকেই তিনি বরদাস্ত করেন না। কিন্তু তা হইলে কি হয়, তাহার ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই যথোচিত আচরণ সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে, তাহার আভিজাত্যবোধকে তাহারা পদে পদে পীড়া দিয়া চলে।

'কলকাতায় ফিরে গিয়ে দিস্‌তো লিখে ভুছত্র মায়ের উইমেনস্ অ্যাসোসিয়েশনের নামে', শুভেন্দু দুষ্টুমি করিয়া কহিল। 'বড়লোকের গিন্নী-বান্নিদের অসার আড্ডার এমন জায়গা আর নেই…'

'শুভো', সৌদামিনী গম্ভীরস্বরেই কহিলেন, 'ঠিক মতো না জেনে শুনে তোমার কি সব কিছু নিয়েই পরিহাস করা উচিত?'

'বাবার রোটারিটাই বা তবে বাদ যায় কেন?' সুনীলা পিতার দিকে একবার দুষ্টুমি-ভরা চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিল। 'ওটাও তো যত মজবুত-হয়ে-বসা বড়লোকদের পরস্পরের প্রশংসা এবং সমবেত স্বার্থরক্ষার মজ্‌লিস। নয় বাবা?'

'ওরে দুষ্টু মেয়ে!' বড় ঈজিচেয়ারটা হইতে পূর্ণেন্দুবাবু সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে কহিলেন।

পূর্ণেন্দুবাবু দীর্ঘাকৃতি সবল চেহারার লোক। চওড়া কপাল, গভীর দৃষ্টিভরা চোখ দুটি যতটা টানাটানা ততটা বিস্ফারিত নহে। চুলেতে কিছু শাদার আভাস লাগিয়াছে, কিন্তু মুখের চেহারা অবিকৃত সটান। সিল্কের পায়জামার মধ্যে পা দুইটি দেহের উপরার্দ্ধের তুলনায় অধিক লম্বা মনে হয়।

'এ বিষয়ে সোস্থালিস্টের মতটা কি?' শুভেন্দু সুপ্রকাশের দিকে চাহিয়া কৌতুকের স্বরে প্রশ্ন করিল।

'বর্ত্তমান পৃথিবীর সব কিছুই,' সুপ্রকাশ যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কহিল, 'একটা বিরাট শয়তানি! এর প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানই ধূলিসাৎ করতে হবে! এতে আর বাছবিচার করা চল্‌বে না।'

'ওগুলো আদতে কি জানো,' সৌদামিনী সদয়কণ্ঠে কহিলেন, 'যত হা-ঘরে বাপ-তাড়ানো মা-খেদানো ছেলের বাউণ্ডুলে মত, আর কিছু নয়। কুলি ক্ষেপিয়ে ওরা একটা গণ্ডগোল বাঁধাতে চায়। একবার কথা শুনেচ, কুলিরা হবে কর্ত্তা! তবে ভদ্দরলোক কি হবে? কুলিদের কুলি হবে?'

'সেই ভয় নেই মা,' সুনীলা হাসিয়া কহিল। 'কুলিদেরও ভদ্রলোক করে তোলা হবে, এই মাত্র।'

'ঈস্, তাও কিনা সম্ভব!' সৌদামিনী অবিশ্বাসের সঙ্গে কহিলেন। 'জগতে যতদিন চন্দ্রসূর্য্য উঠবে, মানুষে মানুষে তফাৎ থাকবেই। কি বল তুমি সুপ্রকাশ?'

'আজ্ঞে তা ঠিক', জিজ্ঞাসিত হইয়া সুপ্রকাশ কহিল, 'তবে সুযোগের অভাবে, দারিদ্র্যের প্রকোপে এবং বংশ-মর্য্যাদার অনুপস্থিতির দরুণ যাতে এই তফাৎটার উদ্ভব না হয়, সেইটেরও ব্যবস্থা করা দরকার। সবাই যাতে উপযুক্ত রকম খেতে-পরতে পারে, পড়াশুনার সুযোগ পায়, কৃতিত্ব দেখাতে পারলে আত্মীয়জনের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও উঠতে পারে, সে চেষ্টার নামই সোস্থালিস্‌ম্।'

'আজকালকার ছেলেপিলে সব তোমরা এক হয়ে উঠেচ!' সাতঙ্কে সৌদামিনী কহিলেন। 'সব ছেলেমেয়ের এক কথা! কুলি-মজুরের ওপর অত্যাচার হচ্চে, অন্যায় করা হচ্চে! তারা খাটে, আর তোমরা বসে বসে টাকা ওড়াও! কি আর বলব, আমার নিজের ঘরের মেয়ে,

সে-ও এই একই কথা বলতে শুরু করেচে। ক'দিন পরে হয় তো দেখব, কারখানায় গিয়ে সে-ও মজুর ক্ষেপিয়ে তুলচে, ধর্ম্মঘট করতে উস্কানি দিচ্চে…'

'কিচ্ছু ভয় নেই মা', শুভেন্দু কহিল। 'অন্যান্য লেবার-লীডারদের মতো, ওকেও আমরা টাকা দিয়ে কিনে ফেলব…'

রাতের গুরু ডিনারের পর সৌদামিনী অবসর লইলেন। এইবার স্বচ্ছন্দে পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে সুপ্রকাশের অনেক আলোচনা হইল। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কথা, ইংরেজের ভেদ-নীতি, শ্রমশিল্পের উন্নতির পরিকল্পনা, বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা, ভারতীয় মূলধনের জড়তা, ভবিষ্যৎ জগতের অর্থনৈতিক কাঠামো, শান্তিরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রভৃতির সুদীর্ঘ আলোচনা হইল। কম্যুনিস্ট মতবাদ সম্বন্ধে পূর্ণেন্দুবাবু সুযোগ হইলেই সুপ্রকাশের কাছ হইতে জানিয়া লন; তাহাতে তাহার নিজের মতামত গঠনে এবং সংস্কারে সুবিধা হয়। খাদ্য-বস্ত্র উৎপাদন এবং সরবরাহ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোনও সুপরিকল্পিত নীতির অভাবে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন। বর্ম্মার পতনের ফলে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন স্থানে সৈন্যদের জন্য চাল-রপ্তানির দরুণ চালের ঘাটতি যে অবশ্যম্ভাবী, সে বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিলেন। চালের স্বল্পতার এই সুযোগ যে মুনাফাকারীরা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া লইতে চেষ্টা করিবে, এ-আশঙ্কাও প্রকাশ করিলেন। সুপ্রকাশ প্রতিশ্রুতি দিল, এ-বিষয়ে সে সম্পাদকীয় লিখিবে, তবে ইহা উদাসীন এবং বিদেশী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অরণ্যে রোদন ছাড়া আর বিশেষ কিছু হইবে না।

ঘুম-জড়িত চোখে সুনীলা আসিয়া কহিল, 'বাবা, এবার শুতে

যাও। অনেক রাত হয়েচে। আর দেরি করলে তোমার অসুখ করবে।'

'ক'টা বেজেছে মা?' পূর্ণেন্দুবাবু সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন।

'বারোটা বেজে গেচে,' সুনীলা কহিল। 'সুপ্রকাশবাবুকে শোবার ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে...'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' পূর্ণেন্দুবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন। 'এটা আমার খেয়াল ছিল না। তোমাকে অনেক রাত অবধি জাগিয়ে রাখলুম। কিন্তু সুপ্রকাশের সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করলে আর সময়ের আন্দাজ থাকে না। অনেক শিখি, অনেক জানি, বড় আনন্দ পাই। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে, আর নয়। এইবার শুয়ে পড়ো গিয়ে, সুপ্রকাশ...'

নয়

সুমিতা বারবার চুড়ির সঙ্গে আঁটা মণিবন্ধের ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখিল: সাজটা একটু ঘটা করিয়াই করা হইয়াছে। ব্রোকেডের ক্রোপ-ব্লাউসের উপর নেটের শাড়ি বেশ বুদ্ধিমানের মতো অসংখ্য ক্ষুদ্র জানালা খুলিয়া দিয়াছে। গলায় নানা রঙের পাথরের মালা মেমেদের কায়দায় পরা, পায়ে তীর্য্যক-ভঙ্গির জুতো খুর-তোলার নতুন সংস্করণ। মুখে রঙের প্রলেপ অবশ্য সচরাচরের মতোই; সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানকে সম্মান করিতে হইলে তার মাত্রা চড়ান অসম্ভব।

ক্ষণে ক্ষণে সে ড্রেসিং-টেবিলের সামনের মখমল-মোড়া টুলটায় আসিয়া বসে; ঠোঁটের যে সকল বিন্দুকে ওষ্ঠ-রঞ্জনীটা উপেক্ষা করিয়া গিয়াছে তাহাতে প্রলেপ লেপিয়া দেয়; ন্যাড়া ভুরুতে আই-ব্রাউ পেন্সিলটা সাবধানে টানিয়া লয়, তারপর উঠিয়া গিয়া জানালা দিয়া

অধৈর্য্যভাবে নিচেকার রাস্তার দিকে ঝুঁকিয়া দেখে। ভূপতির উপর রাগ ধরিতে থাকে। সাড়ে চারটায় তার আসিবার কথা; সময় পার হইয়া কোন্ না দু তিন মিনিট হইয়াছে।

আজ নাকি সুমিতার জন্য তাহার মস্ত বড় একটা 'সার্‌প্রাইজ্' আছে। কি এমন বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিবে, সুমিতা ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিবাহের প্রস্তাব করিবে কি, তাহাদের সমাজের পরিভাষায় যাহাকে 'প্রোপোজ করা' বলা হয়? দলের কোনও কোনও মেয়ে বহুদিন হইতে এমন ইঙ্গিত করিয়া আসিতেছে; আবার কেহ কেহ এমন ভাবও দেখাইয়াছে যে, তাহা হইবার নয়,—নাচাইয়া বেড়ানোই ভূপতির কাজ, বাঁধা-পড়া নহে। আয়েষা মেয়েটা ভয় দেখাইতেও চেষ্টা করিয়াছে। ঈর্ষ্যা হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক।

কিন্তু সুমিতা ভয় পায় না। কিছুকেই সে ভয় পায় না। সমাজের বিধি-নিষেধকে অনায়াসেই সে বুড়ো আঙুল দেখাইতে পারে। জীবনকে সে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করিতে চায়; যাহা সে ভালো মনে করে, আনন্দকর মনে করে, সংস্কারমুক্ত ভাবে অনায়াসে সে তাহার অনুধাবন করিবে। সঙ্গীত, নৃত্য, উল্লাস! ভালো লাগে তার পুরুষ-বন্ধুদের, তাদের তাজা তারুণ্য, তাদের নারী-স্তুতি, তাদের চোখের বাসনা-রঙিন দৃষ্টি! এই সান্নিধ্য, এই সঙ্গ হইতে সে বঞ্চিত হইবে কেন? ভালো লাগাকে ভালো-লাগা বলিয়া স্বীকার করিতে যারা ভয় পায়, সে তাদের দলে নহে। কিন্তু সত্যি যদি ভূপতি আজ প্রোপোজ করে? তাহার চোখের দৃষ্টিতে ইহার অভ্রান্ত ইঙ্গিত আছে। সুমিতা রাজি হইবে কি?

ভূপতি ধনীর সন্তান। নিজেও সে বহু টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় সুমিতার অভিনেত্রী-জীবন অনেক বেশি সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সাফল্য কি বিবাহিতা

সুমিতার কাছে ততটা লোভনীয় মনে হইবে, এখন যতটা মনে হয়? সাফল্য তাহার কাছে সাফল্য হিসাবেই মূল্যবান নয়; জীবনটাকে রাঙাইয়া তুলিবার, স্তাবকমণ্ডলীর কাছে নিজেকে মহার্ঘ্যতর করিবার, বাঁধা রোমান্সের অবকাশ প্রচুর ও পরিপূর্ণ করার মাদকতাটাই সাফল্যকে তাহার কাছে মূল্যবান করিয়া তোলে। কিন্তু ভূপতি সত্যই যদি বিবাহের প্রস্তাব করে, তবে তাহাতে অস্বীকৃত হওয়া কি অভিনেত্রী সুমিতার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পক্ষে ক্ষতিকর হইবেনা? ভূপতিকে সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট করার মাঝামাঝি একটা পথ কি বাছিয়া লওয়া সম্ভব নয়? কিন্তু কি সে পথ? ঠিক এই মুহূর্ত্তে, এমন একটা সঙ্কটের মুখে সে পন্থা তাহাকে কে দেখাইয়া দিবে?…

সহসা নিচে পরিচিত ইলেকট্রিক হর্ণ পরপর দুতিনবার বাজিয়া উঠিল। জানালা দিয়া একবার নিচে চাহিয়া ভূপতির আন্দোলন-রত হাতটাতে জরুরি আমন্ত্রণ লক্ষ্য করিয়া সুমিতা তাড়াতাড়ি করিল। ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায় শেষবার নিজেকে লক্ষ্য করিল, পাউডারের তুলিটা একবার গলায়, ঘাড়ে এবং অনাবৃত বাহুর উপর বুলাইল। অতঃপর দরজার পর্দাটা ঈষৎ সরাইয়া চোরের মতো মাথাটা বাহির করিয়া সন্ত্রস্তভাবে এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিল। শত হোক, দিদিকে সে ভয় করে; যতই মুখে স্বাধীনতার বুলি আওড়াক, যতই বুক-ফুলাইয়া নিজের অভিরুচি-মাফিক আচরণ করিবার জেদ করুক, কোথায় যেন তার একটা অজ্ঞাত ভয় আছে। অনেক সময়েই ইহার অস্তিত্ব সে লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু আমল দেয় নাই। বহুযুগের সঞ্চিত কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

'কোথায় আমরা যাচ্ছি? ফিরপো, গ্রেট্ ইস্টার্ণ, প্রিন্সেস্, না কোথায়?' সমুখের আসনে গাড়ি চালনা-রত ভূপতির পাশে তার

গায়ের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিয়া সুমিতা কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে কহিল। 'কিন্তু এদিকে কেন? এই নোংরা রাস্তা দিয়ে কোথায় চলেছি। এখান দিয়ে তো বড়বাজারে যেতে হয়। শনিবারের সন্ধ্যা কাটাবার মতো কোনও জায়গা এ-অঞ্চলে থাকা কি সম্ভব? বাঃ রে, তুমি কিছু বলছ না কেন?—সরাও এদিক থেকে পাইপ্‌টা, ধোঁয়ায় আমার মাথা ধ'রে গেল। এ কি, হাওড়ার ব্রীজে চড়ব নাকি? কাণ্ডটা কি শুনি? কোথায় তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ?…'

'এটা একটা সিম্‌প্‌ল কেস্ অব্ কিড্‌ন্যাপিং!' পাইপ্‌টা ঠোঁটের ডান প্রান্তে সরাইয়া অনিয়া পরিহাস-তরলকণ্ঠে ভূপতি কহিল। 'ইচ্ছে করলে হল্লা করতে পার। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চয়ই তোমার মতো সুন্দরী মেয়েকে রক্ষা করবার জন্য ট্রাফিক-নিয়ন্ত্রণে জলাঞ্জলি দিয়ে ছুটে আসবে। কিন্তু বলেছিলাম তো, আজ একটা সার্‌প্রাইজ্ আছে। কলকাতার মামুলি আড্ডাগুলি পান্‌সে হয়ে গেছে। চাই নতুন আব্‌হাওয়া, নতুন পানীয়, নতুন ডিনার, নতুন হল্লা…'

'কিন্তু কোথায়?' কিছুটা আশঙ্কার সঙ্গেই সুমিতা প্রশ্ন করিল।

'শ্যাঁদেরনাগোর!' হাওড়ার পুলটার উপর গাড়ি উঠাইয়া ভূপতি কহিল। 'যাকে কলকাতায় বলা হয়, ফরাসী চন্দননগর। ফরাসী আসব বহুবিচিত্র ও শস্তা। চন্দননগরের স্ট্র্যাণ্ডটা গঙ্গার পবিত্র তরঙ্গে সুস্নিগ্ধ। তার ওপরকার যে-কোনও হোটেলেই কিছু রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে অজস্র প্রেম ও আতিথেয়তা অকাতরে ঢেলে দেয়। একটু ফরাসী-আমোদ পেতে চলেচি, ডার্লিং। ভয় পাবার কিছুমাত্র হেতু নেই…'

হাওড়ার অপরিচ্ছন্ন, বিচিত্র যান-ভারাক্রান্ত রাস্তা দিয়া ভূপতির রেসিং গাড়িটা তীক্ষ্ণ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে চলিল

ধূলায়, ধোঁয়ায়, দালানের ও দোকানের অসৌন্দর্য্যে, মালবাহী যান ও বস্তির প্রাদুর্ভাবে এ-পথটা সুমিতার কাছে অসহ্য মনে হইল। আর কতটা যাইয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পৌঁছিলে হাঁফ ছাড়া যায়। সিল্কের সুগন্ধি-ভেজা ক্ষুদ্রকার রুমালটা হাণ্ডব্যাগের জঠর হইতে বারবার বাহির করিয়া সে নাকের উপর, মুখের উপর বুলাইয়া লইল। তাহার যেন নিঃশ্বাস লইতেও কষ্ট হইতেছে।

'এইবার পথটা তোমার শাড়ির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলবে, আর ভয় নেই।' সহরতলিতে পৌঁছিয়া ভূপতি গাড়ির গতি বাড়াইয়া দিল। 'স্বচ্ছন্দ, সভঙ্গ, যেমন উদার, তেমনি রঙিন!—কিছু মনে করো না, ক্লান্ত হাতটা তোমার ব্রোকেড্-মোড়া কোমল কাঁধে একটু বিশ্রাম লাভ করতে চায়...'

'বড্ড বেশি ওয়ান্-আর্ম ড্রাইভার হওয়ার শখ তোমার। সরিয়ে নাও বলচি হাত।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, নো আন্‌ফেয়ার অ্যাড্‌ভাণ্টেজ,' বলিয়া ভূপতি হাতটা সরাইয়া লইল।

সিনেমার রেলগাড়ি যেমন দেখিতে দেখিতে এলাহাবাদ-কানপুর, মথুরা-বৃন্দাবন, লাহোর-পেশোয়ার, জব্বলপুর-বাঙ্গালোর ভেদ করিয়া আগাইয়া যায়, তেমনি অবলীলাক্রমে লিলুয়া, বেলুড়, বালি পার হইয়া গেল। মসৃণ পীচের চওড়া রাস্তা যখন মনুষ্য-বসতির বাহিরে খোলা প্রান্তরের মধ্যে পড়ে, তখন গাড়িতে ইচ্ছামত গতি সংযোগ করা চলে। এই গতি আরোহীদের রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, মাদকতার মতো ইহাও লোককে বিহ্বল করে। এই গতির তরঙ্গ লাগিয়াছে সুমিতার মনে। পিছু চাহিয়ো না, বিতর্ক-বিচার করিয়ো না, জীবনের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ দিয়া এমনই উদ্দাম গতিতে আগাইয়া চলো। কোথায় পৌঁছিবে, সে তর্ক বৃথা; নিরাপত্তার প্রশ্ন অবান্তর, শুধু ছুটিয়া চল, ছুটিয়া চল...

'ড্যাম্ ইট্!' বলিয়া ভূপতি সহসা লেভেল-ক্রসিংটার মুখে সজোরে ব্রেক্ চাপিয়া ফেলিল। 'এই লক্ষ্মীছাড়া ঘুম্‌টি-ওয়ালাদের দৌরাত্মিতে ছোট্‌বার সব মজা মাটি করে' দেয়। আর একটা সেকেণ্ড আগে এলেই পার হয়ে যেতে পারতাম। নাও, এখন বসে থাকো; কতক্ষণে রেলগাড়ি পাস্ করবে, তবে ফটক খুলবে...'

'কোথায় এলাম?' আসনের পিঠে নিজের পিঠটা আলস্যভরে এলাইয়া দিয়া সুমিতা কহিল। 'তাড়াতাড়ি না-পৌছলে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে...'

'উতোরপাড়া বোধহয়।' ডান দিকের পেট্রোল-পাম্পের বাড়িটার দিকে চাহিয়া ভূপতি কহিল।

'আর কদ্দূর?'

'কেন, খুব তেষ্টা পেয়েচে কি?'

পেট্রোল-পাম্পের কাছে কতগুলি ছেলে উপযুক্ত ব্যসনের অভাবে জট্‌লা করিয়া ক্রিকেট ও সিনেমার আলোচনা করিতেছিল। একজন চেঁচাইয়া উঠিল, 'আরে দেখ্, দেখ, ঐ গাড়িটার মধ্যে। 'চাঁদের মেলা'-র চন্দ্রবালার সখীর মতো বিলকুল চেহারা—মাইরি বলচি।'

'চাঁদের মেলা' মাত্র কয়দিন আগে স্থানীয় সিনেমায় দেখানো হইয়াছে; চরিত্রগুলির কথা বেশ টাট্‌কা মনে আছে। অন্যেরাও সকৌতূহলে চাহিল। সত্যই তো, নায়িকা চন্দ্রবালার সখী! নির্ঘাৎ এতে আর সন্দেহ নাই! একজন কহিল, 'মাইরি, এ সুমিতা রায় কার সঙ্গে চলেছে রে? লাগা, লাগা শিষ্...'

হুইস্ হুইস্ হুইস্! আধ ডজন জিহ্বার সুতীক্ষ্ণ শিষ্ সুমিতার কানে গিয়া পৌঁছিল।

'শীগগির স্টার্ট দাও, বলচি।' সুমিতা মুখে বিরক্তি ভরিয়া কহিল। 'এই ছোটলোকদের পাড়ায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?...'

'অল্ রাইট্—এই খুলে দিয়েচে।' ভূপতিও গাড়ির ক্লাচ্ খুলিয়া কহিল।

পরক্ষণেই গাড়িটা বুলেটের মতো ছুটিয়া লোকালয়ের বাহির হইয়া গেল। চন্দননগরের স্ট্র্যাণ্ডের উপরের 'হোতেল্ দ্য বোমেহি'-র সম্মুখে যখন ভূপতির গাড়িটা গিয়া দাঁড়াইল, তখন শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে।

'রাতে থাকবার জন্য ভালো একটা রুম্ চাই।' ভূপতি হোটেলের ফরাসী ক্লার্কের কাউণ্টারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাইপ্ ধরাইয়া কহিল।

'সিঙ্গেল না দাবল্?' হোটেল-ক্লার্ক পেন্সিলটা উঠাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

'ডাব্‌ল্। সঙ্গে আমার স্ত্রী আছেন।'

'ভেরি ওয়েল্। কি নাম লিখব?'

'মিঃ ও মিসেস্ চৌধুরি।' অম্লান-বদনে ভূপতি চাটুয্যে নাম জানাইল।

'ঠিকানা?'

লর্ড বিশপের ঠিকানা মনে করিতে না পারায় ভূপতি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ঠিকানাটা বলিয়া দিল।

'পুর্‌পোজ্ অব্ ভিসিৎ?' ফরাসী ক্লার্ক মামুলি নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্ন করিল।

'কলকাতার বাইরে স্বামী-স্ত্রীতে নির্ব্বিঘ্নে উইক-এণ্ড্ যাপন।—হয়েচে? এবার আমার স্ত্রীকে গাড়ি থেকে নিয়ে আসচি, এখনও তিনি গাড়িতেই বসে আছেন। প্রথমে একটু পান করে' চাঙ্গা হয়ে নিতে চাই; বুফে-তে বসচি গিয়ে। রুমটা প্রস্তুত হলে ওখানেই খবর পাঠিও।'

'দরকার হলে দিনারও আমরা ঘরে পাঠিয়ে থাকি।'

'ধন্যবাদ। তার দরকার নেই। তবে ঘরটা যেন ভালো হয়। অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথ্‌-রুম থাকা চাই।'

ফরাসী-ক্লার্ক বাঙালি 'না'-র ভঙ্গিতে দুপাশে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। উইক-এণ্ড্‌ যাপনেচ্ছু বহু স্বামী-স্ত্রীকেই তাহারা সর্বদা সাহায্য করিয়া থাকে!

রঙ্গমঞ্চকে সমুখে রাখিয়া যেমন প্রেক্ষাগৃহ তৈয়ারি হয়, বার্‌ বা পানীয়-পরিবেশন মঞ্চকে লক্ষ্য করিয়া তেমনি এসকল জায়গার 'বুফে' পরিকল্পিত। পানীয়ের উৎসই সকল দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল। ইহার পাশেই আলোকদীপ্ত ভোজনাগার। লাউঞ্জ, স্মোকিং-রুম, রিটায়ারিং-রুম, এসব কাছাকাছিই আছে। উপতলায় শুধু শয়ন-ঘরগুলি।

কাচপাত্রের মিষ্ট-শব্দ-ভরা 'বুফে'টার একপ্রান্তে অমলিন চাদরে ঢাকা ছোট টেবিলটার ধারে মুখোমুখি বসিয়াছে ভূপতি চাটুয্যে এবং সুমিতা। দুপাত্র ভরা লাল বর্ণ পানীয়, নর্ম্মাণ্ডির দ্রাক্ষাকুঞ্জ হইতে আহৃত। রাত্রের আহারের পর আজ নাচের ব্যবস্থা আছে। কক্ষের মধ্যস্থলের চেয়ার ও টেবিলগুলি সরাইয়া তাহার জন্য জায়গা ক[illegible] হইতেছে। নৃত্য, সঙ্গীত, মদ্য—উচ্ছ্বসিত জীবনের ফেনিল মাধুর্য্য!

উর্দ্দি-পরা বেয়ারা আসিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া কহিল, 'আপ্‌কা কামরা তৈয়ার, সাহাব।'

'ঠিক হ্যায়।' ভূপতি কহিল। 'আমার গাড়ির 'ডিকি'-তে ব্যা[illegible] আছে। কাম্‌রাতে পাঠিয়ে দাও।'

'কামরা! কাম্‌রা কেন?' বেয়ারা যাওয়া মাত্র সবিস্ময়ে সুমি[illegible] প্রশ্ন করিল। সোজা হইয়া সে চেয়ারে উঠিয়া বসিল।

'রাতে থাকতে হবে।' মুখ নিচু করিয়া ভূপতি পানপাত্রে চুমুক দিল।

'তার মানে? না না, ডোণ্ট্ বি সীলী। আমাকে ফিরে যেতেই হবে। নইলে দিদি আমার রক্ষা রাখবে না।'

'ফেরবার উপায় নেই।' ভূপতি টেবিলের অর্দ্ধ-সমাপ্ত বোতল হইতে নিজের গেলাস পূর্ণ করিল।

'নেই! নেই কেন?' সুমিতা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল। 'আমাকে ফিরতেই হবে। যেমন করেই হোক ফিরতে হবে।—যাও, এমন ঠাট্টা ভালো লাগে না। এবার উঠে পড়ো…'

'উপায় নেই, ডার্লিং, উপায় নেই।' ভূপতি আধা-ব্যঙ্গ আধা-লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল। 'টায়ার পাংচার হয়েচে; রাত্রে মেরামত হওয়া অসাধ্য, খোঁজ নিয়েছিলাম। বাধ্য হয়ে একটা রাত কাটিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কিচ্ছু ভয় নেই। আমি একজন ভীষ্মদেব শুকদেব-তুল্য লোক; তুমি নির্ভাবনায় রাতের নাচে যোগ দিতে পার…'

'টায়ার ফাটা না হাতি!' সুমিতা সাতঙ্কেই কহিল। 'তুমি নিশ্চয়ই রগড় করচ। না না, ধ্যেৎ, আমাকে ফিরতেই হবে। ইচ্ছে হলে তুমি থাকতে পার, আমি ট্রেনেই ফিরতে পারব।—না না, এতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়। দিদি আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না…'

'কিন্তু সারপ্রাইজটা যে এখনও জানানো হয়নি, ডার্লিং।'

'থাক্‌গে, আজ জানতে চাইনে', সুমিতা উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া কহিল। 'চলো, আজ যাই। কলকাতার বাইরে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। মিছিমিছি আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি।…'

ভূপতি কতক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে সুমিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। খুব অস্পষ্ট একটা চাপা হাসি ঠোঁটের দুই কোণায়, নাকটা জীবন্ত পুঁটিমাছের কান্‌কোর মতো সামান্য ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, নিচের

ঠোঁটটা সচরাচরের চাইতে একটু যেন বেশি ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হাতের আঙুলগুলি শিহরিত চঞ্চল।

'খুব ভয় পেয়েছ, কেমন ?'

'ভয় আমি পাইনে।' সুতীব্র আশঙ্কা গোপন করিয়া সাহসিকার মতোই সুমিতা কহিল।

'তবে ওরকম করছ কেন ? চুপ হয়ে বসো। এই নাও তোমার কনট্রাক্‌ট্। সুমন্তের নতুন ছবিতে তুমি নায়িকা নির্ব্বাচিত হয়েছ। একটা চান্স্ চেয়েছিলে, চান্স্‌টা তোমাকে সংগ্রহ করে দিলুম। এ ছবির সব টাকা আমি দিচ্চি…' বলিয়া কোটের ভিতর-পকেট হইতে ভূপতি বিজয়ীর শেষ অস্ত্রের মতো একটা ছাপানো সই-করা কন্‌ট্রাক্‌ট্-ফর্ম বাহির করিয়া আনিল।

কন্‌ট্রাক্‌ট্! নায়িকা! চান্স্! প্রসিদ্ধি! এক মুহূর্ত্তে সুমিতার মাথাটা যেন ঘুরিয়া গেল। সেই দেমাকী সুমন্ত বর্দ্ধন! তারই ছবিতে শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় নামিবার গৌরব! চিত্র-তারকা! কাগজের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছবি! সংখ্যাতীত বিমুগ্ধ আলোচনা! দেওয়ালে দেওয়ালে, আলোক-স্তম্ভে, সগর্ব্ব নাম-ঘোষণা, সভঙ্গ প্রাচীর-চিত্র! কত স্তাবকের স্তুতি, কত রোমান্সের রোমাঞ্চ, কত স্বর্ণের ঝঙ্কার, কত বিলাসের তরঙ্গ! জীবনের তারে তারে অপরূপ মূর্চ্ছনা ; গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া জীবনের অবাধ অভিসার। আলো, বর্ণ, সঙ্গীত, প্রেম! সুযোগ, অভ্রান্ত অভাবিত সুযোগ! চিত্র-তারকা হইবার সুদুর্লভ মহার্ঘ্য সুযোগ!…

পরদিন প্রভাতে হোতেল্ দ্য বোহেমির প্রাপ্য মিটাইয়া 'মিঃ মিসেস্ চৌধুরি' মোটরে কলিকাতার দিকে রওনা হইলেন।

দশ

ইস্কুলবাড়ির সিঁড়িতে সুনীলা সবেমাত্র পা দিয়াছে, এমন সময়ে ভারপ্রাপ্ত মণ্টিসেরি শিক্ষয়িত্রী মালতীদি হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, 'একবার কাণ্ড দেখুন এসে, সুনীলাদি। দেখুন এসে একবার কাণ্ড। স্কুল-ঘরের সারা দেওয়াল লিখে কালো করে দিয়েচে! তার কোথাও আর একটু শাদা জায়গা অবশিষ্ট নেই। তখুনি আপনাকে বলেছিলাম, টিপ্পনি কাটবার জন্য বোর্ড-টোর্ড দিলে ফল ভালো হবেনা দুষ্টুমি দেখাবার একটা সুযোগ পেলে ওদের কি আর বশে রাখা যাবে? এইবার কি করবেন, একবার দেখুন এসে…'

সবিস্ময় কৌতুকে সুনীলার মুখটা ক্ষণকালের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পরক্ষণে সে গম্ভীর হইয়া মামুলি স্বরে কহিল, 'স্বাধীনতার প্রথম ধাক্কাটায় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। এটা ক্রমে ওদের সয়ে যাবে। তখন আর দেওয়াল নষ্ট হবে না, মন্তব্যগুলি দুটো বোর্ডেই ঝুলিয়ে যাবে—চলুন, দেখি গিয়ে কি লিখেচে ক্ষুদে মানুষগুলি…'

'এমন বিষয় নেই, যার সম্বন্ধে লেখেনি', সুনীলার স্থিরতায় ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহার পিছনে চলিতে চলিতে মালতী কহিলেন। 'স্কুল আর মাস্টারদের পড়া সম্বন্ধে নিজেদের মতামত জানাতে অনুমতি দিয়েছিলেন, একবার দেখুন এসে, পৃথিবীতে এমন কোনও বিষয় নেই, যা সম্বন্ধে টিকা-টিপ্পনি বাদ দিয়েছে…'

সুনীলা স্কুলের হল-ঘরে যাইয়া প্রবেশ করিল এবং প্রথামত সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট অর্গ্যানটার মধ্য হইতে সুগম্ভীর আওয়াজ বাহির হইয়া 'জনগণমন অধিনায়কে'র সুরে ঘর পূর্ণ করিল; স্কুলের সমস্ত ছাত্রছাত্রী যেন মন্ত্রে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যন্ত্রের সঙ্গে নিজেদের ক্ষীণকণ্ঠগুলি মিলাইয়া ফেলিল।

কৌতূহল, ঔৎসুক্য এবং আশঙ্কায় সুনীলা যেন রোমাঞ্চিত বোধ করিতে লাগিল। বারবার সে তীর্য্যক-দৃষ্টিতে দেওয়ালগুলির দিকে তাকাইল। দেখিল, মেঝেতে এবং বেঞ্চেতে দাঁড়াইয়া দেওয়ালের যতটা পর্য্যন্ত শিশুদের নাগালের মধ্যে পড়া সম্ভব, তাহা লেখায় লেখায় কালো হইয়া উঠিয়াছে: রঙিন খড়িমাটিতে, কাঠের কয়লা এবং উড্ পেন্সিলে, এমন কি পোড়া কোক্ কয়লার অস্পষ্ট আঁচড়ে সংখ্যাতীত মন্তব্য দেওয়ালের বুকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মন্তব্য লেখার জন্য যে বোর্ড দুটি নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার উপর ব্যগ্র সমালোচকদের লেখার একাধিক প্রলেপ পড়ায় তাহার মধ্য হইতে পাঠোদ্ধার সম্ভব হইল না। অথচ ইহাতে মন্তব্য নিঃশেষ না-হওয়াতেই সম্ভবতঃ শাদা দেওয়ালগুলির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। কি এরা এতো লিখিয়াছে? ইস্কুল সম্বন্ধে এত কথাই কি ওদের বলিবার আছে? কি ওদের অভিযোগ, কি ওদের আন্তরিক মন্তব্য, কি ওদের অভ্রান্ত সরল সমালোচনা? সুনীলা প্রায় অধৈর্য্য হইয়া সঙ্গীত-অবসানের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

'নমস্কার দিদি।' 'দিদি নমস্কার।' 'নমস্তে, দিদি, নমস্তে।'

'কিন্তু তোমরা এসব কি করেছ? লিখে সারা দেওয়াল নোংরা করে ফেলেছ কেন?' সুনীলা কহিল। 'এটা কি উচিত হয়েচে? থাকবার জায়গা সুন্দর করে রাখতে হয়। ধব্‌ধবে শাদা দেওয়ালগুলো তোমরা আঁচড় এঁকে কি রকম বিশ্রী করে তুলেছ, একবার তাকিয়ে দেখ? বল, কেন এমন করেচ?'

'তুমি লিখতে বলেছ, দিদি', একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে উঠিয়া ঈষৎ অপরাধীর মতো সুরে কহিল।

'আমি দেওয়ালে লিখতে বলেছি, বোকা মেয়ে? তবে ঐ দুটো ব্ল্যাক্‌বোর্ড আলাদা করে রাখা হলো কেন?'

'ওতে যে কুলোলো না, দিদি। সবাই যে একদিনেই লিখতে চায়,

দিদি।' অপরাধী ছাত্রছাত্রীর মুখপাত্র হিসাবে সেই মেয়েটি কারণ জানাইল।

সুনীলা স্নিগ্ধ করুণ সহানুভূতিতে মেশা চোখে ক্ষণকাল সরলা মেয়েটির বিব্রত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, 'বেশ, কিন্তু আর কক্ষনো কেউ দেওয়ালে আঁচড় কাটবে না। দুটো ব্ল্যাকবোর্ডে না-কুলোলে পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করবে। দেওয়ালে চুণ ফিরিয়ে দিয়ে যাবার পর আর যেন কক্ষনো এমন না হয়, বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, দিদি, হ্যাঁ', সমস্বরে শিশুরা চেঁচাইয়া কহিল। 'আর কক্ষনো এমন করব না...'

বস্তুতঃ, 'দিদি'র কথায় রাজি হইতে কখনওই তাহাদের ভাবিয়া দেখিতে হয় না।

শিক্ষয়িত্রীরা ক্লাস আরম্ভ করিলেন; সকল কোলাহল স্তব্ধ হইল। কাজের আবহাওয়া শুরু হইয়া গেল। শুধু সুনীলা অসীম ঔৎসুক্য এবং ভীরু সঙ্কোচের সঙ্গে হল-ঘরের চারিদিকে দেওয়ালের অসংখ্য হরফের উপর চোখ বুলাইয়া চলিল। কত অসংখ্য, কত বিচিত্র, কত অনুভূতি-উজ্জ্বল মন্তব্য ত্রুটিপূর্ণ ভাষায় এবং ভুল বানানে লেখা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শিশুর দৃষ্টিতে জগতের এবং জীবনের যতটা ধরা পড়ে, তাহা বড় কম নয়। সকল ঘটনার, সকল অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা তাহাদের নাই। কিন্তু অন্তর্ভেদী সরলতার সঙ্গে কত তথ্যের ইঙ্গিত যে এই খণ্ড রচনাগুলিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া সুনীলা বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভাষার ত্রুটি শুদ্ধ করিয়া সুনীলা পাঠোদ্ধার করিতে লাগিল ঃ—

'কাল বাবা মাকে খুব মেরেচে। দারু খেয়ে এসেছিল; আমরা ভয়ে কাছে যাই নি।' 'আমাদের বাড়ির ঘরটা বড় ছোট। ছাদটা

খুব নিচু। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।' 'মঙ্গলুর দাদা বড় পাজি। সারা রাত বাঁশি বাজিয়ে আমাদের মাথা ধরিয়ে দেয়। বুঁচ্‌কি দিদিকে দেখলেই কি বলে' বুঁচকি দিদিকে চটিয়ে দেয়।' 'কাল কাবুলিঅলাটা আবার এসেছিল। লম্বা লাটিটা দরজায় ঠুকে পিতাজিকে গালি দিয়ে গেচে।' 'আমাদের যদি একটা আলাদা পায়খানা থাকত, তবে খুব ভাল হত। ওবাড়ির লোকগুলো যা নোংরা করে রাখে।' 'পচাইয়ের দোকানের বেড়ার আড়ালে কাল কেষ্টদাকে চুপিচুপি বসে থাকতে দেখে এসেচি। তাই ওকে বলেছিলাম বলে আমার গালে একটা চড় লাগিয়েচে।' 'রামুর মা বড় ঝগড়াটি, উঠোনে উনান ধরিয়ে সব ধোঁয়া আমাদের বাড়িতে পাঠায়। মা উনান সরাতে বলেছিল বলে মাকে খুব গালি দিয়েচে। মা বসে কেঁদেছে।' 'কলে গোবিন্দর কাকার হাতের আঙুল কাটা পড়েছে। গোবিন্দ বলচে, এজন্য সে টাকা পাবে। কিন্তু সে খাবে কেমন করে?' 'নতুন ব্লকের তুলি-মাসির সঙ্গে বাবা হেসে কথা বলেছে বলে মা বাবাকে খুব বকেছে। তুলি-মাসির সঙ্গে যার বাবাই কথা বলে তার মা-ই রাগে কেন? নিত্য নতুন, নক্সীপেড়ে শাড়ি তুলি-মাসি পরে। তার বোধহয় অনেক টাকা আছে।' 'মা আমাদের একটুও ভালবাসে না। কাছে গেলেই বলে, সর্‌, সর্‌। সারাদিন কলের খাটুনির পর গতরে কিছু নেই, আর জ্বালাস্‌নে।'

মজুরদের এতটা সান্নিধ্যে থাকিয়াও সুনীলা যাহা স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে নাই, লিপিচাতুর্য্য ও চিন্তা-পারম্পর্য্যহীন শিশুদের ছেলেমানুষি উক্তি হইতে তাহাই যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বস্তি-জীবনের একটা অনাবৃত ও রঙের প্রলেপহীন আলেখ্য যেন অকস্মাৎ চোখের সমুখে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

'দিদিকে আমি ভালবাসি। দিদির নাম সুনীলাদি।'

সুনীলা মন্তব্যে নিজের নাম দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। এক

মুহূর্তে বুকের মধ্যটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মন্তব্যের শ্রেণী-বিভাগে দেওয়ালের এ-অংশটা তাহার বিচারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এ-বিচারের ফলাফল অনুধাবন করিতেও তাহার মন ভয়ে, উত্তেজনায়, আশঙ্কায় এবং উদ্বেগে তটস্থ হইয়া উঠিল। এ বিচার অমোঘ, পক্ষপাতিত্ব-দোষহীন, সরল নিষ্ঠায় সত্যোদ্ঘাটন। ইহার উপর আপীল একান্তই নিরর্থক, তাহা সুনীলা জানে।

'দিদি আমাকে আজ গাল টিপে আদর করেচে।' 'মালতিদি আমাকে ঠোনা মেরেছিল। আমি দিদিকে বলে দেব।' 'দিদি কাল আমাকে হাওয়া-গাড়িতে চড়িয়ে বাড়ির কাছে পৌঁছে দিয়েচে।' 'দিদি খুব সুন্দর দেখতে।' 'কাল নিশ্চয়ই দিদি লজেঞ্চুষ দেবে।' 'দিদির কথা আমি শুনব!' 'দিদির কানের সোনার ফুল খুব দামি। আমার খুব দেখতে ভালো লাগে। আমার যদি একটা থাকতো!'

কৃতজ্ঞতায়, স্নেহে, সুনীলার চোখ-জোড়া সজল হইয়া উঠিয়াছিল, শেষের মন্তব্যটা পড়িয়া সহসা এক মুহূর্তে সে যেন পাংশু হইয়া উঠিল। দামি! সোনার ফুল! আমার যদি একটা থাকত! সুনীলা যেন এতদিন ধরিয়া একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছে। ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া অকিঞ্চনদের মধ্যে দেমাক করিয়া বেড়াইয়াছে। এইবার অকস্মাৎ নিজের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ আবিষ্কার করিয়া সসঙ্কোচ কুণ্ঠায় একবারে মাটিতে মিশিবার উপক্রম হইল। ভীরুভাবে বারবার সে অধ্যয়নরত শিশুদের এবং তাহাদের শিক্ষয়িত্রীদের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দু একটি অমনোযোগী শিশু তখনও সকৌতূহলে তাহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। ইহাদের দৃষ্টির সমুখে অপরাধী কর্ণভূষণ দুটোকে অপসারণ করিতেও তাহার সঙ্কোচ হইল। কর্ণের গুরুভার উপেক্ষা করিয়া সে অপর দেওয়ালের দিকে আগাইয়া গেল।

'রুটি খেতে ভালো নয়, ভাত খেতে ভালো।' 'ছাতু খুব খারাপ;

কাল ছাতু হলে আমি কিছুতেই খাব না; না-খেয়ে ইস্কুলে আসব।' 'মংলু গোয়ালা দুধ দোওয়াচ্ছিল। আমি বললাম, আমার হাতে একটু দাও। মংলু দিয়েচে। খেতে খুব ভালো।' আগের বার রথের দিনে আমাদেরও দুধ এনেছিল; মনুয়ার কটোরাতে যা পড়েছিল, আমি সব খেয়ে নিয়েচি। পিটুলিগোলার চেয়ে ঢের ভালো!' 'আমি আজ খাইনি। কেন খাব? মাকে তো কালই বলেছিলাম, ছাতু আমি খাব না।—হোক্ গে শস্তা।' 'মায়ের মনে কষ্ট দিতে নেই। চাল কিনতে অনেক পয়সা লাগে, বুঝেচ?' 'আমার খুব ক্ষিদে পায়। অতোটুকু খেয়ে পেট ভরে না।' 'আমারও।' 'বেশি খেতে চাইলে পিতাজি কেবল বকবে কেন? ক্ষিদে পেলে বলতে পারবনা বুঝি, বাঃ! তবে ক্ষিদে পায় কেন?' 'মা বলে, জিনিষের খুব দাম বেড়েছে। আমাদের যে কম টাকা, একটুতেই ফুরিয়ে যায়।' 'তবে আর একটু বেশি টাকা আনোনা কেন? ক্ষিদে পেলে বুঝি কষ্ট হয় না?' 'খুব কষ্ট হয় ভাই। সব সময়েই আমার ক্ষিদে থাকে।' 'আর বার বিশ্বকর্ম্মার পূজোয় খুব পেট ভরে খেয়েছিলাম।' 'ইস্কুলের প্রাইজের দিনও।' 'রোজ পেট ভরে খেতে পারিনে কেন ভাই?' 'এমন ক্ষিদে পায়। দিদিকে বলবি ভাই?' 'দূর, ক্ষিদে পেলে কাউকে বলতে নেই। জোর করে চেপে থাকতে হয়।' 'ক্ষিদে পেলে বেশি করে জল খাস্, দেখিস, ক্ষিদে চলে যাবে।' 'তবু যদি ক্ষিদে পায়?'...

সুনীলা আর পড়িতে পারিল না; আশঙ্কা হইতে লাগিল, ইহার পরের পংক্তিতে আরও কোনও ভয়ঙ্কর সত্য উদ্ঘাটিত হইয়া হয়তো তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিবে। সভয়ে সে ক্ষুদ্র রুমালে চোখের দুই প্রান্ত মার্জ্জনা করিয়া লইল। পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিতে সাহস হইল না। পৃথিবীর বঞ্চিত হতভাগ্য মানুষদের ভাষা রূঢ় সত্যের মতো চোখের সমুখে প্রতিফলিত হইতে দেখিয়া সে যেন হতভম্ব হইয়া

গেল। এতদিন সে বুদ্ধি দিয়া অভাব ও অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিচার করিয়াছে, সহানুভূতি বোধ করিয়াছে। আজ তাহা আর বুদ্ধি-বিচার্য্য বিষয় নহে, নিজের জীবনের মধ্যেই তাহা অকরুণ আঘাতের মতো আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সমস্যার গুরুত্ব আজ সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল।

'বড়া সাব্ অন্দর হ্যায় ?'

'জী হুজুর', বলিয়া চাপরাসিটা সন্ত্রস্তভাবে টুল হইতে উঠিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। প্রভুকন্যা সচরাচর অফিসে আসেন না; কারখানার পূর্ব-প্রান্তের ইস্কুল-বাড়িতে রামস্বরূপ তাহাকে প্রত্যহ যাইতে দেখে, এবং মজুর-ছেলেদের ইস্কুলে তাহার নিত্য কি প্রয়োজন, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হয়। আজ ইহার উত্তেজিত, কিছুটা-বা বিহ্বল মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া রামস্বরূপ কম বিস্মিত বোধ করিল না। তাড়াতাড়ি সে ঠেলা-দরজার এক পাট্ খুলিয়া ধরিয়া প্রবেশ-পথ সহজতর করিবার চেষ্টা করিল।

'বাবা ?'

'আরেঃ, তুই এখানে কেন ?' পূর্ণেন্দুবাবু বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার ও-প্রান্তে ঘূর্ণ্যমান চেয়ারে হেলান দিয়া একটা ফাইল চোখের সমুখে ধরিয়া পড়িতেছিলেন, সুনীলার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেলেন। 'কি খবর মা ? এ-রকম মুখ-চোখের চেহারা করেছিস কেন ? বস্। তারপর ? এমন জরুরি কি ঘটল আবার ?'

সুনীলা না-বসিয়াই কহিল, 'আমার ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা না-খেয়ে মরে যাচ্ছে, তুমি কি এর কিছুই করবে না ?'

'মরে যাচ্ছে! কেন, মা ? কি ব্যাপার ?'

'এক-পেট ক্ষিধে নিয়ে তারা পড়তে আসে। ক্ষিধে বেশি হলে তারা জল খায়। একে অপরকে ক্ষিধে চেপে ফেলতে উপদেশ দেয়। বাড়িতে যথেষ্ট ওরা খেতে পায়না, বাবা।'

'সে কিরে!' পূর্ণেন্দুবাবু টেবিলে ফাইল নামাইয়া রাখিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। 'বাজার-দরের ওপর আমি যে আমার মজুরদের শতকরা অন্তত পঁচিশ টাকা বেশি মাইনে দিই।'

'তা হলে তাও খেয়ে থাকবার মতো যথেষ্ট নয়, বাবা।' সুনীলা এইবার চেয়ার টানিয়া বসিল। 'আমার ইস্কুলের শিশুদের তো সাজিয়ে বলবার মতো বুদ্ধি হয় নি। তারা সরল ভাবে যদি বলে. আমাদের ক্ষিদে পায়, খুব ক্ষিদে পায়, খাওয়াতে আমাদের পেট ভরে না ; চালের অত দাম বলে রোজ ভাত খেতে পাইনে, ছাতু খেতে হয় ; ভিক্ষে করে' একদিন একফোঁটা দুধ খেয়ে দেখেচি, খুব ভালো : বিশ্বকর্ম্মার পূজোর দিন মাত্র পেট ভরে খেয়েছিলাম, .বেশি ক্ষিদে পেলে অনেক জল খাস্, ক্ষিদে চলে যাবে,—তবে এর পর কোন্ মুখে ওদের বইয়ের বিদ্যে গেলাতে যাব? ওদের শুধু-পেটে আমার এই বিদ্যে কতটুকু ফল দেবে?—তোমাকে এর কিছু করতেই হবে, বাবা। ওদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থাটা তোমাকে করে দিতে হবে। ও-রকম করে' তাকালে চলবে না, বলে দিচ্চি। মাসে মাত্র এক হাজার করে' দিও, আমি তাতেই চালিয়ে নেব...'

'কত ছাত্র তোর ইস্কুলে?' পূর্ণেন্দুবাবু চশমার কাচ ঘষিতে ঘষিতে কহিলেন।

'ক্রেশের বাচ্চাদের নিয়ে প্রায় পৌনে দুশো।' সুনীলা আশান্বিত ভাবে কহিল। 'পরে হয়তো আরও কিছু বাড়বে। আমি মাথা-পিছু পাঁচ টাকা করে মাত্র ধরেচি...'

'কিন্তু সুনীলা-মা', পূর্ণেন্দুবাবু গম্ভীর ভাবে কহিলেন, 'টাকা দেবার

মালিক তো আমি একলা নই। আমি প্রস্তাবটা ওঠাতে পারি; কিন্তু বোর্ড অব ডিরেকটর্স অনুমোদন করলে তবেই মাত্র এ-টাকা মঞ্জুর...'

'হুঁ, আমি আর জানিনা', এইবার সুনীলা তুষ্টু হাসিয়া আহ্লাদে মেয়ের যোগ্যস্বরে কহিল, 'ভারি তো বোর্ড অব ডিরেকটর্স! তুমি যা বলবে, তাই হবে। তোমার ওপরে কথা বলবার যেন কারুর সাহস আছে! একবার করুক দেখি তোমার কথা অমান্য!—এই আমি বলে দিলুম, বাবা। এ তোমাকে করতেই হবে। আমার স্কুলের ছেলে-মেয়েরা খিদেয় পুড়তে থাকলে, বাড়ি গিয়ে আমি পেট-ভরে খাব কোন্ মুখে?' বলিয়া উদ্গত-অশ্রু গোপন করিয়া সুনীলা সশব্দে চেয়ার সরাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং আর কোনও দিকে না তাকাইয়া দমকা বাতাসের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পূর্ণেন্দুবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া সস্নেহ সস্মিত মুখে দরজার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, অতঃপর পরিত্যক্ত ফাইলটা টানিয়া লইয়া প্রশ্রয়ের স্বরে কহিলেন, 'আচ্ছা পাগ্‌লী মেয়ে!'

'শ্রদ্ধাস্পদেষু, সুপ্রকাশবাবু', নির্জ্জন দুপুরে কাচের দেওয়ালের দিকে পিঠ দিয়া পড়া-কাম্‌রার লেখার টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুনীলা লিখিয়া গেল, 'আপনার অনুমান সত্য নয়। রাশিয়ার ইস্কুলের নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে অহঙ্কার চূর্ণ হয়েচে। ছেলেদের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখে নিজেকে দেমাকী, উপর-সহানুভূতি সম্পন্ন, উট-পাখীর মতো সমস্যার সমুখে চোখ-বোজা জীব ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না। ছেলেদের মন্তব্যগুলি যেমন ব্যাপক, তেমনি লক্ষ্যভেদী। নিজের শক্তির অভাব, এবং হৃদয়ের প্রসারের অভাব দুটোই আমার কত বড়, সে-সম্বন্ধে নিজের মনে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। সত্যই যদি আরও বড় হয়ে কাজে লাগাতে পারতুম!...'

চিঠি লেখা সমাপ্ত করিয়া সুনীলা বড়ো একটা খাম টানিয়া লইল এ-চিঠি পাঠাইবে কি? কি প্রয়োজন? নিজের দুর্ব্বলতার কথা প্রকাশ করিলে কি অন্যের কাছ হইতে শক্তি সংগ্রহ করা যায়?

'যাক্ গে, এলেই সব বলব'খন', বলিয়া এতক্ষণের সযত্নে লেখা চিঠিটা সুনীলা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া বাজে-কাগজের ঝুঁড়ির মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল। 'রাষ্ট্রের প্রজাদের যদি মতামত জানাবার এমনি অধিকার দেওয়া হতো, তবে কটা রাষ্ট্র উৎরোবে? কটা রাষ্ট্র?'

এগারো

১৯৪২ সালের বসন্তকাল। ব্রিটিশ-সরকার স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌কে ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা মিটমাট করিবার জন্য এ-দেশে পাঠাইলেন পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বাধীনতা-রক্ষা ও গণতন্ত্র-রক্ষার বুলি আওড়াইবার পর ভারতবর্ষকে পদানত রাখা সারা পৃথিবীময়ই চোখ-ইসারার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চক্ষুলজ্জা কম হইলেও চার্চ্চিল-গবর্ণমেণ্ট ইহাতে কিছুটা অস্বস্তি বোধ না করিয়া পারিতেছিল না। আমেরিকার বিরূপ সমালোচনা হইতে রক্ষা পাইবার প্রয়োজন ছিল। তাহার উপর ভারতসীমান্ত পর্য্যন্ত জাপানের আগাইয়া আসাটা আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিল। এই রকম উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা রফার প্রস্তাব স্যার স্ট্যাফোর্ডের মারফৎ পেশ্ করিলেন।

স্যার স্ট্যাফোর্ড অল্পকাল পূর্ব্বে লাল রাশিয়ার সঙ্গে নীল ইংলণ্ডের মিটমাট ঘটাইয়া অসাধ্য-সাধন করিয়াছিলেন; ইহা ছাড়া তিনি

ভারতের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন এবং কংগ্রেসের নেতাদের পূর্ব্ব-পরিচিত। কাজটা এই জন্যই তাহাকে দেওয়া হইল।

ভারতের জন-সাধারণের মধ্যে এবারও আশা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। চাপে পড়িয়া ইংরেজ এইবার ন্যায্য আচরণ করিবে, এমন অনেকেই মনে করিতে লাগিল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি অবশ্য ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের অজুহাতগুলির দিকে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিল, তবু তাহারাও ইহার সম্ভাবনা অস্বীকার করিতে পারিল না। অবশ্য অনেকে এমন ইঙ্গিত করিল যে, ইহা চার্চ্চিলের সম্ভাব্য-প্রতিযোগীকে উৎখাত করিবার বড়ো চাল ছাড়া আর কিছু নয়; স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের রুশীয় সাফল্য তাহার প্রতিপত্তি এমন বৃদ্ধি করিয়াছিল যে, জবরদস্ত চার্চ্চিলের স্থলে তাহাকে প্রধান মন্ত্রী করার দাবি ওঠাও অসম্ভব ছিল না! ভারতবর্ষে অনিবার্য্য অসাফল্যের মধ্যে প্রেরণ করিয়া স্যার স্ট্যাফোর্ডকে সে-সুযোগ হইতে বঞ্চিত করাও নাকি তাহাকে পাঠানোর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে যাহাই হউক, অধিকাংশ ভারতবাসী ক্রীপ্‌স্-দৌত্যের ফলাফল দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

স্যার স্ট্যাফোর্ড যুদ্ধকালীন ব্যয়-সংক্ষেপের প্রতীক্ খাটো-কোট গায়ে পরিয়া নয়াদিল্লীতে আসিলেন, এবং পাছে দেশের লোক সন্দেহ করে যে তিনি বড়লাট কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইবেন, সেজন্য নয়াদিল্লীর নব-বাদ্‌শাহী প্রাসাদে না থাকিয়া আলাদা বাড়িতে আস্তানা গাড়িলেন। সেখানে দেশের নেতাদের সহিত তাহার দীর্ঘ আলোচনা চলিল। মহাত্মা গান্ধী আসিলেন, জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট আবুল কালাম আজাদ আসিলেন। জিন্না এবং অন্যান্য দলের নেতারাও আসিলেন। তবে স্যার স্ট্যাফোর্ড ইহাদের গুরুত্ব-নিরূপণে ইচ্ছাকৃত ভুল করিলেন না; তিনি বেশ জানেন, একমাত্র কংগ্রেসই সারা

ভারতবর্ষের হইয়া কথা বলিতে পারে, ভারতবাসীদের শতকরা নব্বুই ভাগই কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। কথাটা প্রধানতঃ কংগ্রেসের সঙ্গেই চলিল।

এক সময়ে সম্ভাবনা উজ্জ্বল মনে হইয়াছিল। অবিলম্বে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের একটা রাজনীতিক আপোষ হইবে, এমন আশা হইল। যুদ্ধের পরে ভারতকে পূর্ণ-স্বাধীনতা দান এবং এক কন্‌স্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি কর্তৃক দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন, এই সর্ত্তে যুদ্ধচলাকালীন পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্য দাবি না-করিতে কংগ্রেস স্বীকৃত হইল। বড়লাটের শাসন-পরিষদে যোগদান করিয়া যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সমর্থন ও সহায়তা করিতেও তাহারা এই সর্ত্তে রাজি হইল যে, যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধপরিচালনায় ব্রিটিশ সমর-কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় তাহারা হস্তক্ষেপ করিবে না, তবে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাহাদের ব্যবস্থার উপরও বড়লাট হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না; অযুদ্ধসম্পর্কিত বিষয়গুলিতে ভারতীয় মন্ত্রীদিগকে নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে চলিতে দিতে হইবে। মনে হইল, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স এই সর্ত্তে রাজি হইয়াছেন।

তারপর কোথায় কি কল টেপা হইল; স্যার স্ট্যাফোর্ড একদিন সহসা উল্টা সুর ধরিলেন। ভারতে ব্রিটিশ কূটনীতির সৃষ্ট বিভিন্ন ভুঁইফোঁড় উপদলগুলির অখণ্ড সহযোগিতা লাভ করিতে হইবে, এমন সর্ত্ত আরোপ করা হইল। নতুন শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয় দেশ-রক্ষা মন্ত্রীকে যুদ্ধসম্পর্কিত প্রচার, সৈন্যদের পানাহারের আস্তানা পরিচালনা, পেট্রোল-মজুদের ব্যবস্থা এবং সৈন্যবিভাগের কাগজ-পেন্সিল ফাইল-ফিতা সংগ্রহ ছাড়া দেশরক্ষার আর অন্য কোনও ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হইবে না জানা গেল। কংগ্রেস এবং পরে মুস্লিম লীগ এই অপমান-জনক সর্ত্ত প্রত্যাখ্যান করিল।

ভারতবাসী জনসাধারণের মনে এই সন্দেহ আরও দৃঢ়মূল হইল যে

চার্চিল ভারতীয় নেতাদের বড় চাকুরি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু এককণা ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত নহে। জওহরলাল নেহেরু বড়লাটের শাসন-পরিষদে সাক্ষীগোপাল হিসাবে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা মাহিনা পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে, এমন কল্পনাও তাহাদের কাছে হাস্যকর মনে হইল।

ব্রিটিশ প্রচার-বিভাগ কিন্তু দেশ-বিদেশে জানাইতে লাগিল, কংগ্রেস নিজেদের আধিপত্য চায়; ভারতবর্ষের অকংগ্রেসীদের স্বার্থ তারা বিবেচনা করে না। এই জন্যই ক্রীপ্‌স্‌-দৌত্য ব্যর্থ হইয়াছে। কংগ্রেস যুদ্ধ-চলার সময়ই গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন চায়; ইহা যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের শত্রুতা। হঠাৎ গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তিত হইলে শাসন-ব্যবস্থা চলিবে কি করিয়া? পরিবর্ত্তনের সময়ে বিরাট বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী; এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে জাপানী আসিয়া ভারতবর্ষে ঢুকিয়া পড়িবে যে!

সুপ্রকাশ এ-সম্পর্কে একটি ব্যঙ্গ প্রবন্ধ লিখিয়াছিল। তাহাতে চুণিলাল চাপ্‌রাসি জানাইল যে, সে কালা-আদ্‌মিদের দেশ ছাড়িয়া বিলাত-যাত্রা করিতেছে। শাসন-ব্যবস্থা কাহারা আর চালায়, সেক্রেটারি হইতে চাপ্‌রাসি বই অন্য কেউ নয়। সুতরাং শাসন-পরিচালনায় ব্রিটিশ-মুখপাত্রেরা যখন বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করিতেছেন, তখন ভারত-সরকারের তামাম কর্ম্মচারি বিলাতে রপ্তানি হইয়া যাওয়ারই কথা; নইলে শাসন-ব্যবস্থায় আর এমন গণ্ডগোল হইবে কেন? তাহারা এ-দেশে থাকিয়া গেলে শাসনকার্য্য তো পূর্ব্বের মতোই চলিতে পারে। মাথার উপরকার লোক-পরিবর্ত্তন সরকারি অফিসের দৈনন্দিন রুটিনে কোনও পরিবর্ত্তনই ঘটাইতে পারিত না। সুতরাং, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে, ভারতবর্ষের সব সরকারি কর্ম্মচারি পাইকারি ভাবে বিলাতে রপ্তানি হইতেছে। চুণিলাল চাপ্‌রাসির পুলকের হেতু এই।

মোহিতবাবু কিন্তু এ-বিষয়ে উৎসাহ দেখাইলেন না। কহিলেন, 'খবরদার, ওসব আর নয়। দেখচ তো প্রভুদের টেম্পার; ব্যঙ্গ-ট্যাঙ্গ বরদাস্ত করবে না। ডি, আই, রুল্‌-এর তুড়ুম ঠুকে দেবে।'

'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার একটা ব্যাখ্যা হালের আইনগুলিতে দেওয়া হয়েচে, দেখেচেন কি?' সুপ্রকাশ চোখ তুলিয়া কহিল।

'নাঃ, দেখিনি তো।' মোহিতবাবু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলেন। 'কোথায় দেখলে তুমি? কি লিখেচে?'

'যা উচিত মনে করো', সুপ্রকাশ কহিল, 'সংবাদপত্রে তা না-লিখবার সম্পূর্ণ অধিকার প্রত্যেক সম্পাদককেই দেওয়া হইল।'

ইহার পর কিছুকাল ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যর্থতা, সন্দেহ ও ইংরেজ-বিদ্বেষে পূর্ণ রহিল। ভারতের পূর্ব্ব-দুয়ারে জাপানীরা হানা দিয়া রহিয়াছে। মুদ্রা-পরিস্ফীতির দরুণ দ্রব্য-মূল্য বাড়িতেছে, যুদ্ধ-প্রচেষ্টার দরুণ সাধারণের উপযোগী পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে বহু মাল বিদেশে প্রেরণ করা হইতেছে। সকল দুঃখই সহ্য হইত যদি জানা যাইত, এই যুদ্ধ-জয়ে ভারতের লাভ প্রত্যক্ষ। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কূটনীতি এমন ধারণা গঠন করিতে সাহায্য করে নাই।

কংগ্রেস বহুদিন নিরুপায় হইয়া উদাসীন রহিল। অথচ দেশের অবস্থা বাহির হইতে আক্রমণের আশঙ্কায়, শোষণের ফলে, এবং অব্যবস্থায় এমনই সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল যে, নিশ্চুপ বসিয়া থাকা কংগ্রেস অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল। যুদ্ধের অবস্থা যখন ইংরেজের অনুকূল নয়, তখন একটু চাপ দিলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ন্যায্য দাবি মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কংগ্রেস মনে মনে ইহা ভাবিয়া

দেখে নাই, তাহা বলা চলে না। তবে মিত্রবাহিনীর যুদ্ধ-আদর্শের প্রতিই ভারতবর্ষ এবং কংগ্রেস সহানুভূতিশীল ; ফ্যাসিজমের এত বড় বিরোধী কংগ্রেসের মতো আর কেহ ছিল না। সুতরাং ইংরেজের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ কংগ্রেস এড়াইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে বোম্বেতে কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ও অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে 'ইংরেজ, ভারত ছাড়িয়া যাও'-নামক বিখ্যাত প্রস্তাবটি পাস্ হইল।

এই প্রস্তাব পাস্-এর পর কংগ্রেসের পরবর্ত্তী আচরণের জন্য ভারতের গো-প্রেমিক বড়লাট লিন্‌লিথ্‌গো অপেক্ষা করিলেন না। আমলাতন্ত্রের চণ্ডনীতি মুহূর্ত্তে প্রবর্ত্তিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ গ্রেপ্তার হইলেন ; কংগ্রেসের অপরাপর দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও হাজতে পোরা হইল ; ভারত গবর্ণমেণ্টের বিক্রম চকিতে আত্মপ্রকাশ করিল। কংগ্রেস-সমর্থক জনতা ক্ষেপিয়া গেল ; ক্রীপ্‌স-দৌত্য ব্যর্থ হইবার পর একেই একটা রুষ্টভাব সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল ; তাহার উপর জন-প্রিয় নেতাদের স্বাধীনতা-হরণ বহুলোককে সংযম-চ্যুত করিয়া ফেলিল। সরকারী সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, আইনের বিরুদ্ধাচরণ, পুলিস-থানার উপর হানা প্রভৃতি ব্যাপক হইয়া উঠিল ; ক্ষিপ্ত জনতা কোথাও রেল-লাইন তুলিয়া ফেলিয়া যুদ্ধপ্রচেষ্টার পক্ষে অত্যাবশ্যক যান চলাচলের ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিল। বিশৃঙ্খল আচরণ ফেনিল হইয়া উঠিল। কিন্তু সরকারী শাসন শক্তিমান। পুলিশের দাপট সার্ব্বভৌম হইয়া উঠিবার জোগাড় হইল ; বহুস্থানে গুলি ছুটিল ; কোথাও কোথাও শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্য ডাকা হইল ; আইন-সভাগুলিতে এমনও অভিযোগ করা হইল যে, উচ্ছৃঙ্খল জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট

বলিলেন, এই শান্তিভঙ্গের জন্য কংগ্রেসই দায়ি; তাহারাই ই প্ররোচিত করিয়াছে। কংগ্রেস-নেতারা সব জেলে; কারাগারের ভিতর হইতে তাহাদের বক্তব্যটা বাহিরে শোনা গেল না; কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বিষয়ে জনসাধারণ নিজ নিজ বুদ্ধি ও অভিরুচি অনুসারে সিদ্ধান্ত করিল মাত্র।

কলিকাতায় এই আন্দোলন প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের শোভাযাত্রা ও বিদ্রোহধ্বনি এবং ট্রাম পোড়ানোতেই আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু ইহাতেই যেন সারা শহরের জীবন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। নানা স্থান হইতে গুলি ছোঁড়ার নানান্ গুজব বাতাসকে পর্য্যন্ত ভারাক্রান্ত করিবার উপক্রম করিল। বোম্বের অনুকরণে মাথার হ্যাট ও গলার নেক্‌টাই আক্রমণ করাটা যে-কোনও বখাটে ছোঁড়ার পক্ষে একটা ব্যসন হইয়া উঠিল। উত্তেজনার অন্ত রহিল না। যেসব ছোক্‌রারা নানা উপদলের হইয়া কলিকাতার রাস্তায় 'জাপানকে রুখবে কে? আমরা,' হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে 'জাপানকে রুখবে কে? ইংরেজ'-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও প্রহৃত হইবার আশঙ্কায় কংগ্রেসের প্রকাশ্য বিরোধিতা করিতে বিরত রহিল। সমস্ত শহরটা গুজব, সন্দেহ, আশঙ্কা ও চাঞ্চল্যে ছাইয়া গেল।

সুপ্রকাশ বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নলিনী বৌদি খবর পাঠাইয়াছেন; বিপিনদার অবস্থাটা নাকি আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে, একবার না-গেলেই নয়। বিপিনদার সেই বিশ্রী কাশিটা যে সাধারণ কাশি নয় তাহা কিছুদিন পরেই টের পাওয়া গিয়াছিল। বেঙ্গল কেমিক্যাল তিন মাসের পূরা মাহিনায় ছুটি মঞ্জুর করিয়াছে। বাহিরে বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইতে পারিলে ক্ষয়রোগীর পক্ষে উপকারের

সম্ভাবনা বেশি; কিন্তু তাহার উপায় ছিল না। কলিকাতাতেই যথাসাধ্য চিকিৎসা হইতে লাগিল।

প্রতি সপ্তাহেই সুপ্রকাশ একবার করিয়া তাহাকে দেখিতে যাইত। কিন্তু এই আগস্ট-আন্দোলনের উত্তেজনা এবং সমস্যা সংবাদপত্র অফিসের পক্ষে এত বেশি ছিল যে, গত দুই সপ্তাহ সে আর কোনও খোঁজ-খবর লইতে পারে নাই। আজ সহসা টেলিফোনে নলিনী বৌদির কাছ হইতে জরুরি তাগিদ আসিয়াছে।

'আজ্ঞে, একটা কথা ছিল, স্যার, সুপ্রকাশবাবু। এখন সময় হবে কি, না রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে আসব? এমন কিছু তাড়া নেই, তবে কিনা…'

বীরেশ্বরবাবু সুপ্রকাশকে বেশ একটু সমীহ করিয়া চলেন। সমীহ করাটা তাহার প্রকৃতিতে দাঁড়াইয়া গেছে; তার স্থান নিচুতে, অন্যেরা তাহার চাইতে বড়, বিনয়ী হওয়া তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য, এই পাঠটা তাহাকে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িতে হইয়াছে যে এখন আর তাহাতে ভুল হয় না।

'কে, বীরেশ্বরবাবু? আসুন।' সুপ্রকাশ কহিল: 'কি বলবেন বলুন!'

'স্যার সুপ্রকাশবাবু', বিছানার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া যেন একটা গোপনীয় তথ্য ফাঁস করিয়া দিতেছেন এমনই স্বরে বীরেশ্বর-বাবু কহিলেন, 'একটা পরামর্শ দেব, কিছু মনে করবেন না, স্যার। আজ্ঞে খবরটা কিনা আজকেই শুনতে পেলাম; তাই ভাবলাম আপনাকেও বলে যাই। আপনার কাছে কত ভাবে উপকৃত হই…'

'ব্যাপার কি?' বিস্মিত হইয়া সুপ্রকাশ প্রশ্ন করিল।

'স্যার, ভিতরের থেকে বেশ বিশ্বস্তসূত্রেই খবর পেলাম। কুইনিনের

সম্বন্ধে। দামটা নাকি দেখতে দেখতে হু-হু করে বেড়ে আট দশগুণ হ'য়ে উঠবে। স্টক কম আছে, চেপে দিলেই দাম আগুন হয়ে উঠবে নিজেও স্যার, সুপ্রকাশবাবু, কি বলব আপনাকে, পুঁজিপাটি স কুড়িয়ে দু'তিন শো টাকার কিনে ফেলচি। আর দু'চার শো টাক ধার-হাওলাত পেতাম তো বরাত ঠুকে দেখতাম। যুদ্ধের কৃপায় সবাই মশায় লাল হয়ে উঠচে, আমরাই শুধু হা অন্ন হা অন্ন করে মরচি আমি বলচি কি, স্যার সুপ্রকাশবাবু, এই বেলা আপনিও কিছু কি লুকিয়ে ফেলুন; বরাতে থাক্‌লে চাই কি শতকরা হাজার টাকা মুনাফ হ'তে পারে। খবরটা পেয়েই ভাবলুম…'

'কুইনিন কিনে কি হবে?' সুপ্রকাশ হাসিয়া কহিল, 'ও খাবে কে? লজেঞ্জুষ হলে না-হয়, একবার ভেবে দেখা যেত, সময়ে-অসম তবু খেতে পারতাম…'

'আজ্ঞে না, কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবেন না', বীরেশ্বরবাবু গম্ভীর ভাবে কহিলেন। 'আপনার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি বলেই কথাটা বলতে এসেচি। নইলে ঘুণাক্ষরেও এ-খবর কাউকে জানা না বলে দিব্যি কেটে' তবে…'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ', এবার সুপ্রকাশও একটু গম্ভীরভাবেই কহিল। 'কিন্তু ব্যবসা করা আমার কাজ নয়; ওষুধ লুকিয়ে রেখে লোক-মারা ব্যবসা তো নয়ই। যাক্ গে। এইবার একটু বেরুতে হবে যদি আর কিছু দরকার থাকে, বলুন।'

'আর একটা কথা ছিল, স্যার', দমিয়া গিয়া বীরেশ্বরবাবু কহিলেন 'বড় জ্বালাতন হয়ে এ-কথা আপনাকে জানাতে এসেচি। আজ্ঞে, আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যাটার কথা বলচি। উঠতে বসতে কি অত্যাচারটাই করচে। কুলির মতো খাটাচ্চে, চাকরের মতো হুকুম করচে, কথায় কথায় রেগে টং হয়ে ভদ্রলোকের ছেলেকে অকথ

গালিগালাজ করচে। ঘেন্না ধরে গেছে চাকরিতে; মুদির দোকান-টোকান একটা খুলে বসতে পারতাম তো বাঁচতাম। কিন্তু তার মূলধন কই? অথচ বাড়িতে এতগুলি পোষ্য, ফস্ করে' কিছু করে' বসতে পারিনে। মার খেয়ে চুপে চুপে মার হজম করতে হয়। কিন্তু মানুষের শরীর তো, স্যার, সুপ্রকাশবাবু, কত আর সয় বলুন?'

'আমি কি কিছু করতে পারি?' সহসা সুপ্রকাশের কণ্ঠস্বর সহানুভূতিতে কোমল হইয়া উঠিল।

'দিন্ না স্যার আপনার কাগজে দু লাইন লিখে; ঢিট্ হয়ে যাবে। খবরের কাগজের নামে বড়সাহেব পর্য্যন্ত খাবি খায়...'

'কিন্তু খবরের কাগজের মন্তব্যের গণ্ডি যতটা ব্যাপক মনে করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে ততটা ব্যাপক নয়।' সুপ্রকাশ ব্যথিত মুখে কহিল। 'যেটা স্পষ্ট, যা অন্তত মোটামুটি প্রমাণ করা চলে এবং যে খবর কোনও বিশেষ ঘটনা-আশ্রিত, আমাদের শুধু তারই উপর মন্তব্য করবার অধিকার আছে। যদি কোনওদিন এমন কোনও সুস্পষ্ট জুলুম ঘটে, তবে ঘটনাটা জানাবেন। দেখব, আপনার উপকারে লাগতে পারি কিনা...'

'আজ্ঞে মুস্কিল তো এইখানেই;' বীরেশ্বরবাবু ক্লিষ্টস্বরে কহিলেন। 'অফিসের, বিশেষ করে' সরকারি অফিসের মুস্কিলটা তো, স্যার, এইখেনেই। সব রুটিন-বাঁধা; রুটিনের বাইরে না গিয়ে যতক্ষণ রক্ত-শোষণ করচ, কিছু তোমার ভাবনা নেই। তোমার বিরুদ্ধে কোনও নালিশই উপরওলার কাছে টিকবেনা। আর ছোটখাটো অত্যাচার করে' জীবনটা যে কি রকম বিষিয়ে তোলা যায়, তা বলবই বা কাকে, আর প্রমাণ করবই বা কি দেখিয়ে...'

'বেশ, আমাকে একদিন সব খোলাখুলি ভাবে বুঝিয়ে বলবেন', সুপ্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল। 'দেখি কি করতে পারি। কিন্তু

সাধারণ ভাবে এ-ব্যবস্থার সমালোচনা করে' ব্যক্তিগতভাবে আপনার কোনও উপকার করতে পারব, এমন ভরসা কম। এসব হলো একটা পচা শাসন-পদ্ধতির ফল। কলমের খোঁচায় একটা চালু ব্যবস্থা রাতারাতি উল্টে দেওয়া অসম্ভব।...পৃথিবীর অধিকাংশ চাকুরিজীবীই বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আপনার মতো অভিযোগ বোধ করেছে, সম্ভব হলে এই কথাটা মনে করে' ধৈর্য্য ধরে' থাকুন।—কিন্তু এইবার আমাকে যেতে হচ্চে: বিমল কোথায়? সে কি বলে? এ-ব্যবস্থাটা কি তারা শীগ্‌গির ওল্টাতে পারবে?' শেষ কটি কথায় পরিহাসের এবং প্রশ্রয়ের সুর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

'রেখে দিন স্যার, ওদের ব্যবস্থা।' বীরেশ্বরবাবুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। 'বলে কিনা সব ব্যবসা-পত্তর, অফিস-কারখানা, দোকান-পাট, খেত-খামার সরকারি সম্পত্তি হয়ে যাবে। স্বাধীনভাবে কেউ ব্যবসা চালাতে পারবে না; সব্বাই হবে সরকারি কর্ম্মচারি! এখন, মশায়, তেমন তেমন হলে 'তুত্তোর' বলে কাজে ইস্তাফা দিয়ে মুদির দোকান খুলে বসতে পারি; বিমলদের ব্যবস্থা হলে তারও উপায় থাকবে না। তখন আর অত্যাচারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জবরদস্ত মাতব্বর উপরঅলা থাকবেনা মনে করেন? ভুলেও তা ভাববেন না। ক্ষমতা হাতে পেলে খাটাবার প্রবৃত্তি হবেই। কিন্তু ওদের ব্যবস্থায় পালিয়ে বাঁচব, তারও উপায় নেই। গোলামি, গোলামি, বাঁচোয়া-হীন গোলামি! না, মোশায়, আমি ওর মধ্যে নেই। সারা দেশটাকেই যে আপনারা সরকারি-অফিস বানিয়ে তুলবেন, দোহাই আপনাদের, সেটি করবেন না। মরে যাব, স্যার সুপ্রকাশবাবু, নিঃশ্বেস বন্ধ হয়ে মরে যাব!' বলিতে বলিতে বীরেশ্বরবাবু ভয়-পাওয়া কুকুরের মতো যেন প্রায় লেজ গুটাইয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

'প্রকাশ ঠাকুরপো! এস, ভাই, এস। বড় বিপদে প'ড়ে তোমাকে খবর পাঠিয়েছি। ডাক্তার কাল আর আজ দুদিনই এসে-ছিলেন। বলে গেলেন, ফুস্‌ফুস্‌ আরও ভারি মনে হচ্চে, শ্বাস-প্রশ্বাস ভালো বোধ হচ্ছে না। হার্ট তো রীতিমতো দুর্ব্বল। এদিকে ছেলেরা শোভাযাত্রা করে' 'বন্দে মাতরম্' বলে চেঁচিয়ে যাচ্চে, আর উনি ক্ষণে ক্ষণে চিৎকার ক'রে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠ্‌চেন। বারণ শুনচেন না, নিষেধ মানচেন না। যেন বদ্‌লে গিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে উঠেচেন।'

একতলার রান্নাঘরের সমুখে' বিপিনদার স্ত্রী নলিনী বৌদি প্রায় সজল চক্ষে বিপদের কথাটা সুপ্রকাশকে জানাইলেন। লম্বা, ময়লা, পয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের অকালে-বুড়াইয়া-যাওয়া মেয়ে; খাটিয়া খাটিয়া দেহ অস্থিচর্ম্মসার, মুখে ক্লান্তি, চোখে উদ্বেগ। কপালে সিঁদুরের টিপ্‌টা বড় করিয়া আঁকা। হাতের শাখা সেবাময়ীর নিদর্শন-পত্রের মতো উজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইতেছে।

'চলুন, ওপরে যাই।' সুপ্রকাশ কহিল।

'তুমি যাও। আমি দুধটা গরম ক'রে নিয়ে আসি, ভাই।'

ঘরের বাহির হইতেই সুপ্রকাশ দেখিতে পাইল। উস্কুখুস্কু চুল, রুগ্ন, কণ্ঠা বাহির-হওয়া দেহটা ক্ষীণ পা-জোড়ার উপর যেন অতি বিপজ্জনক ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। যেন একটা উন্মাদরোগী চিকিৎসা-শালা হইতে ছাড়া পাইয়া ছুটিয়া পালাইয়া আসিয়াছে। জানালার গরাদ মুঠাতে শক্ত করিয়া ধরা, কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, না-কামানো দাড়িতে গাল সমাচ্ছন্ন। বাহিরের দিকে তীক্ষ্ণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া বিপিনদা চিৎকার করিয়া কহিতেছেন, 'সাবাস্‌, ভাইরা, সাবাস্‌! লাফিয়ে ওঠো, মেতে ওঠো, ছুটে চলো, জান্‌ কবুল। জান্‌ কবুল। সাবাস্‌ বীর, বাপ্‌কো ব্যাটা, সাবাস্‌ বীর…'

'ও কি হচ্ছে, বিপিনদা?' সুপ্রকাশ ভিতরে ঢুকিয়া শাসনের সুরে কহিল। 'চলে আসুন। আপনার শরীর অসুস্থ, বিছানা থেকে ওঠা আপনার বারণ।'

বিপিনদা চম্‌কাইয়া মুখ ফিরাইয়া সুপ্রকাশকে দেখিলেন। তাহার উত্তেজনা-চঞ্চল মুখটা যেন উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন 'ওরে সুপ্রকাশ এসেছিস, এসেছিস, এসেছিস তুই? দেখ একবার চেয়ে, একবার দেখ! লেগেচে, লেগেচে, যুদ্ধ লেগেচে এবার। ভয় করে ওরা, কাউকে ভয় করে? লাল-পাগ্‌ড়ীতে ছেয়ে গেছে সেণ্ট্‌ জেমস্‌ স্কোয়ারটা। তাতে কি ওরা ভয় করে? একবার চেয়ে দেখ সোনার দুলালদের। চেয়ে দেখ ওদের বুকের সাহস, উঁচু মাথার তেজী ভঙ্গি···

'বিপিনদা, আসুন', বলিয়া সুপ্রকাশ আগাইয়া গিয়া তাহার হাতের ডানা ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। 'অসুস্থ শরীরে অনাবশ্যক উত্তেজনা দেখিয়ে আপনি কি আত্মহত্যা করতে চান?'···

'মরতে চাই, মরতে চাই রে, সুপ্রকাশ', বিছানায় এলাইয়া পড়িয়া একটা ক্লান্ত শিশুর মতো অবসন্ন-স্বরে বিপিনদা কহিলেন, 'এর জন্য যে মরতে চাই। আমার সারা জন্মের সাধনা এরা যে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। বাঁশি উঠেচে বেজে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়েচে সব, উঠেচে রক্ত-কাঁপানো হাঁক; পুরানো সৈনিক, কি করে বদ্ধ-ঘরে আট্‌কে থাকি ভাই!···'

'এ সব চল্‌বে না, বিপিনদা', সুপ্রকাশ প্রায় নির্লিপ্ত কণ্ঠেই বলিতে সক্ষম হইল। 'আহত অসুস্থ সৈনিক যুদ্ধ করে না। এটা যদি যুদ্ধই হয় তবু এতে আপনার অংশ গ্রহণ করবার অধিকার নেই।—চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার কাছে বসে অনেক আমি গল্প শোনাচ্ছি।'

'না না, কাছে নয়, অত কাছে নয়', বিপিনদা সহসা আদেশের কণ্ঠে

কহিলেন। 'যক্ষারুগীর এত কাছে কিছুতেই আসতে পারবি না। ঐ চেয়ারটা টেনে বস। কি গল্প বলবি, বল? জানিস যদি, দেশের অন্য জায়গায় কি ঘটচে, তাই বল। দেয় কিছু তোদের খবর, না সব চেপে দেয়?—বন্ধ কর্, বন্ধ কর্, শীগ্‌গির বন্ধ করে দে জান্‌লাটা। ওদের হাঁক শুনলে আমি কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারি না।'

সুপ্রকাশ উঠিয়া পার্কের ধারের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

বারো

'ছি, সুমি, এমন করতে নেই। যা হয়েচে, তার আর চাড়া নেই, তাকে স্বীকার করে' নিতেই হবে। শুধু শুধু শরীর নষ্ট করে', নিজেকে বিপন্ন করে' লাভ কি? যে আসচে, তাকে মেনে নিতেই হবে। একবার ভেবে দেখ, দুঃখ কি আমারই কম, হতাশা কি আমারই কম হয়েছিল? আমি যে তোর বড় বোন; তোর বিপদ কি আমারও বিপদ নয়? কিন্তু এর জন্য আমি তো নিজেকে প্রস্তুত করেচি।—যা, ওঠ লক্ষীটি, গা-হাত ধুয়ে, কাপড় বদ্‌লে, একটু পরিষ্কার হয়ে নে। শরীর-মন দুদিকেই এখন নজর দিতে হবে...'

শুইবার ঘরের সিঙ্গেল খাটের উপর সুমিতা মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল, ডানা-ভাঙ্গা, বাণবিদ্ধা পক্ষিণীর মতো। রোদন-উদ্বেলিতা ছোটবোনের এলোমেলো চুলভরা মাথায়, অসম্বৃত-বাস পিঠে, শিথিল স্কন্ধে সুজাতা বারবার স্নিগ্ধ হাত বুলাইয়া দিলেন। ইহার সকল দুঃখের অংশ গ্রহণের জন্য তিনি যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন।

'ওঠ, সুমি, ওঠ। কেঁদে কিছু লাভ নেই। ওতে দুঃখের অবসান হয় না, ওতে বিপদের বন্ধু খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজেকে নিজের ওপরই ভরসা করতে হয়। এত বড় বন্ধু আর নেই...'

সুমিতা সহসা বালিশ হইতে অশ্রু-বিকৃত মুখ উঠাইয়া সোজা হইয়া বসিল। অল্প দুয়েক মাসের মধ্যে অনেকগুলি বছর যেন তাহার উপর দিয়া অতি দ্রুত পদবিক্ষেপে পার হইয়া গিয়াছে। মুখের বর্ণ ফ্যাকাশে, চোখ দুটি সামান্য ভিতরে বসিয়া গিয়া বড় বেশি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, গলাটা কাঁধ হইতে বেশ যেন খাঁজ কাটিয়া উঠিয়া গেছে, গায়ের রং আগেকার চাইতে আরও যেন পরিষ্কার।

'দিদি, কেন তুমি আমাকে সহ্য করচ? কেন আমার জন্য উদ্বেগে সারা হচ্চ? কেন আমাকে ঝেঁটিয়ে আস্তাকুড়ে ফেলে দিচ্চ না? সেটাই যে আমার যোগ্য স্থান...'

'কি বলচিস, পাগলের মতো।' সুজাতা স্থিরকণ্ঠে, সহানুভূতি-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন। 'যা, তৈরি হয়ে নে। আমি চায়ের জায়গা দিতে বলে এসেচি...'

'কিচ্ছু করিনি আমি তোমার জন্য, দিদি', সুমিতা কহিল, 'তোমার কথা মেনে তোমাকে একটু আনন্দ দেব, তাও কোনও দিন করিনি। কত উপদ্রব করেচি। কিন্তু আর কত অত্যাচার করব তোমার স্নেহের উপর? আমার কলঙ্ক দিয়ে তোমার বাড়িটাকে কালো করতে পারব না। আমার পেটের শত্রুটাকে যদি নষ্ট করতে নাই দেবে, তোমার কথা অমান্য করে পাপের মাত্রা আর বাড়াব না। কিন্তু এখানে আর নয়। দূরে, কোথাও অনেক দূরে, চলে যেতে দাও...'

'ছি, আমি যে তোর দিদি। বিপদের দিনে কি তোকে ছেড়ে দিতে পারি। তোর পাগ্‌লামি রাখ। এবার হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নে।'

'ঘেন্নায় যে মরে যাই, দিদি। সারাটা শরীর কুঁকড়ে কুঁকড়ে ওঠে। যেন একটা পচা গন্ধ...'

'ও বলতে নেই।' গম্ভীরভাবে সুজাতা কহিলেন। 'শত হোক, তোর নিজের পেটের ছেলে। ওর তো কোনও দোষ নেই, সুমি। মহারহস্যের মধ্যে থেকে অন্তহীন পথ বেয়ে ভোরের আলোর মতোই এই অনাগত শিশু পৃথিবীতে আবির্ভূত হবার জন্য যাত্রা করেচে।... সুপ্রকাশ আজ সারা দুপুর আমাকে মেটারলিঙ্কের 'ব্লু বার্ড' থেকে পড়ে শোনাল...'

যেন ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সুমিতা এমনই চমকাইয়া উঠিল। প্রায় বিকৃত-কণ্ঠে কহিল, 'বলে দিয়েচ তো, সুপ্রকাশবাবুকে সব কথা। বেশ, বেশ দিদি, খুব ভালো করেছ! বাইরে মুখ-দেখাবার কোনও উপায়ই আমার রাখলে না...'

'আমাদের এত বড় অকৃত্রিম সুহৃৎ আর কেউ নেই, সুমি', সুজাতা কহিলেন। 'এত বড় বিপদে তার সহায়তা, তার পরামর্শ ছাড়া আমাদের চলত কি করে?'

'দিদি, তুমি যাও। তাকে চা দাওগে।' বাঁ হাতের উল্টো পিঠে কপালটা রাখিয়া সুমিতা কহিল। 'দোহাই তোমার, আমি বাইরে গিয়ে তার কাছে উপস্থিত হতে পারব না। তার চোখের সেই মাস্টারি-দৃষ্টি আমি সইতে পারব না। দেমাকীবাবুর নাকটা বোধহয় বেঁকে এতক্ষণে হাতির শুঁড়ের মতো হয়ে উঠেচে; আমি বিষ খেয়ে শেষ হবো, তবু তার কাছে যেতে পারব না! সত্যি করে বলো তো দিদি, তার নাকটা কতটা ঠেলে উঠেচে, কি উপদেশ বর্ষণ করলেন এমন অপবিত্র খবর শুনে...'

'বললে, ভূপতি চাটুয্যেটা একটা 'ক্যাড্'। ভদ্রলোক হলে, বাপের দোহাই দিয়ে এমন করে দায়িত্ব এড়িয়ে পালিয়ে যেত না। ইতরামি করবার সময় বাপ আসেন না, কর্ত্তব্য করবার সময় বাপ বাধা হয়ে উপস্থিত হন...'

'দোহাই দিদি, ঐ নামটা আমার কাছে আর করো না। আমার সারা শরীর কুঁচকে ওঠে। তুমি কি মনে করো, ভূপতি বিয়ে করতে চাইলেই আমি রাজি হবো? তা কক্ষনো ভেবো না। আমি বরঞ্চ মরব, তবু নরকের সঙ্গে চিরকাল বাসা বেধে থাকতে পারব না।'

'এ-জেদের কোনও মানে হয় না, স্থমি। তুই জোর করলে, এখন সে হয়তো রাজি না হয়ে পারত না।'

'রাজি তো হয়েইছিল সে', স্থমিতা রহস্যভরা কণ্ঠে কহিল, 'ডাক্তার ব্যানার্জ্জির ক্লিনিকে কাম্‌রা ঠিক করে' দিতে। তুমিই তো রাজি হলে না দিদি!—হয়তো তাই ভালো ছিল। একটা অবাঞ্ছিত সন্তানের দায় হতে মুক্ত হতে পারতাম। সতী নারী হয়ে সমাজে আবার সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতাম, আমার দিকে আঙুল দেখার সাধ্য কার? এতে কি বলেন তোমাদের দেমাকীবাবু?'

'বলেন, স্থমিতা যদি সমাজের পচা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়, তবে অন্তত আমি আছি তার পক্ষে! সমাজকে ভয় করিনা, সমাজের বিধানকে ভ্রূক্ষেপ করিনা বলে সে বড়াই করত। অথচ বিদ্রোহ দেখাবার যুক্তিযুক্ত কারণের যখন উদ্ভব হয়েচে, ঠিক তখন যদি তার পালিয়ে যাবার প্রবৃত্তি জাগে, তবে জানব তার বড়াইটা ছিল আগাগোড়াই ছ্যাবলামি, উচ্ছৃঙ্খল হবার অজুহাত।'

'থাক, থাক, আর শুনতে চাইনে গুরুমশায়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অমৃত-বাণী। তুমি যাও, তাকে চা দাওগে! আমাকে একটু চুপ করে' একলা থাকতে দাও।' বলিয়া স্থমিতা পুনর্ব্বার বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইল।

বৌবাজার ও সার্কুলার রোডের জংশনে স্থপ্রকাশ ভারাক্রান্ত মনেই নামিয়া পড়িল, এবং বিপজ্জনক রাস্তাটা প্রায় অন্যমনস্ক ভাবেই পার

হইয়া বৌবাজার দিয়া সেণ্ট্ জেমস্ স্কোয়ারের উদ্দেশে পশ্চিম দিকে সোজা হাঁটিয়া চলিল। সুমিতার এই দুর্গতির কাহিনী শুনিয়া প্রথমে সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল; ক্রমে সহানুভূতি ও বেদনায় তাহার চিত্ত যুগপৎ আর্দ্র ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল! বেচারি সুমিতা! প্রকৃতি যে মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতার একটা মাত্রা স্থির করিয়া দিয়াছেন, তা সে ভুলিয়া গিয়াছিল! শাস্তি তার প্রাপ্য। অথচ কোথায় যেন ইহার মধ্যে একটা অযৌক্তিকতা আছে। সমাজকে সেলাম করিলেই যে-মিলন ভদ্র হইয়া উঠিতে পারে, তাহা মাত্র সেলামের অভাবে ঘৃণিত প্রমাণ হওয়ার কোনও নৈতিক যুক্তি আছে কি, না সে যুক্তি আগাগোড়াই সামাজিক, তাহা ভাবিবার মতো। সমাজ অবশ্য বলিতে পারে, তোমাদের শুভাশুভের জন্য আমার দায়িত্ব আছে, সুতরাং স্বেচ্ছাচার চলিবেনা। কিন্তু দায়িত্ব কি সত্যই আছে? যদি বিবাহিত পুরুষ স্ত্রী এবং সন্তানকে পরিত্যাগ করে, তবে সমাজ তাহার কাছ হইতে একটা আর্থিক জরিমানা আদায় করা ছাড়া আর কি করিতে পারে? ১৯৪২ সালের হিন্দু-সমাজও এমন অবস্থায় স্বামীর অধিকার হইতে স্ত্রীর মুক্তি অনুমোদন করিবে না; নতুন জীবন আরম্ভের সুযোগ হইতে সে বঞ্চিত থাকিবে। পুরুষের স্বেচ্ছাচার সম্বন্ধে সমাজ মহাতপস্বীর মতো চোখ বুজিয়াই থাকে। তবে দায়িত্বের অজুহাতে মানুষের স্বাধীন আচরণের উপর বিচার করিবার ক্ষমতা কোথা হইতে আসে? হয় পুরাপুরি শাসন করো, নয় পুরাপুরি স্বাধীনতা দাও; পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া শাসন করিতে আসিলে ন্যায় হইতে পক্ষপাতকেই বেশি সম্মান দেখান হয়।—ভিড়ের মধ্যে একটা অব্যক্তিক নির্জ্জনতা আছে; এই নির্জ্জনতার মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে সুপ্রকাশ এলোমেলো চিন্তা করিতে লাগিল। নরনারীর মিলনে রাশিয়ায় যে স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার যুক্তি সেই পথে তাহার প্রায়

অজ্ঞাতসারেই অগ্রসর হইল। কিন্তু সংস্কার বশেই হোক বা নৈতিক আদর্শের দরুণই হউক, কর্ত্তব্যবোধহীন, দায়িত্ববিবেচনাহীন চপলতাকে অনুমোদন করিতে কোথায় যেন দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল,—কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইল।

কিন্তু স্বেচ্ছাচার অনুমোদন করা এবং বিবাহের বাহিরে জাত শিশুর অধিকার সমর্থন এক নহে। জারজ সন্তানকে অপাংক্তেয় করিবার যুক্তি অ-যুক্তি এবং বিবেচনাহীন অত্যাচার বলিয়াই সুপ্রকাশ বিবেচনা করে। কাজটা ভালো হোক, মন্দ হোক, যাহাতে আমার কোনও হাত নাই, তাহার দায়িত্ব এবং তাহার জন্য শাস্তি আমার প্রাপ্য হইবে কেন? ইতিহাসে অসভ্য জাতিদের মধ্যে ব্লাড-ফিউড প্রচলিত ছিল দেখা যায়; সে নীতি অনুসারে পিতার অপরাধে পুত্রের রক্তপাত করা অন্যায় বা অস্বাভাবিক বিবেচিত হইত না। সেই ব্লাড-ফিউড যে অন্য আকারে আধুনিক সুসভ্য সমাজেও প্রচলিত আছে, কয় জন তাহা ভাবিয়া দেখে? নহিলে জীবতত্ত্বের দিক দিয়া বিবাহিত এবং অবিবাহিত পিতামাতার শিশুর মধ্যে তফাৎ কোথায়?

সহসা সুপ্রকাশ চম্‌কাইয়া দেখে. অদূরের পার্কে অসংখ্য মানুষের ভিড়। আশেপাশের গাছগুলিতে মানুষের ভিড়, বাড়ির জানালাগুলিতে মানুষের ভিড়। শীঘ্র ইহাদের কোলাহলও সুপ্রকাশের কানে আসিল। ভিড়ের মধ্যে পুলিশের লাল পাগড়ী ও পুলিস-সার্জ্জেণ্টদের শাদা টুপিও দৃষ্টিগোচর হইল। সুপ্রকাশ বুঝিল, আজও আগস্ট-আন্দোলন সম্পর্কিত মিটিং হইতেছে। চাঞ্চল্য খুবই তীব্র মনে হইতেছে। গুলিটুলি ছোটে নাই তো? কাছাকাছি গিয়া একবার দেখিয়া আসিবে কি? সংবাদ খুঁজিবার প্রবৃত্তিটা নাড়াচাড়া দিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা সংবরণ করিয়া সে বিপিনদার বাড়ির দিকে জোরে পা চালাইল। এ উত্তেজনার মধ্যে সে আবার কেমন ক্ষেপিয়া গিয়াছে কে জানে? নলিনী বৌদির পক্ষে

তাহাকে সাম্‌লানো কি সহজ কথা ? কি হইবে সংবাদ খুঁজিতে গিয়া ? এ-সংবাদ তো কাগজে ছাপানো যাইবে না !

'ঠাকুর-পো, শীগ্‌গির যাও, ছুটে যাও। তোমার দাদা ! তোমার দাদা ছুটে গিয়েছেন ঐ ভিড়ের মধ্যে। পাগল, পাগল হয়ে উঠেচেন…'

সদর-দরজার মুখে নলিনী বৌদি নিজেও পাগলের মত টলিতেছিলেন ; ভয়-বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি, উস্কুখুস্কু চুল, মুখে উদ্বিগ্ন আশঙ্কা যেন এক ছোপ্ কালি লাগাইয়া দিয়াছে। শুধু কপালের বড় সিন্দুরের বিন্দুটাই জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে।

'বিপিনদা ? ঐ ভিড়ের মধ্যে ? কখন গেলেন ?' সুপ্রকাশের কণ্ঠও উদ্বেগে জড়াইয়া আসিল।

'এই মাত্র। এই মাত্র। আর দেরি করো না ; ছুটে যাও। ছুটে যাও। এতক্ষণে সব বুঝি শেষ হয়ে গেছে। এই মাত্র, এই মাত্র গুলির শব্দ শুনেচি…'

'আপনি ঘরে গিয়ে বসুন। আমি যাচ্ছি,' বলিয়া সুপ্রকাশ পার্কের দিকে দৌড়াইল।

পার্কের দরজাটার মুখে গোটা কয়েক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পুলিস-সার্জ্জেণ্ট ফটক পাহারা দিতেছিল। সুপ্রকাশ কাছাকাছি অগ্রসর হইতেই তাহারা মামুলি সম্ভাষণ করিল,' 'গেট্ আউট্।'

'আমার এক অসুস্থ আত্মীয় এই মাত্র ছুটে পার্কের মধ্যে ঢুকেছেন ; আমি তাকে উদ্ধার করতে এসেচি। আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও।'

'গেট্ আউট্।'

'আমার কথাটা কি তুমি শুনচ না ? গেট্ আউট্, গেট্ আউট্

করচ। আমি আন্দোলন করতে আসিনি। গুরুতর অসুস্থ, বিকৃত-মস্তিষ্ক একজন লোককে এখান থেকে সরিয়ে নিতে এসেচি…'

'গেট্ আউট্!' পিস্তলটা ভয় দেখাইবার উদ্দেশে উঁচু করিয়া সার্জ্জেনটা কহিল।

ইহাদের ভাষার পুঁজির মধ্যে 'গেট্ আউট্'টাই সব চাইতে মূল্যবান, তাহা সুপ্রকাশ জানে। যুক্তি দেখানো ইহাদের কাছে বৃথা, তাহাও সে কম জানে না। তাহা ছাড়া জনতার চিৎকারে ও বিশৃঙ্খল আলোড়নে, পুলিসের লাঠি-চার্জ্জে, ঘোড়া পুলিসের ঘোড়-দৌড়ে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে যুক্তি-তর্ক শুনিবার মতো ইহাদের মেজাজ নহে। অথচ যেমন করিয়াই হোক্, এই মুহূর্ত্তেই তাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে।

মরিয়া হইয়া সুপ্রকাশ কহিল, 'আমাকে ভিতরে ঢুকতে দাও। আমি খবরের কাগজের লোক; ন্যাশন্যাল ডেইলির প্রতিনিধি। এই আমার পরিচয়-পত্র…'

'গেট্ আউট্', ভাষার পুঁজি হইতে পুনর্ব্বার বহু-ব্যবহৃত বাক্যটাই বাহির হইয়া আসিল, 'ইফ্ ইউ ডোণ্ট্ ওয়ণ্ট টু গেট এ থ্র্যাসিং…'

রেলিং-এর ওপাশ দিয়া উত্তেজিত ভাবে একজন বাঙালি পুলিশ-অফিসার যাইতেছিলেন। বহু কষ্টে সুপ্রকাশ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নিজের পরিচয় দিল, এবং আগমনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব জানাইল।

শুনিয়া ভদ্রলোক কহিলেন, 'আপনার আত্মীয়! আসুন, আসুন। এতক্ষণে বোধহয় শেষ হয়ে গেচে।—তবে মাইণ্ড্ ইউ, আমাদের গুলিতে নয়, ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আমরা আর কিছু করিনি। ভদ্রলোক কোথা থেকে ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে, শুধু পায়ে, পাগ্‌লা-গারদের বাসিন্দার মতো ছুটে ভেতরে ঢুকে পড়লেন; ছুটলেন বক্তৃতা-মঞ্চের দিকে। 'ধ্বংস হউক',

ধ্বংস হউকে'র মামুলি চিৎকার। ধর, ধর, ধর। কিন্তু ধরতে হলো না, নিজেই একবার কাৎ হয়ে গড়িয়ে পড়লেন—চলুন মশায়, শীগগির আসুন। আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই। আপনিই গিয়ে ভার নিন। ডাক্তারকে ফোন্ করে এলাম। কেন যে এসব লোককে ছেড়ে দেন...'

ছুটিয়া সুপ্রকাশ ভিড়ের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিল। মাটিতে বিপিনদা চিৎ হইয়া উর্দ্ধমুখে পড়িয়া আছেন। চোখের দৃষ্টি স্থির; দুপাশের কষ বাহিয়া হয়তো ফুসফুস হইতেই সামান্য কয় ফোটা রক্ত গড়াইয়া পড়িয়াছে, ক্ষয়রোগীর শীর্ণ পাংশু মুখের উপর তীক্ষ্ণ নাকটা খড়্গের মতো উঁচু হইয়া আছে; হাতের মুঠি সম্ভবতঃ বদ্ধ ছিল, এখন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

একজন স্বেচ্ছাসেবক, বোধহয় মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট হইবে, নাড়ীটা ধরিয়া বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া করুণ মুখে কহিল, 'বন্ধ হয়ে গেছে।'

সুপ্রকাশ বজ্রাহতের মতো বিপিনদার প্রাণহীন দেহটার কাছে বসিয়া পড়িল। সমুখের দুটো দালানের ফাঁক দিয়া রক্তবর্ণ গোলার মতো সূর্য্যটা নিচে নামিয়া যাইতেছে। তাহার খানিক লাল আলো আবীরের মতো বিপিনদার শীর্ণ বিকৃত শ্মশ্রুদণ্টকাকীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের ব্যর্থ-সৈনিক, ভারতের যে মাটিকে, যে আলোকে, যে বায়ুকে, যে নরনারীদের ভালোবাসিয়া অতি কৈশোরে সুকঠিন পণ করিয়াছিল, তাহাদেরই মধ্যে সে আজ নিজের অন্তিম শয্যা রচনা করিয়া লইয়াছে।

নিম্নগামী সূর্য্যটাকে কেবলই সুপ্রকাশের কাছে নলিনী বৌদির কপালের বড়ো সিন্দুর বিন্দুটার মতো মনে হইতে লাগিল।

তেরো

ইহার পর প্রায় একমাস কাটিয়া গিয়াছে।

বগলে একটা বাণ্ডিল চাপিয়া সুপ্রকাশ যখন ক্লান্তপদে সিঁ
বাহিয়া ছাদে উঠিয়া আসিল, তখন রাত দশটা বাজিতে বড় দেরি নাই
শ্রীধর তাহার ছেলে-পড়ানো ও প্রাত্যহিক নৈশ-টহল হইতে তখন
ফিরিয়া আসে নাই। প্রায় কোনও দিনই সুপ্রকাশ এদিক দি
শ্রীধরকে পরাজিত করিতে পারে না,—খবরের কাগজের অফি
দিনের পশ্চাতার্দ্ধে কাজ শুরু করিয়াও নহে।

আলোর নিচে বাণ্ডিলটা খুলিয়া সন্ধ্যাবেলার সওদাগুলি সে প
করিতে লাগিল। চারটে গেঞ্জি, অর্দ্ধ-ডজন রুমাল, নগদ দু জো
মোজা, গরম গেঞ্জি একটা। পটুর একটা রেডি-মেড্ জওহর-বা
পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়া আনিয়াছে। অথচ ভাদ্র-শেষের পচা
কলিকাতার বাসিন্দারা আধসিদ্ধ হইবার উপক্রম।

কিন্তু এসব সরঞ্জাম কলিকাতার জন্য নয়। এগুলি কেনা হইয়া
দার্জ্জিলিংয়ের সম্মানে। এবং দার্জ্জিলিং যাওয়া হইতেছে সুজাতা
জন্য,—পাহারা এবং সঙ্গী হিসাবে। নানাদিক হইতে নানা আ
এই ধৈর্য্যশীলা মহিলা নিঃশব্দে অভিযোগহীন মর্য্যাদার সঙ্গে স
করিয়াছেন, কাহাকেও দুঃখের লেশমাত্র ভাগ দেন নাই। কি
মন ও শরীর দুই-ই যেন সহসা অতিশয় ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল।
এই অবসন্নতা সুপ্রকাশ কিছুদিন হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে, বলি-ব
করিয়াও এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করে নাই। সহসা একদিন তিনি নি
বলিলেন, 'চল, সুপ্রকাশ, কোথা থেকে কদিন ঘুরে আসি। কলকা
আর ভালো লাগচে না। যদি যেতে পার, দার্জ্জিলিঙে বাড়ি ঠিক ক

আমাদের স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রীর এক আত্মীয়ের একটা বাড়ি আছে, অক্ল্যাণ্ড রোডের ঠিক ওপরে। যদি বল, সেটা ভাড়া নিই।' মোহিতবাবুর কাছ হইতে ছুটি মঞ্জুর হওয়া সম্বন্ধে আশ্বাস পাইয়া সুপ্রকাশ সুজাতাদিকে সম্মতি জানায়। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু সুমিতা কিছুতেই যাইতে সম্মত হইল না; কলিকাতার বাড়িতে একা থাকিবার জেদ করিল। দিদিতে বোনেতে কি বন্দোবস্ত হইল, সুপ্রকাশ ঠিক জানে না; তবে সুমিতা যে যাইতেছে না, কলিকাতার বাড়িতে সে একাই থাকিবে এবং বাপের কালের পুরানো বৃদ্ধ ক্লার্ক অবিনাশদাদাকে অমিয়বাবু বোনের পাহারা হিসাবে এক মাসের জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজি হইয়া উদারতা দেখাইয়াছেন, এতটা সে জানে।

'নোমস্কার, সুপ্রকাশবাবু। চিনতে পারচেন কি?'

স্যুটকেস্ হইতে সুপ্রকাশ বিস্মিত দৃষ্টিটা দরজার দিকে প্রেরণ করিল। দরজার মুখে সাহেবী সান্ধ্য-পোশাক পরা একটা মূর্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু বাহিরে আলো না থাকায় তাহাকে চিনিতে সুপ্রকাশের দুএক সেকেণ্ড দেরি হইল।

'আমি ভূপতি চাটুয্যে।' ভূপতি ঘরের আলোর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া কহিল। 'আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে। একটু নিরিবিলি দরকার। দুটো বিছানা দেখচি; হঠাৎ আর কেউ এসে উপস্থিত হয়, এ আমি চাইনে।'

'এখানেই বলতে পারেন।' ভূপতির মুরুব্বিয়ানাকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সুপ্রকাশ কহিল।

'আমি জানি, সুমিতার সব কেস্‌টাই আপনি শুনেচেন।' ভূপতি বেপরোয়ার মতন সামনের ভেনেস্তা-চেয়ারটায় ডান পা-টা উঠাইয়া

দিয়া কহিল। 'গত তিন সপ্তাহ ধরে' তার সঙ্গে মীট্ করবার চেষ্টা করচি, কিন্তু ফল হয়নি। তার সান্নিধ্যে আমার যাওয়াটা সম্প্রতি তিনি বরদাস্ত করতে পারচেন না। টেলিফোনের কৃপায় খবর পাওয়া গেল, তিনি আমার অস্তিত্ব ভুলে যাবার চেষ্টা করচেন।...'

'এর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আমি ঠিক বুঝতে পারচি না।' সুপ্রকাশ গম্ভীরভাবেই কহিল।

'সবুর করুন। উতলা হবেন না।' ভূপতি সিগারের ছাই ঝাড়িয়া কহিল। 'দেখুন, মোশায়, অ্যাক্সিডেণ্ট ইস্ অল্‌ওয়েজ অ্যান অ্যাক্সিডেণ্ট। ডিফিকাল্টি আর বেকায়দায় সবাই পড়তে পারে; কিন্তু ঘাব্ড়ে গেলে চলে না। সব ব্যাধিরই প্রতিকার আছে আমি সে প্রতিকারের ব্যবস্থাও করেছিলাম। গাইনেকোলজিস্ট ডাঃ ব্যানার্জ্জি আমার বিলেতের বন্ধু। তার ক্লিনিকে রুমের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত ঠিক, এমন সময় দিলে সেই 'সাঁত্রী' ভদ্রমহিলা, সুনিতার দিদি, বাধা। পাপ, পাপ, এ নাকি ভয়ানক পাপ!...'

'আপনি কি আমার কাছ থেকে ভ্রূণ-হত্যার সমর্থন পেতে এসেচেন?' সুপ্রকাশ ধৈর্য্যসহকারে কহিল।

'সমর্থন গ্র্যাণ্ডমামা!' ভূপতি এবার চোস্ত ইংরেজি শ্ল্যাং প্রয়োগ করিল। 'কিন্তু শুনলাম আপনিও নাকি, মোশায়, মিসেস্ চৌধুরির কথায় সায় দিয়ে এসেচেন; বলেচেন, এমন করেই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখাতে হয়,—এতে ভয় পাবার বা লজ্জা করবার কিছু নেই...'

'আপনার বোঝবার ক্ষমতার উপর আমার যে খুব বেশি শ্রদ্ধা আছে, তা বলতে পারি না।' সুপ্রকাশ কহিল।

'তাতে কিছু এসে যায় না।' ভূপতি নির্ব্বিকার ভাবে কহিল। 'কিন্তু কথা হচ্চে, আপনি নাচিয়ে দিয়ে আসার পর থেকে দেবী সুমিতা একেবারে ব্রতময়ী তপস্বিনী হয়ে উঠেচেন। মিসেস্ চৌধুরি বাগ্‌ড়া

দেওয়ার পর যা-ও বা একটু আশা ছিল, আপনার উপদেশ-বর্ষণের পর তার সকল সম্ভাবনা দূর হয়েচে। তার কাছে পৌছবারও আর উপায় নেই, বিদ্রোহের মোহ এতখানি উগ্র হয়ে উঠেচে...'

'আপনার প্রস্তাব ?'

'তাকে একটু সেন্স্ দিয়ে আসুন। অনায়াসে সে খালাস হতে পারে। তাতে তার নিজের এবং আমার ভবিষ্যৎটাও সহজ হয়ে ওঠে। সারা জীবন ধরে' একটা 'স্টিগ্মা' বয়ে বেড়াতে হয় না।—আমি আপনার কাছে, কি বলে ইডিয়োমেটিক বাংলায়, করজোড়ে অনুরোধ করচি। আপনি হচ্চেন দু বোনের কাছে একটা পীর-পয়গম্বর টাইপের লোক, আপনার একটা কথায়...'

'এবার তবে আপনি আসুন। নমস্কার।'

'মানে ?' বিস্মিত হইয়া ভূপতি চাটুয্যে কহিল।

'খুব স্পষ্ট। আপনাকে সহ্য করতে আমার স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর বড় বেশি চাপ পড়ছে।'

'অল্ রাইট্!' ভূপতিও মেজাজের সঙ্গে কহিল। 'বেশ, আমি যাচ্চি। আপনার ঘরটা এমন কোনও মূর‍্যাল্ পেন্টিংয়ের গর্ব্ব করতে পারে না, যা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখব। কিন্তু এর পরিণাম আপনার পক্ষেও খুব ভালো হবে না, মনে রাখবেন।'

সুপ্রকাশ ইহার কোনও জবাব দিল না। ভূপতি মেঝেটাকে সজোরে আঘাত করিতে করিতে দরজার চৌকাঠ পার হইয়া গেল।

'একটা শেষ-কথা আছে, শুনুন। চেঁচিয়ে বলতে চাইনে. একটু কাছে আসতে পারেন কি ?'

'বলুন, কি বক্তব্য ?' দরজার কাছে আগাইয়া আসিয়া সুপ্রকাশ কহিল।

'আমি একজন ওয়র্ কন্‌ট্রাক্টর, জানেন ?'

'শুনেচি অপব্যয় করবার মতো' অনেক টাকা করেচেন।'

'কিন্তু টাকা করবার সবচেয়ে বড়ো প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?'

'তবে নিজেই কন্ট্রাক্টর হতাম।'

'সে প্রক্রিয়াটা হচ্চে, ম্যানিপুলেশন! ছল বল কৌশল প্রয়োগে নিজ উদ্দেশ্য-সাধন। যার জন্য যেমন দাওয়াই দরকার, অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করা।—হ্যাঁ, ভালো কথা, কত দিন ধরে' আপনার মিসেস চৌধুরিদের সঙ্গে আলাপ? সুস্মিতাকে কতদিন ধরে' চেনেন?…' ভূপতির কণ্ঠস্বরে সহসা যেন একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আত্মপ্রকাশ করিল।

'ব্ল্যাক্‌মেইল করবেন, কেমন?'

'ও-বাড়িতে যদি কোনও অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়, তবে তাতে আপনার কোনও রকম সম্পর্ক থাকা…ওরে, বাপ!' বলিয়া বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া, গালটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ভূপতি চাটুজে মাটিতে বসিয়া পড়িল। এত বড় একটা ঘুষি যে ঐ রকম নিরীহ লোকের কাছ হইতে এত দ্রুত আসিতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। ক্ষণকাল সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার মনে হইল। তারপর নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল, 'আচ্ছা দেখে নেব!'

'কি দেখে নেবে, চাঁদ, ব্যাণ্ড-মাস্টার! দেখে নেবে কি শুনি?'

চম্‌কাইয়া চাহিয়া সুপ্রকাশ দেখে, ভূপতির ঠিক পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে শ্রীধর; শার্টের হাতা গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সভয়ে সে কহিল, 'যেতে দে, শ্রীধর, যেতে দে।'

'যেতে দেব মানে? যেতে দেব কেন শুনি? যেতে দে!' শ্রীধর বিরক্তির সঙ্গে কহিল। 'ঘরে এসে শাসিয়ে যাবে, শুনে মুখ-বুজে চুপ করে' বসে থাকব! আমি বাবা হিঁদুর ছেলে, যিশুখৃষ্টের উপদেশকে

থোড়াই কেয়ার করি। কে রে, বাবা, তুমি কেরোসিন-ব্যাণ্ড? কি দেখে নেবে, সোনার চাঁদ, কি দেখে নেবে শুনি?…'

'তোর ইয়াকি রাখ্।' বলিয়া সুপ্রকাশ স্বয়ংস্থ শ্রীধরকে টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। ধৈর্য্য হারাইয়া বসায় তার নিজেরই সঙ্কোচ হইতেছিল।

'কে রে, ওটা? কেঃ?'

'আমার বন্ধু।'

'কি রকম বন্ধু, বাবা! চমৎকার বন্ধু জুটিয়েছ, যা হোক্!' শ্রীধর শার্টটা মাথার উপর দিয়া টানিতে টানিতে কহিল। 'ব্যাণ্ড্-মাস্টারের সাজ পরে' মধ্য-রাত্রিরে বন্ধুকে এসে শাসিয়ে যায়! প্রেম-ঘটিত ব্যাপার বলে বোধ হচ্চে! ডুবে ডুবে জল খাচ্চ না তো, বাবা? এ যে স্পষ্ট প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে মনে হলো…'

'ছ্যাব্লামিটা কি তুই একটু কমাতে পারিস?' সুপ্রকাশ এইবার গম্ভীর হইয়া কহিল।

'আলবৎ পারি।' শ্রীধর কহিল। 'কিন্তু সারা পৃথিবীটা আমার সঙ্গে এমন ইতরামি করতে থাকলে, করি কি, করি কি শুনি? কম রেগে বাড়ি এসেছিলাম? ইচ্ছে করছিল কি শুনবি? শুনবি কি ইচ্ছে করছিল? ইচ্ছে করছিল, যাকে কাছে পাই, যুবক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, মোটা-সরু, যাকেই কাছে পাই, ঘুষিয়ে ফিতে বানিয়ে দিই, চড়িয়ে দাঁত কপাটি তুলে আনি…'

'ব্যাপার কি?' সুপ্রকাশ অন্যমনস্ক ভাবে কহিল।

'ব্যাপার মানে সেই একই ব্যাপার। সেই অনাদি অনন্ত। সেই ব্যর্থ-প্রেম, সেই চিরন্তন, সনাতন অকৃতজ্ঞতা। উয়োম্যান্, দাই নেম্ ইস্ আন্গ্রেট্ফুলনেস্! ট্রাম না থামতেই নেমে পড়তে গিয়ে পড়ে

যাবার জোগাড় হয়েছিলেন শ্রীমতী। ধরে' বাঁচিয়ে দিলাম। তার প্রতিদানে,—এই শুনচিস্, হাঁ করে' জান্‌লা দিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে দেখচিস্ কি?—প্রতিদানে কি পেলাম, জানিস? কি বললেন, শুনবি?'

'কি বললেন?'

'বললেন,' শ্রীধর দুঃখিত স্বরে কহিল, 'আচ্ছা ছোটলোক তো! কে আপনাকে জড়িয়ে ধরতে বলেছিল। পড়তাম, আমি পড়তাম, আপনার কি?'

চৌদ্দ

সুক্‌না রিসার্ভ-বনের মধ্য দিয়া বিরাটকায় এক পর্ব্বত-মূষিকের মতো ক্ষুদে রেলগাড়ি আঁকিয়া বাঁকিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে একটামাত্র রাত্রের ব্যবধানে পরিবর্ত্তন যে এমন বিস্ময়কর হইতে পারে তাহা বিশ্বাস করিতে বাস্তব-বুদ্ধিতে ধাঁধা লাগিয়া যায়। প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের পটে মেঘরেখার মতো হিমালয়ের অন্তহীন ফেনায়িত পর্ব্বতমালার অস্পষ্ট ফিকা নীল আভাস আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; তারপর শিলিগুড়িতে ট্রেন বদ্‌লাইয়া পাহাড়ী-রেলে চড়ার ঘণ্টাখানেক পর হইতেই গাড়ি অরণ্যের মধ্য দিয়া বঙ্কিম-পথে ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে অভিযানে চলিয়াছে।

মিণ্টুর উৎসাহের এবং উত্তেজনার অন্ত নাই। যাহাই দেখিতেছে, তাহাতেই সে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। বন্দিশালার কয়েদী খোলা আকাশের তলায় ছাড়া পাইলে যেমন হাল্‌কা বোধ করে, কলিকাতার ধূলা ও ধোঁয়া, মানুষ ও যানের ভিড় হইতে ছাড়া পাইলে তেমনি হৃদয়ের বন্ধন-মুক্তি হয়। তেমন তেমন বৈষয়ী ভারিক্কি লোকও নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর দ্রষ্টব্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, মিণ্টুর আর কথা কি।

'সু-মামা, দেখ, দেখ, কি পাখি !' হাততালি দিয়া মিণ্টু সুপ্রকাশের উদ্দেশ্যে কহিল। 'টিয়া না ময়না, না কি ওটা? ওটা শিষ্ দিতে পারে? কি রকম লেজটা দেখ, সারা গায়ের মধ্যে ওটাই এমন রঙিন কেন?'

'আদত শরীরের চাইতে', সুপ্রকাশ কহিল, 'কি মানুষ, কি পশু-পাখি সবারই লেজটা বেশি বিচিত্র থাকে। এটা প্রকৃতির একটা মস্ত বড় রসিকতা…'

'ধ্যেৎ, কি যে বল', মিণ্টু এ-দিকে চাহিয়া কহিল, 'মানুষের বুঝি লেজ থাকে?…'

'থাকে না', সুপ্রকাশ চোখে দুষ্টু হাসি আনিয়া কহিল, 'কিন্তু অনেকেই গজায়। যারা গজাতে চায়, এমন কত লোক আমাদের অফিসে আসে। তুমি বড়ো হলে, তোমারও হয়তো গজাতে ইচ্ছে হবে; তখন আসতে হবে আমাদের কাছেই, হাঁটাহাঁটি করে জুতোর তলা ক্ষয় করতে হবে…'

'ধ্যেৎ', মিণ্টু অবিশ্বাসের সঙ্গে কহিল। 'শুনচো, মা, কি যা-তা বলছে, সু-মামা। মানুষের নাকি লেজ গজায়; যত আজগুবি…'

ক্ষুদ্র সেকেণ্ড-ক্লাস কাম্‌রাটায় পাশাপাশি দুটো বেঞ্চ। একটা বেঞ্চেই বসিয়াছে তারা তিনজন। অপর বেঞ্চিটাতে একটা বিছানা পাতা; তার উপর একটা ওভার-কোট, লাঠি এবং গ্ল্যাড্‌স্টোন ব্যাগ্। এগুলির মালিকের দেখা নাই। শিলিগুড়ি স্টেশনে মালিকের ভৃত্যের একবার দেখা পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু বিছানা পাতিয়া, দুটো স্যুটকেস্ বেঞ্চির নিচে ঠেলিয়া এবং অবশিষ্ট জিনিষগুলি বিছানার উপর উঠাইয়া সেও তখনই অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। তারপর দুটো স্টেশন পার হইয়া আসা হইয়াছে, তবু এ-সকলের স্বত্বাধিকারীর সাক্ষাৎ নাই।

জানালাটার ধারে শালবনের দিকে চাহিয়া সুজাতা অনেকটা

অন্যমনস্কের মতো বসিয়া আছেন। এই রহস্যঘন অর্দ্ধআলোকিত অর্দ্ধঅন্ধকার অসমতল বনভূমি তাহার মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কার সৃষ্টি করে; যতবার তিনি এ-অঞ্চলে আসিয়াছেন, হিমালয়ের সানুদেশের এই অরণ্য তাহাকে কণ্টকিত করিয়াছে। জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন ইহার একটা অস্পষ্ট অথচ অচ্ছেদ্য যোগ আছে একটা অভাবিত, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অবাঞ্ছিত সংঘটন উভয়ের মধ্য হইতেই বাহির হইয়া আসিতে পারে। এই অরণ্যভূমি দেখিলেই জীবনের আশঙ্কার এবং বিপদগর্ভ অনিশ্চয়তার রূপটা তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।

'সুমির জন্য মনটা কেমন করছে, সুপ্রকাশ।' সুজাতা অনেকক্ষণ পরে কহিলেন। 'সে নিজেও এলো না, আমাকেও ঠেলে পাঠালে। বললে, না দিদি, সে কিছুতেই হবে না। তোমাকে যেতেই হবে। কি রকম তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তুমি দেখতে পাওনা, আমরা দেখতে পাই। তুমি সুস্থ না থাকলে আমাদের কে দেখবে? আমার জন্য ভাবনা করো না। বিপদের ভয় আর আমার নেই; মেয়েদের যা চরম বিপদ, তার উপর দিয়ে আমি চলে এসেচি। আমার জন্য ভয় করোনা, দিদি ভাই; তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেচি, তাকে লঙ্ঘন করে দুষ্কৃতির মাত্রা আর বাড়াব না…'

'একটা কথা আমি মনে না-করে পারচি না, দিদি', সুপ্রকাশ কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে কহিল। 'আমি আপনার সঙ্গে আসচি বলেই হয়তো সুমিতা এলো না। সঙ্কোচ হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। এ জন্যই আপনাকে কলকাতায় কদিন আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়েছি, আমার না এলে কি চলে না?'

'ঠিক বলতে পারিনে, ভাই। একথা আমারও মনে হয়েছে। কিন্তু যতবারই তাকে জিজ্ঞেস করেছি, সে অস্বীকার করেচে। বলেছে,

দিদি, আমাকে একলা, নিজের মনের মধ্যে কিছুকাল একলা বাস করবার অবকাশ দাও; এতদিন দৃষ্টি ছিল কেবল বাইরের দিকে, একবার ভিতরের দিকে তাকাতে চেষ্টা করি। দেখি, নিজেকে চিনতে পারি কিনা।...তুমি ভাবতে পারবে না, সুপ্রকাশ, এই দু-তিন মাসে সে কি আশ্চর্য্য রকম বদলে গেছে। যেন আলাদা মানুষ। যত দুঃখ, যত ঘৃণা, সমাজের যত নিন্দাই জড়ানো থাক, মা হবার মধ্যে যে নিজস্ব গৌরব আছে, তাকে কি অস্বীকার করতে পার?' বলিয়া বাহিরের অন্তহীন পাহাড়গুলির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

'সু-মামা', ও-পাশ হইতে মিণ্টু কণ্ঠের হুইসিল্ বাজাইয়া কহিল। 'দেখ, দেখ, ঐ যে পাহাড়ের তলাতে লাল রঙের বাড়ি। কাদের বাড়ি ওগুলো?'

'চায়ের বাগানের বাড়ি।' পাহাড়ের নিচে চাহিয়া সুপ্রকাশ কহিল।

'আর ঐ যে ওদিক্‌কার পাহাড়ের গায়ে?'

'পরের স্টেশান।'

'কিন্তু ঠাণ্ডা লাগচে না কেন? শুধু শুধুই মা এতগুলো গরম-জামা খুলল কেন? কেবলই পাহাড়, কেবলই পাহাড়, তবু ঠাণ্ডা লাগবে না?'

'একটু পরেই ঠাণ্ডা লাগবে।'

'এখান থেকে শালের পাতা নিয়েই কি কলকাতার খাবারওয়ালারা ঠোঙা বানায়?'

'পাগল, এসব কি ছুঁতে পারে', সুপ্রকাশ কৌতুকের সুরে কহিল। 'এ-যে রিসার্ভ-ফরেস্ট, গবর্ণমেণ্টের খাস্-সম্পত্তি।'

'দেখ, দেখ, সু-মামা। রাস্তা দিয়ে নেপালী-মেয়েরা পিঠে চাঙারি বেঁধে কেমন ঝুঁকে ঝুঁকে যাচ্চে। কি আছে ওতে?'

'ছোট ছেলেমেয়ে। পাহাড়ী-রাস্তা কিনা, চলতে অসুবিধা, তাই ঐ রকম করে' পিঠে চড়িয়ে নিয়ে চলে।'

'ওদের নাক চ্যাপ্টা কেন? ওরা বেঁটে কেন?'

'মঙ্গোলীয় জাতের লোকেরা ঐ রকমই হয়। পরে তোমাকে আরও ভালো করে' এদের সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেব। এখন তাকিয়ে দেখ, চারদিকে মাটির কেমন সবুজ-ঢেউ উঠেচে। ভারতবর্ষের একদি থেকে অন্যদিক পর্য্যন্ত মাটির এই ঢেউ চলে গেচে···'

'জয়, জয় মা মহামায়ার জয়', 'জয় মা মহামায়ার জয়!' কতক্ষণ ধরিয়াই পাশের বড় রিজার্ভ-কামরাটা হইতে নানা প্রকার উচ্চধ্বনি উঠিতেছিল। উহাতে বহু ভক্ত-পরিবেষ্টিত হইয়া এক সন্ন্যাসিনী চলিয়াছেন। শিলিগুড়িতে তাহার গেরুয়া ও কপালের বড়ো সিন্দুরের ফোঁটা এবং ভক্তবৃন্দের গদগদ সম্ভ্রম জনতার কৌতূহল আকৃষ্ট করিয়াছিল। পাশের কাম্‌রায় ওঠাই সুপ্রকাশদের পক্ষে অসুবিধার ব্যাপার হইয়া ওঠে। মিণ্টু কৌতূহলে ঘাড়টা লম্বা করিয়া তাহাকে বারবার দেখিতে চেষ্টা করিয়াও বড় বেশি সাফল্য লাভ করে নাই। কিন্তু নিতান্ত অজানা বিষয়ে অসংখ্য প্রশ্ন করিয়া সুপ্রকাশকে তটস্থ করিয়া তুলিয়াছে।

'ঐ, ঐ সু-মামা। ঐ আবার!' মিণ্টু কান খাড়া করিয়া কহিল। 'ও রকম চেঁচায় কেন?'

'সবার কাছে মাহাত্ম্য ঘোষণা করে।'

'মাহাত্ম্য কি?'

'অনেক গুণ আছে, অনেক ক্ষমতা আছে, এইসব।'

'কি ক্ষমতা আছে?'

'জানি না।'

'ও-রকম রঙের কাপড় পরে কেন ?'

'গেরুয়া রং বৈরাগ্যের সহায়তা করে।'

'বৈরাগ্য কি ?'

সুজাতা বাহির হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, 'চুপ করো, মিণ্টু। সু-মামাকে একটুও কি তুমি সুস্থ থাকতে দেবে না। কেবলই লক্ষ প্রশ্ন করে চলেছ।'

'তবে তুমিই বলোনা, বৈরাগ্য কি ?' মিণ্টু নির্ব্বিকার-চিত্তে কহিল। 'বৈরাগ্য কি টাকা বাঁচানো ? অমন ধুলোর রঙের রঙিন কাপড় পড়ে ধোপার পয়সা বাঁচায় ?...'

'পয়সা নয়', সুপ্রকাশ কহিল। 'আত্মাকে বাঁচায়! কিন্তু আর প্রশ্ন করো না। আত্মা কি, তা বলতে পারব না। নিচে চেয়ে দেখ, কত উঁচুতে আমরা উঠে এসেটি।'

চুণাভাটি স্টেশনে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া বেওয়ারিশ বিছানাটার উপর বসিয়া পড়িলেন। বছর ষাট-বাষট্টি বয়স হইবে, কিন্তু এখনও শরীরের বাঁধ এবং বহর মজবুত। কপাল হইতে কিছুটা উর্দ্ধ পর্য্যন্ত মসৃণ টাক চক্‌চক করিতেছে, ঘন ভুরুযুগলের সংযোগস্থলে বেশ বড় একটা চন্দনের ফোঁটা। সুপুষ্ট গোঁফ জোড়ার কালো রং বিবর্ণ হইয়া শাদাটে হইয়া উঠিয়াছে।

'দেবী, দেবী, সাক্ষাৎ দেবী, মশায়!' ভদ্রলোক অবিলম্বেই অপরিচিত সুপ্রকাশকে সম্বোধন করিলেন। 'দেবী না হলে এমন বিভূতি দেখায় কার সাধ্য ? চোখে দেখলে বিশ্বাস হবে না, কানে শুনলে প্রত্যয় হবে না, তর্ক করে' পার মিলবে না ; কিন্তু তবু সত্যি, এতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই।...'

'আপনি কি পাশের কামরার...' সুপ্রকাশ ব্যাপারটা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইবার উদ্দেশে প্রশ্ন করিল।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ, মা মহামায়ার আমি দাসানুদাস! রায়বাহাদুর সত্যানন্দ গুহমুস্তফী। নাম শুনে থাকবেন—এক্সাইজের কালেক্টর ছিলাম, রিটায়ার করেছি বছর দুই। কিন্তু সেসব কথা আর মনে রাখতে চাইনে। মায়ের কৃপায় সকল আসক্তি আর অহং দূর হয়েচে। ঐহিকে ঘৃণা এসেছে। কদিনের, মশায়, এসব ক'দিনের শুনি? মায়ের শ্রীমুখ থেকে মোক্ষের শাশ্বতী-বাণী শুনেচি; হৃদয় জুড়িয়ে গিয়েচে, মন জুড়িয়ে গিয়েচে। সংসারের আবল্যের মধ্যে এতদিন যা পাইনি, মা মহামায়ার কৃপায় সেই শান্তি পেয়ে গেছি। দুর্জ্জয়লিঙ্গে এ-অধমের একটি কুটির আছে; মাকে নিয়ে চলেচি সেইখানে। দেখি, কদিন ধরে' রাখতে পারি...'

'সঙ্গে আপনার গুরু-ভায়েরাও চলেচেন বোধ হয়? ও-গাড়িতে অনেক লোক দেখলাম।' সুপ্রকাশ কহিল।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ, চলেচেন। চলেছেন। আমার উপর সকলেই অনুগ্রহ দেখিয়েচেন।' রায়বাহাদুর উচ্ছ্বসিত তৃপ্তির সঙ্গে কহিলেন, 'মায়ের পূণ্য-সান্নিধ্যে, মায়ের উপদেশামৃতে, গুরু-ভায়েদের মাতৃনাম-কীর্ত্তনে আমার দীন কুটির পবিত্র হয়ে উঠুক।—আমার ছেলে, করুণা, করুণাময়, তাকে ও-কামরায় বসিয়ে রেখে একটু জিরুতে এসেচি। এতদিনের বদ্-অভ্যেসে গড়া আয়াস-লোভী শরীর, একটুতেই হাঁপিয়ে ওঠে; মাঝেমাঝেই একটু গড়িয়ে জিরিয়ে নিতে হয়। বিছানাটা এজন্ত আগেভাগেই এ-কাম্‌রায় পাতিয়ে রেখে ছিলাম।—তা, মশায়ের কোথায় যাওয়া হচ্চে? শেষ অবধি যাওয়া হবে কি?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ, যাব।'

'কোথায় উঠবেন?'

'অক্‌ল্যাণ্ড রোডের কিছু ওপরে। হোয়াইট স্নো নামের বাড়িটায়।' সুপ্রকাশ কহিল।

'বলেন কি, সে যে আমার বাড়ির ঠিক ওপরেই।' বৃদ্ধ সহর্ষ উৎসাহের সঙ্গে কহিলেন। 'বাঃ, বেশ হয়েচে। আমার বাড়ি হিম-কেতন ; দুবেলা আসতে যেতেই পার হয়ে যেতে হবে। বেশ, বেশ। যাবেন, মা মহামায়া যতদিন আছেন, আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে। আপনার বয়স কম, এতে আনন্দ পাবেন কিনা জানিনা, কিন্তু মেয়েরা…উনি আপনার ?'

'আমার দিদি।' সুপ্রকাশ রায়বাহাদুরের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কহিল।

'বেশ, বেশ। চমৎকার। শুনে সুখী হলাম। যাবেন ওঁকে নিয়ে। যখনই সুবিধে হবে, যাবেন। নিজের বাড়ি মনে করেই যাবেন।—কিন্তু ভালো কথা, তোমার নামটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি, বাবা ?'

ভক্তির উদার বিহ্বলতায় বসুধাকেই মিত্র মনে হওয়ায় নাম-ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসার পূর্বেই রায়বাহাদুর আমন্ত্রণ সমাপ্ত করিয়াছেন। এইবার ক্রমে ক্রমে খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কৌতূহলী হইলেন, এবং সুপ্রকাশের বয়সটা লক্ষ্য করিবার পর সম্বোধনের দূরত্ব কমাইয়া ফেলিলেন।

'বাঃ বেশ।' নাম শুনিবার পর রায়বাহাদুর কহিলেন। 'কি করা হয়, বাবা ?'

'এই একটু কাগজে লিখি।'

'কি কাগজ ?' রায়বাহাদুর চোখ তুলিয়া একটু বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন।

'খবরের কাগজ। ন্যাশন্যাল ডেইলি।'

'ন্যাশন্যাল ডেইলি!' রায়বাহাদুর আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন। 'সে যে মস্ত বড় কাগজ। ঠিক, ঠিক; দেখেই আমার মনে হয়েছিল বটে; এ যে সাধারণের চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমানের মুখ, অনেক বেশি ধারালো দৃষ্টি। বেশ বেশ। বড় আনন্দ হলো। শুনে বড় খুসি হলাম। সেখানে কি করা হয়?'

'অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটর।'

'বল কি!' রায়বাহাদুরের শ্রদ্ধা যেন এক মুহূর্ত্তে দার্জ্জিলিঙের মতো উঁচু হইয়া উঠিল। 'এই বয়সে! এত বড় একটা কাগজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটর! এ যে দেখছি, একেবারে খাঁটি হীরের টুক্‌রো। চাট্টিখানি কথা নয়; কত বড় দায়িত্ব! দেশের মতামত গঠন করা!—আমাদের পরিচয় বেশিক্ষণের নয় বাবা। নাই বা হলো। কিন্তু একটা কথা তোমায় বলে রাখচি: কলকাতায় ফিরে গিয়ে মা মহামায়ার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তোমায় কিছু লিখতেই হবে—জাগ্রত দেবী. বিশ্বাস কর আমার কথা, জাগ্রত দেবী। ঐহিকের প্রতি, জড়ের প্রতি আসক্তিতে সারাটা দেশ আচ্ছন্ন,—কে বলবে, এই দেশেই গীতা, উপনিষদ, বেদ-বেদান্ত, ষড়দর্শন লেখা হয়েছে; কাচের লোভে কাঞ্চন ত্যাগ করে' বসে আছি। দাও তো বাবা, তোমরাই তো জনমত গঠন কর, দাও তো এর বিরুদ্ধে কড়া করে' কিছু লিখে। মা মহামায়ার কথা প্রচার করে দাও, তাঁহার মাহাত্ম্য, তাঁর বিভূতি অবিশ্বাসী বহির্মুখী ইহ-সর্ব্বস্বেরা জানুক; একমাত্র তোমরা কাগজ-আলারাই অজ্ঞ অন্ধদের মোক্ষের পথ দেখিয়ে দিতে পার···'

'সু-মামা, দেখ, দেখ, ঝর্না!' মিণ্টুর হুইসিল্‌ আবার বাজিয়া উঠিল। বুড়ো লোকটাকে সে আদতেই পছন্দ করে নাই। এমন করিয়া সে সু-মামাকে জুড়িয়া থাকিবে, ইহা অসহ্য। অথচ বাধা দিবার কোন উপায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এমন সময় প্রথম

পাহাড়ী-ঝর্না তাহার সহস্র রজতধারা লইয়া তর্কের মধ্যখানে লাফাইয়া পড়িল।

'কি করে ঝর্না হয়, সুমামা?'

'পাহাড়ের উপর বৃষ্টির জল জমে থাকে। সেই জল নিচে চলে আসে, পাথরের টুক্‌রার ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে, এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে।'

'ওপরের এই পাহাড়টায় কালো কালো ধোঁয়ার মত কি লেগে আছে? ইঞ্জিনের ধোঁয়া?'

'মেঘ। এই মেঘ গলে বৃষ্টি হয়।'

'আর তুলোর আঁশের মতো, এইগুলি কি? শাদা মেঘ?'

'এগুলি ফগ। ওরা মেঘের মাসতুত ভাই।—ঐ চেয়ে দেখো, ও দিককার পাহাড়টার দিকে: বাড়িঘর কিছু দেখতে পাচ্ছ? সব যেন শাদা চাদরে ঢাকা। ফগের তুলোর আঁশ দিয়ে কেমন শাদা চাদর বোনা হয়, দেখ...'

'দুটো স্টেশন একটু গড়িয়ে নিই।' রায়বাহাদুর গ্ল্যাড্‌স্টোন ব্যাগটা নিচে নামাইয়া কহিলেন। 'গয়াবাড়িতে নেমে মায়ের কামরায় ফিরে যাব। যদি ঘুমিয়ে পড়ি, একটু ডেকে দিয়ো, বাবা। বুড়ো মানুষ, ট্রেনের ধকল সইতে কষ্ট হয়।' এবং সুজাতার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'বুড়োর এই নিমন্ত্রণ রইল মা, যতদিন মা মহামায়া আছেন, এই বুড়োর কুটিরে সময় পেলেই পায়ের ধুলো দিতে হবে। এতে লজ্জা করলে চলবে না, আলস্য করলে চলবে না, এই দাবি রইল।' বলিয়া বালিশে মাথা দিয়া রায়বাহাদুর চোখ বুজিলেন।

গয়াবাড়ি আসিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। গাড়ি থামিলে পুনর্ব্বার সুপ্রকাশকে মাহাত্ম্য-প্রচারের বিষয় স্মরণ করাইয়া

দিয়া এবং সুজাতাকে মাতৃদর্শনে যাইবার জন্য বারবার নিমন্ত্রণ করিয়া মহামায়ার কামরায় ফিরিয়া গেলেন।

গাড়ি ছাড়িবার সামান্য পূর্ব্বে পাশের কামরা হইতে ফর্শা, লম্বা, সুদর্শন তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি ছেলে এ-গাড়িতে আসিয়া উঠিল। দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সুপ্রকাশের দিকে জোড়-হস্তে নমস্কার করিয়া কহিল, 'আমি করুণাময়। যিনি একটু আগে নেমে গেলেন, তিনি আমার বাবা। আপনার পরিচয় আমি পেয়ে এসেচি। পেয়ে দৌড়ে এসেচি, বলতে পারি। বইয়েতে পড়েছি, পেন্ ইস্ মাইটিয়ার দ্যান্ স্বোর্ড। কিছু বিহিত করতে পারেন?'

না-বুঝিয়া সুপ্রকাশ চোখ তুলিয়া চাহিল; মিণ্টুও ঈর্ষ্যা-মিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গে নবাগতকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

'বুজরুকি, বুঝলেন, আগাগোড়া বুজরুকি!' করুণাময় আবেদনের মতো করিয়া কহিল। 'বিভূতি না হাতি! একটা অশিক্ষিত মেয়ে-মানুষ,—মাফ্ করবেন, এতটা বিরক্ত হয়ে আছি যে, ভাষা-প্রয়োগে ভদ্রতা রাখতে পারচি না,—গেরুয়া পরে' অং বং টং করচে, একবার চোখ মুদছে, একবার চোখ খুলচে; একবার এদিকে হেলচে, একবার ওদিকে হেলচে; হিস্টিরিয়া রোগীর মতো একবার হো-হো করচে, একবার হি-হি করচে, একবার হু-হু করচে, আর এক গাদা শিক্ষিত, পদস্থ, বয়স্ক লোক একেবারে গড়াগড়ি—পদরজঃ মাথায় মেখে, অমৃতবাণী কানে এঁটে, উপদেশের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে, একেবারে ভক্তির উন্মত্ততা শুরু করে' দিয়েচে। এই অপূর্ব্ব চিজ্‌টিকে নিয়ে চলেছি আমাদেরই দার্জ্জিলিঙের বাড়িতে; সপারিষদ মা মহামায়ার মহোৎসব এবং আমার নরক-যন্ত্রণা একই সঙ্গে শুরু হবে। তাই জিজ্ঞেস করচি, কিছু বিহিত করতে পারেন? মাত্র ঘণ্টা কয়েকে আমার ক্ষেপে যাবার অবস্থা হয়েচে, এর পর যে, যাকেই সামনে পাব, তাকেই কামড়ে দেব...'

'ধর্ম্ম মানেন না বুঝি?' করুণাময়ের কথার ভঙ্গিতে সুপ্রকাশ কৌতুক বোধ না করিয়া পারিল না। চাহিয়া দেখিল, সুজাতাদিও কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন।

'ধর্ম!' করুণাময় পিতৃ-পরিত্যক্ত বিছানাটায় ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'এর পর ভগবানকেও মানতে পারব কিনা, তাতেই সন্দেহ হচ্চে।—তুমি আমার ভক্ত শিষ্য? বেশ, বেশ, প্রজা-নির্য্যাতন করাই ভগবানকে পাওয়ার একমাত্র পথ। তুমি সুদ-খোর? দোষ কি। সুদখোরেরাই তো ভগবানের স্পেশাল ফেবরিট—অবশ্য যদি তারা আমার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হয়। হে আমার ভক্তশিষ্য, লজ্জা করবার কিছুমাত্র হেতু নেই, কালোবাজারে মুনফা করতে সমর্থ হলে ভগবান তার প্রতি বিশেষ প্রীত হন। মানে, ভালো হোক মন্দ হোক, সাধুতা হোক জোচ্চোরি হোক, মহা মায়ের শিষ্যদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলে, যে-কোনও আচরণই 'ভাচু'র পর্য্যায়ে উঠে যায়। চুরি, ঠকামি, পর-নির্য্যাতন, পরনিষ্পেষণ, সবারই একটা উদার, মধুর, মহিমময় ব্যাখ্যা আছে; শিষ্য হওয়ামাত্র সে-ব্যাখ্যায় মা মহামায়া এগুলিকে ভগবানের বিশেষ নেক্‌নজরের বস্তু করে' তোলেন। এর ফলে যে-দেবতাটি গড়ে ওঠেন, তাকে উদারতার আদর্শ বলতে বাধে না বটে, কিন্তু ভক্তি করতে ভয় পাই। নির্ঘাৎ, আপনাকে বলচি, নির্ঘাৎ অল্প কিছুকালের মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহটা নিশ্চয়তায় গিয়ে দাঁড়াবে। অতীতে যত পণ্ডিত এবং সাধুসজ্জন ব্যক্তি ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে' গিয়েচেন, তাদের প্রমাণের পশ্চাতে সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে এই রকম কোনও না কোনও হেতু কার্য্যকরী ছিল, এমন একটা সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যাবে। এইজন্যই তো আপনাকে অনুরোধ করচি, যদি পারেন তো কিছু...'

'কবে থেকে আপনার বাবা এঁর ভক্ত হয়েচেন?' সুপ্রকাশ কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

'তা প্রায় বছর দেড়েক। মা মারা যাওয়ার মাস ছয়েক পর থেকেই', করুণাময় কহিল। 'কিন্তু সেই যে ধর্ম্মের নেশা লাগল, আর যায় কোথায়: শ্রীমা যাচ্চেন হরিদ্বারে চলো হরিদ্বার। মা থাকবেন মথুরায়, মথুরাং ব্রজেৎ। মা যাবেন কামাখ্যা, কামাখ্যার টিকিট কাটো। টাকা? টাকা মাটি। মায়ের সেবায় ব্যয় হওয়ার মতো তার এত বড় সার্থকতা আর নেই। মিথ্যা মায়াময় সংসারের অপরিহার্য্য খরচের জন্য সামান্য রেখে, বাকি সব মায়ের সেবায় ঢেলে দাও।—এ শুধু বাবা নন, ওঁর মতো ডজন ডজন বুড়ো বিভূতির দৌলতে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে' সর্ব্বস্ব মা মহামায়ার পায়ে নিবেদন করে দিচ্চেন। অশিক্ষিত মেয়েমানুষটা—আবার মাফ করবেন,—একটা বুদ্ধিহীন উক্তি করচে, আর ভক্তের দল মুগ্ধ হয়ে নৃত্য করবার উপক্রম হচ্চে—আহা! কী অমৃতবাণী, কী জ্ঞানগর্ভ ঋষি-ভাষণ! বলুন, এখন আপনি এর কি করবেন? সাধারণ ব্যাধি হলে তার চিকিৎসা আছে। বৃদ্ধদের এই দুরারোগ্য ব্যাধি যে দুশ্চিকিৎস্য...'

'মায়ের কাছে দামি কিছু একটা চেয়ে বসুন না; ওঁর কাছে টাকা আর মাটির তো তফাৎ নেই! তবে মাটি না দিয়ে দেয়!' সুপ্রকাশ ঈষৎ কৌতুকের সুরে কহিল।

'আজ্ঞে, না, মাটি দেয় না: অ্যাড্‌ভারটাইস্‌মেণ্টের জন্য অকাতরেই খরচ করেন,' করুণাময় কহিল। 'সেবার চেয়ে বসে-ছিলাম, মায়ের হাতের বড় হীরে-বসানো আংটিটা, কুণ্ডুদের সেই কার দেওয়া। ফস্ করে' আঙুল থেকে খুলে দিয়ে দিলে। হিতে বিপরীত! আর যাবে কোথায়; ভক্তদের সগর্ব্ব জয়ধ্বনিতে আকাশ ভেঙে পড়বার উপক্রম। দেখতে দেখতে পায়ের কাছে হীরে জহরত আর

টাকার স্তূপ জমে গেল। একবার ভেবে দেখুন তো, কত বড় বিজনেস্-এর মাথা, ওয়ান্ হাণ্ড্রেড্ থাউসেণ্ড পার্সেণ্ট লাভ!···বলুন, এইবার আপনি কি করবেন?···'

'দার্জ্জিলিঙে গিয়ে প্রথম সুযোগেই একবার মায়ের সাক্ষাতে উপস্থিত হবো।'

'আবার দলে ভিড়ে যাবেন না তো?' করুণাময়ের কণ্ঠস্বর সোদ্বেগ।

'অসম্ভব কি।' সুপ্রকাশ কহিল। 'ব্যঙ্গ করতে করতে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হয়ে উঠেছিলেন। আমি কতটা হব, কে বলতে পারে?'

'সেরেছে!' বলিয়া করুণাময় বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। 'কিন্তু দার্জ্জিলিং পৌছানোর আগে কিছুতেই আমি আর চোখ মেলছি না। ও-কাম্‌রায় আবার ফিরে যেতে হলে, দার্জ্জিলিং পৌছবার আগেই সম্ভবতঃ আমাকে খদে লাফিয়ে পড়তে হবে···'

'কার্সিয়ং আর কতটা দূর, সুপ্রকাশ?'

'পরের স্টেশনটাই বোধহয়, দিদি। দেখি টাইম-টেব্‌ল্‌টা।'

'এখানে তুমি আর মিণ্টু দুজনেই সরাব্‌জির ওখানে খেয়ে নিও।'

'আর আপনি? ক্ষিধেটা তো আমাদের একচেটিয়া নয়, দিদি। কি বল, মিণ্টু?'

'কিন্তু বমির ভাবটা যে আমার একচেটিয়া, ভাই।' সুজাতা কহিলেন। 'পাহাড়ে উঠতে নামতে সর্ব্বদা। আমি বরঞ্চ তোমাদের সঙ্গে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসব এখন। আয়া আর বেয়ারা এসে মালপত্রের কাছে থাকবে···'

'সু-মামা, দেখ, দেখ, ওটা কি?' মিণ্টু হুইসেল উঠাইল। 'কি রকম একটা চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে পাহাড়! দেখ, মা, চেয়ে দেখ। কি ওটার নাম?'

'ওটা কাঞ্চনজঙ্ঘা ; বরফের পাহাড়।' সুজাতা কহিলেন।

'কতটা উঁচু বলো দেখি ?' সুপ্রকাশ প্রশ্ন করিল, 'সেই পরশু বলে দিয়েছিলাম।'

'কাঞ্চনজঙ্ঘা ? আটাশ হাজার একশো ছেচল্লিশ ফুট', তোতা-পাখীর মতো মিণ্টু কহিল। 'এক ফুট কতটা, সু-মামা ?'

হুস্ হুস্ করিতে করিতে ক্লান্ত পার্ব্বত্য-মূষিকটা কার্ট রোড অতিক্রম করিয়া কাসিয়ং স্টেশনের অঙ্গনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

পনেরো

সুজাতা বড় একটা বাড়ির বাহির হইতে চান না ; সকাল-বিকাল বাহিরের বাগানে আসিয়া বসেন। বৈকালিক চা প্রায়ই বাহিরে পরিবেশন করা হয়। পাইনগাছের সারির ভিতর দিয়া সমুখের সবুজ এবং দূরের কালো পাহাড়গুলির বিচিত্র তরঙ্গের উপর কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্রতা ফস্ফোরাসের ফেনার মতো মনে হয় ; দার্জ্জিলিং শহরের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রকার বাড়িগুলির লাল-রঙা টিনের ছাদ খেলাঘরের মতো দেখা যায় ; সর্পিল রাস্তাগুলি গোলক-ধাঁধার মতো এ-পাহাড় ও-পাহাড়ের গায়ে মিশিয়া অন্তর্দ্ধান হয়। ফগ্গুলি হাজার হাজার অশরীরী মেঘের মতো পাহাড় বাহিয়া হামাগুড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসে ; নতুন আইডিয়া-পাওয়া আর্টিস্টের মতো শাদা রঙের তুলি বুলাইয়া পুরাতন রেখাগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়।

চা শেষ করিয়া সুপ্রকাশ পেয়ালাটা টেবিলটার উপর নামাইয়া রাখিল। কহিল, 'আজ আপনাকে বের হ'তে হবে, দিদি। সারাক্ষণ বাড়িতে বসে থাকলে স্বাস্থ্য ভালো হবে কি করে ? চলুন, এই ধব্ধবে

ফর্শা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে খানিকটা হেঁটে আসি ; সাতদিনের বেড়ানোর হিসাবটা গড়পরতা দৈনিক আধ বার করে না হলে আপনার পক্ষেও সেটা গর্ব্ব করবার মতো হয় না…'

'গর্ব্ব করতে চাইনে, ভাই,' সুজাতা শাদা-কাজ-করা শালটা গলার কাছে আরও একটু টানিয়া লইয়া কহিলেন। 'ঘুরে ঘুরে ছুটে ছুটে বেড়ানো আমার কোনও দিনই হয়ে ওঠে না। এই তো বেশ আছি, খোলা আকাশের তলায় বসে পাহাড় দেখচি ; কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফ রূপোর মতো চক্‌চক্ করচে, রঙিন ফুল আর উঁচু সবুজ গাছের সমারোহ। আর ফগ্? সর্ব্বত্র তার অবারিত গতি। বসে বসেই আমার বায়ু-পরিবর্ত্তন আর স্থান-পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। তোমার সঙ্গে অত আমি ঘুরে বেড়াতে পারব না।'

'ব্যস্, তবে রইলুম আমিও বসে।' সুপ্রকাশ নীল-রঙা বেতের চেয়ারটায় পিঠ এলাইয়া দিল।

'এই দেখো পাগল! ভালো লাগার উপর জবরদস্তি চলে না। কারুর চলতে ভালো লাগে, কারুর লাগে না। তুমি হলে চলন্ত, ছুটতে পারলেই খুসি হও। নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন কল্পনা, নতুন পরিবেশ তোমাকে পুলকিত করে। তোমার পক্ষে বসে থাকাটাই হবে অধর্ম্ম। লক্ষ্মী ভাইটি, ওঠ! মিণ্টুকে নিয়ে খানিকটা ঘুরে এস। তোমার সঙ্গে বেড়াতে পারলে কি রকম খুসি হয় মিণ্টু। তাতে আমিও খুসি হয়ে উঠি…'

'আলস্যবিলাসীর ছলের অভাব হয় না', বলিয়া সুপ্রকাশ সহাস্যে অগত্যা উঠিয়া পড়িয়া মিণ্টুর সন্ধানে গেল!

সারাটা শহর ফগে ঢাকিয়া দিয়াছে। যেন একটা দুষ্টু ছেলে হাতে একটা 'এরেসার্' পাইয়া সুন্দর একটা ছবিকে আমূল ঘষিয়া তুলিয়া

দিয়া শাদা কাগজের আঁশগুলি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। চোখ-জোড়াকে একনিষ্ঠ করিয়া তবে হাতখানিক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়; যে কোনও মুহূর্ত্তে বিপরীত দিকের কারুর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিতে পারে। ঘোড়ার খুরের শব্দ দূর হইতে শোনা যায়, এই যা বাঁচোয়া।

মিণ্টুর গায়ে ভারি ওভারকোট; গলায় কাশ্মীরী গলাবন্ধ যত্ন সহকারে গোঁজা। পরমানন্দে শাদায় মেশা এই অন্ধকারের মধ্য দিয়া সুপ্রকাশের সঙ্গে সণ্ট্ হিল্ রোড দিয়া জলাপাহাড় রোডের দিকে আরোহণ করিতেছে। এ-পথটা পায়ে হাঁটিয়া ম্যাল্-এ পৌঁছিতে পারিলে ঘোড়ায় চড়িতে পারিবে, সু-মামার কাছ হইতে এ-প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে; তবে এতটা অন্ধকার থাকিলে নয়। মনে মনে মিণ্টু ফগ্ পাত্লা হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

জলাপাহাড় রোডে উঠিবার পর মিণ্টুর প্রার্থনা সত্যসত্যই কতকটা ফল দিয়াছে বলিয়া মনে হইল; ঘোড়ার নালের মতো বাঁকা দার্জ্জিলিং শহরটা চোখের সামনে মেলা; নিচের অংশটা হইতে ফগের ঢাকনা অপসৃত হইয়াছে; কার্ট রোড পর্য্যন্ত সব কিছুই পরিষ্কার চোখে পড়ে। শুধু উপর তলায় অস্পষ্টতার মধ্য দিয়াই তাহাদিগকে ম্যাল্-এর দিকে আগাইয়া যাইতে হইতেছে। তবু এখানেও ডান পাশের বাড়িগুলির চেহারা কিছু কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং ঘোড়া চড়া সম্বন্ধে মিণ্টুর আর সন্দেহ রহিল না।

ইতিমধ্যে সে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিয়া সুপ্রকাশকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে। দার্জ্জিলিং শহরের পত্তন কে করে, জলাপাহাড়ের উচ্চতা কত, পাহাড়ে উঠিলে শীত হয় কেন, পাহাড়ে কি করিয়া রাস্তা করে, কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফ কলিকাতায় চালান হয় কিনা, এই সব হরেক রকম প্রশ্ন।

'কে, সুপ্রকাশ না ?'

রাস্তাটা যেখানে চৌরাস্তার দিকে মোড় লইয়াছে, সেখানকার অস্পষ্টতার মধ্য হইতে প্রশ্নটা আসিল, যদিও কোনও মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল না ।

'ঠিক ধরেছি। এ কি ভুল হবার। কোথা থেকে উদয় হলি তুই ?' বলিয়া শুভেন্দু আগাইয়া আসিয়া সুপ্রকাশের কাঁধ চাপিয়া ধরিল।

'প্রায় দিন সাতেক এসেছি।' সহর্ষে সুপ্রকাশ কহিল। 'তুই কবে এলি ? যাক্, তবু একটা চেনা লোক পাওয়া গেল।'

'আমি নয়, আমরা। শুধু বাবা এখনও এসে পৌছয় নি।—সুনীলা, দেখ, এসে, কে! অন্ধকারের মধ্যে জগতের সকল বিস্ময় লুকিয়ে থাকে।' বলিয়া শুভেন্দু পশ্চাৎ দিকে ফিরিল। 'ফগ্-এর মধ্য থেকে সুপ্রকাশকে পাওয়া গেচে।'

পরক্ষণেই ফগ্-এর অবগুণ্ঠন-মুক্ত প্রকৃতির মতো সুনীলা প্রকাশিত হইল। সবুজ ডোরা-কাটা শাড়ি পরনে, গায়ে আঁট একটা উলের জাম্পার ; সবুজ রঙের ওভারকোটটার সবগুলি বোতাম খোলা। পায়ে চকোলেট-বর্ণ ওয়াকিং-শু। উপত্যকায় রৌদ্রপাতের মতো মুখটা খুসিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'সত্যিই তো! আমি ভাবলাম ঠাট্টা বুঝি।' সুনীলা উদ্ভাসিতকণ্ঠে কহিল। 'চমৎকার! আমরা বলছিলাম, আপনাকে যদি কলকাতা আর খবরের কাগজের থেকে ধরে' আনা যেত, তবে কি আনন্দটাই হতো ; ব্যস্, আপনি নিজে থেকেই এসে পৌছে গেছেন। সেই কথা আছে না, যাদৃশী ভাবনা যস্য—এ কে ? বাঃ, চমৎকার ছেলে তো! একে কোথায় পেলেন ? এসো তো খোকন···' বলিয়া সুনীলা নিজেই মিণ্টুর কাছে আগাইয়া গেল।

'ও মিণ্টু। মিণ্টু আমার ভাগ্নে আর আমি মিণ্টুর সু-মামা।

আমার সুজাতাদির ছেলে। এদের সঙ্গেই চেঞ্জে এসেচি।' সুপ্রকাশ কহিল।

'বাঃ, সুন্দর ছেলে। কি রকম সপ্রতিভ মুখটা!' বলিয়া সুনীলা মিণ্টুর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইল। 'বেড়াতে যাচ্ছ বুঝি?'

'বেড়াতে নয়,' মিণ্টু বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়িয়া কহিল। 'ঘোড়ায় চড়তে!'

'ওঃ, ঘোড়ায় চড়তে! ঘোড়ায় চড়তে পার? ভয় পাও না?' হাসিয়া সুনীলা প্রশ্ন করিল।

'ধ্যেৎ, ভয় পাব কেন?' মিণ্টু সগর্ব্বে কহিল। 'আমি যে মেজর। মেজরেরা কি ভয় পায়?'

'পাগল!' শুভেন্দু সকৌতুকে কহিল, 'মেজরেরা কখনও কখনও পূর্ব্বপরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চাৎ অপসরণ করে বটে, ভয় পায় না! ভারি চালাক ছেলে!—কই, প্রদ্যোৎরা আসচে না কেন? নিশ্চয়ই মায়ের গতিটা কূর্ম্মনিন্দিত হয়ে উঠচে। বেচারি প্রদ্যোৎ!—প্রদ্যোৎকে চিনিস না বুঝি, সুপ্রকাশ? কলির ব্রাহ্মণ, আই. সি. এস। রংপুরের এ. ডি. এম্। সম্প্রতি আমাদের অতিথি।—কলকাতায় গিয়েছিল; ছুটির দরখাস্ত ড্রাফট্ করে' তখনই সই করিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ফলে পূজোর ছুটি আরম্ভের পূর্ব্বেই মুক্তি পেয়ে বেচারি বেঁচে গেছে।—হোক পেয়াদা বা আই. সি. এস.—সেই একই কলুর ঘানি তো···'

'তোমাদের বাড়িটা কোন্ রাস্তায় মিণ্টু?' সুনীলা মিণ্টুকেই মাতব্বর ঠাওরাইয়া প্রশ্ন করিল।

'অল্ক্যাণ্ড রোড।'

'আবার অল্ক্যাণ্ড!' সুপ্রকাশ হাসিয়া কহিল। 'একদিনে দুবার ভুল করা কি কোনও মেজরের পক্ষে উচিত? অক্ল্যাণ্ড রোড।'

'না না, অল্ক্যাণ্ডই ভালো', সুনীলা সহাস্তে কহিল। 'কি নামটা বাড়ির ?'

'স্নো হোয়াইট ফিল্ম্ দেখনি ?' মিণ্টু দুষ্টু হাসিয়া কহিল। 'এটা তার উল্টো। হোয়াইট্ স্নো। এবার হয়েছে তো, সুষামা ?'

'এবার একশোর মধ্যে একশো', সুপ্রকাশ হাসিয়া কহিল।

সামান্য পরেই ক্লান্ত, ক্রমোচ্চ-পথ আরোহণে অপারগ সৌদামিনী সঙ্গে আটাশ-উনত্রিশ বছরের একজন লম্বা, চট্‌পটে আধ-ময়লা রঙের যুবককে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

সুনীলা সোৎসাহে কহিল, 'মা, চেয়ে দেখ, কে! সুপ্রকাশবাবু! একেবারে আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন জলাপাহাড়ের রাস্তার মধ্যখানে।...'

'বেশ, বেশ', সৌদামিনী কহিলেন। 'কবে এসেচ, সুপ্রকাশ? কোথায় উঠেচ ?'

সুপ্রকাশ জানাইল।

'ইনি আমার বন্ধু সুপ্রকাশ। আর ইনি,' শুভেন্দু পরিচয়-দান প্রসঙ্গে কহিল, 'আমার বন্ধু প্রত্যোৎ।'

'আই. সি. এস্।' সৌদামিনী পরিচয়-প্রদানের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া সংশোধন করিয়া দিলেন।

প্রত্যোৎ অতি-ভদ্র নমস্কার করিল; সুপ্রকাশের কথা সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছে জানাইল, এবং সংবাদপত্র-সেবা যে খুব ভালো কাজ তাহা জানাইতেও ত্রুটি করিল না। কহিল, 'যতই বলুন, আমাদের ইণ্ডিয়ান্দের কাছে আজকের এই আব্‌হাওয়া মোটেই প্রীতিপদ নয়।'

'আর এর পরিচয় দিলে না, দাদা', সুনীলা মিণ্টুকে সামনে উপস্থিত

করিয়া কহিল, 'ইনি মিণ্টু। মিণ্টু সুপ্রকাশবাবুর ভাগ্নে, আর সুপ্রকাশ বাবু মিণ্টুর সু-মামা।'

'তা ছাড়া', শুভেন্দু কহিল, 'মিণ্টু একজন কিংস্ কমিশন অ-প্রাপ্ত মেজর।—কিন্তু আজ ঘোড়ায় চড়ার সংকল্পটা আমাদের অনুরোধে ত্যাগ করো, মেজর মিণ্টু। চল্, সুপ্রকাশ, কাছেই আমাদের বাড়ি, গোল্ডেন্ পীক্; বেশ ঘনীভূত হয়ে একটু আড্ডা দেওয়া যাবে গিয়ে…'

'আমাদের বাড়িতে একটা দোল্না আছে, মিণ্টু', সুনীলা কহিল 'তুমি দোল্না চড়তে নিশ্চয়ই ভালোবাস?'

'খুব', মিণ্টু সুনীলার হাত ধরিয়া অতিক্রান্ত পথেই ফিরিতে ফিরিতে কহিল।

ড্রইং-রুমে উপবিষ্ট অন্যান্য অতিথিবর্গের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না-দিয়া সুনীলা মিণ্টুকে লইয়া এখানে ওখানে ছুটোছুটি করিতে লাগিল। এ দেখাইল, ও দেখাইল; এক হাত ভরিয়া কেক্ ও অন্য হাতে চকোলেট দিল; গলাবন্ধটা সুবিন্যস্ত করিয়া দিল; চুল আঁচড়াইয়া দিল, মুখে পাউডার ও জামায় সুগন্ধি সংযোগ করিল। অবশেষে উভয়েই কলহাস্যে সারা বাড়িটা মুখরিত করিয়া রঙিন বাগানটার মধ্যে বিরাট ম্যাগ্নোলিয়া গাছটার কাছাকাছি হ্যামক্-শ্রেণীর দড়ির জালের দোল্নাটার উপর চড়িয়া বসিল।

অগত্যা সৌদামিনীকেই চা পরিবেশন করিতে হইল। এ-কাজটা সুনীলার; বিশেষত, প্রদ্যোতের উপস্থিতিতে এসব কর্ত্তব্যগুলি সে নিষ্ঠা ও সৌকুমার্য্যের সঙ্গে পালন করুক, ইহাই তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু সুনীলা জেদি মেয়ে; বস্তুতঃ, তাহার ছেলে এবং তাহার মেয়ে উভয়েই জেদি ধরণের, জোর করিয়া তাহাদের দিয়া কিছু করান দুঃসাধ্য।

'আপনাদের কাগজওয়ালাদের সম্বন্ধে', প্রদ্যোৎ চায়ের পেয়ালাটা ঠোঁটের কাছে উঠাইয়া কহিল, 'আমাদের একটা অভিযোগ আছে। কিছু মনে করবেন না, আপনি বাংলাদেশের একটা নামকরা কাগজের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন, তাই বলচি। একটু বিবেচনা করে দেখবেন। আপনারা যখন মন্তব্য করেন, তার মধ্যে অনেক সময়ই পোলিটিক্যাল প্রোপাগাণ্ডাটা বেশি থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই আপানারা যে-সহানুভূতি দেখান এবং অনেক ক্ষেত্রে সরকারী কর্ম্মচারিদের আচরণের যে-নিন্দা করেন, সেটা অধিকাংশ সময়েই আমরা, যারা ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংযুক্ত, তারা রিয়ালিটিস্-এর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন না মনে করে পারি না···হয়তো আমরা উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিকোণ ঠিক উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু আমাদের সমস্যার কথাটাও কি সম্পাদকীয় লেখার সময় বিবেচনা করা উচিত নয়?···'

'রিয়ালিটিস্!' কথাটা শুনিয়া সুপ্রকাশ পক্ষ্ম উদ্ধারিত করিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনেতাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এ-শব্দটি প্রায়শই প্রয়োগ করিয়া থাকে। সুপ্রকাশের কাছে শব্দটা স্বকীয়-স্বার্থের সহিত একার্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'ভেবে দেখুন, স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্পর্কিত কোনও শান্তি-ভঙ্গের কথা।' প্রদ্যোৎকুমার চায়ের পেয়ালাটা পেগ্-টেবিলে নামাইয়া কহিল। 'তখন আমাদের অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখুন। আপনারা বিশ্বাস না করতে পারেন, কিন্তু আমরাও দেশের স্বাধীনতা চাই। কিন্তু যেটা স্পষ্ট আইনভঙ্গ তাতে বাধা না-দিয়ে কোনও উপায় থাকে না। নইলে, আমাদেরও সহানুভূতি দেশকর্ম্মীদের পক্ষে। জনতা ছত্রভঙ্গ করা, মানুষ-পিটানো বা গুলি ছোঁড়ার আদেশ দিতে আমাদেরও কিছু আনন্দ হয় না। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, ভদ্র ছেলেদের জেলে পাঠাতে খুসি অনুভব করি, এমন শয়তানও নই। কিন্তু

প্রকাশ্য ভাবে আইন-ভঙ্গ করলে, জনতাকে স্পষ্ট প্ররোচিত করে' শান্তিশৃঙ্খলা ওলট-পালট করতে চাইলে, অপ্রিয় কর্ত্তব্য করতে বাধ্য হতে হয়। এতে যথাসাধ্য সংযমের পরিচয় দিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করি ; কিন্তু কাগজওয়ালাদের কাছে এর মূল্য নেই ; এ-সম্পর্কিত সকল অপ্রিয় কাজ, তা সে যত সাবধানে, যত সংযমের সঙ্গেই পরিচালিত হোক, একটা বিরাট শয়তানি, একটা প্রবল অত্যাচার ! অথচ অপর পক্ষের দিকটা আপনারা একবারও বিবেচনা করে' দেখেন না…'

'এ-সমস্যার একটিমাত্র সমাধান আছে।' সুপ্রকাশ মৃদু হাসিয়া কহিল। 'কিন্তু সে সমাধানটা একটু উগ্র। ওতে সহসা কেউ রাজি হবে না বলে জানাতে সব সময়েই দ্বিধা বোধ করি।'

'চাকরি-ত্যাগ নয়তো ?' শুভেন্দুর চোখ দুষ্টুমিতে চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। 'রোগ-রোগীনাশিনী বটিকা !'

সৌদামিনী সন্ত্রস্ত হইয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন। আশঙ্কায় ও আতঙ্কে তাহার দুই চোখ পূর্ণ হইয়া উঠিল। যেন বিলম্ব হইলে প্রদ্যোৎকুমার এখনই চাকরি ছাড়িয়া দিবে, এমন উদ্বেগের সঙ্গে তিনি দ্রুত কহিলেন, 'না, না, এ-সব ঠাট্টা ভালো নয়। চাকরি ছাড়বে কোন্ দুঃখে ? চাকরির সেরা চাকরি, আই, সি, এস—ওদের সব পাগলামিতে তুমি কান দিয়ো না, বাবা। ইচ্ছে থাকলে, কাজের মধ্যে থেকেই দেশের দশের কত উপকার করা যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের কথা না শুনে এই যে প্রদ্যোৎ স্বদেশী ছেলেদের ন' মাসের জায়গায় ক' মাসের না জেলের হুকুম দিলে, চাকরিতে না থাকলে তার জো ছিল ?'

'কিন্তু জাপানীরা যদি আসে,' শুভেন্দু মাকে চটাইবার উদ্দেশ্যে কহিল, 'তবে আই, সি, এস্-দের কি অবস্থা হবে, বল্‌তো প্রদ্যোৎ ? এত দামি চাকরিতে ওদের কি প্রয়োজন হবে ?—যা শস্তার কারবার ওদের ?'

'জাপানীরা মোটেই আসবে না', সৌদামিনী রাগান্বিত হইয়া কহিলেন।

'এতে আমারও সন্দেহ নেই', শুভেন্দু কৌতুকের স্বরেই কহিল। 'ইংরেজের উপর যতই চটে থাকি, তবু তারা চেনা 'ডেভিল্!' কিন্তু এটা কল্পনার কথা হচ্চে। ভেস্টেড্ ইন্টারেস্ট্ যদি সবই যায়, তবে কি—সাবধান, প্রণ্বোং, বেশি ভরসা রেখো না সিভিলিয়ানির ওপর! মনে রেখো, উপদেশের সার, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—আমি অতিশয় দুঃখিত মা। রাজনীতিতে ইস্তফা। মাউন্ট্ এভারেস্টে সূর্য্যোদয় দেখতে টাইগার হিলে কবে যাচ্ছি বল···'

মিণ্টুর ফরমাস অনুযায়ী সুনীলা বিভিন্ন গাছ হইতে ফুল ছিঁড়িতেছে। অদূরে দাঁড়াইয়া নেপালী আয়াটা 'বাবা'র এই ক্ষুদে সাথীটির দিকে তীর্য্যক-চোখে চাহিয়া মিটমিট হাসিতেছে। মালীটা নোংরা কিম্ভূত জামা পরিয়া পিছন পিছন ঘুরিতেছে; তাহার সাহায্যের কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার কোনও প্রকার ত্রুটি ঘটিতে পারিতেছে না।

'এটা ক্রিসান্থেমাম্, এটা ডালিয়া', একস্থান হইতে অন্যত্র মিণ্টুকে টানিয়া লইয়া ফুল-চয়ন করিতে করিতে সুনীলা বলিতে লাগিল, 'এটা ক্যানা, এটা এভারলাস্টিং—শীগগির শুকিয়ে যাবার নয়, এটা জেরেনিয়াম, এটা—এটার নাম জানিনে—এটা সুইট পী, ব্যস্ হয়ে গেল একটা তোড়া···এই নাও···'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মাসি।' মেজর মিণ্টু চোস্ত ইংরেজি কায়দায় কহিল।

'আচ্ছা!' হাসিয়া সুনীলা কহিল। 'এসব কে শেখায় তোমাকে?'

'কেন, সু-মামা। আরও কত শিখিয়েচে। সব আমার মনে থাকে।' মিণ্ট সগর্ব্বে কহিল।

'আর আমি যা মাকে বলতে বলেছি, মনে আছে ?'

'খুব।'

'কি বলতো ? কি বলবে গিয়ে মাকে ?' সুনীলা প্রশ্ন করিল।

'বলব', মিণ্টু কহিল, 'বুঝলে মা, কাল ভোরবেলায়ই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে আমার নতুন-পাওয়া আমার ফুল-মাসি !'

'ফুল-মাসি !' সবিস্ময়ে সুনীলা চাহিল। 'এ-নাম কোথা থেকে পেলে ?'

'বাঃ রে,' মিণ্টু দুষ্টু হাসিয়া কহিল, 'তুমি আমাকে ফুল তুলে দিলে যে। ফুল দিলে বলেই তো ফুল-মাসি।'

বাড়ি ফিরিয়া দেখা গেল রায়বাহাদুর হলঘরে সুজাতার কাছে অনর্গল বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছেন। বিষয়টা যে মহামায়ার মাহাত্ম্য, তাহা সুপ্রকাশ দূর হইতেই অনুমান করিয়াছিল, শোনা যায় এমন দূরত্বের মধ্যে পৌঁছাইয়া সে- বিষয়ে আর সংশয় রহিল না।

'আরে এই যে, সুপ্রকাশ। এসে গেছ। কি ব্যাপার শুনি ? সাত সাতটা দিন পার হয়ে গেল', রায়বাহাদুর তাহাকে বাচনিক আক্রমণ করিয়া কহিলেন, 'সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, অথচ একবারও মায়ের দর্শন করে এলে না ! নিজেও কি একবার আসতে পেরেচি। কোথা দিয়ে দিন কেটে যায়, টেরও পাইনে। লোকজনের আসা-যাওয়া, পূজো-আচ্চার জোগাড়, ভোগের ব্যবস্থা, গুরু-ভায়েদের আদর-আপ্যায়ন, মায়ের সেবা সব একাই করতে হচ্চে ; সাধ্য কি অন্য কোনও দিকে নজর দিই।...বলে গেলাম আমার মাকে—এটি চলবে না মা,—বেড়াতে বের হও আর নাই হও, ভিড় থাক আর নাই থাক, সকালে হোক সন্ধ্যায় হোক, মা মহামায়াকে গিয়ে একবার

দর্শন করে' আসতেই হবে। বিশ্বাস করো, বাবা, বুড়োর কথাটা বিশ্বেস করো—মা মহামায়া জাগ্রত দেবী—এতে সন্দেহমাত্র নেই…'

'তা যাব বৈ কি, নিশ্চয়ই যাব।' সুপ্রকাশ কহিল। 'দিদিকে একবার জোর করে তো নিয়ে যান। তারপর স্বেচ্ছায়ই কতবার যাবেন, কে বলতে পারে?'

'ঠিক বলেচ, বাবা, ঠিক বলেছ।' রায়বাহাদুর সুজাতার চোখের কৃত্রিম তিরস্কার-সূচক চোখের দৃষ্টি না-লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'এমন আনন্দ যে, সংসার জ্ঞান থাকেনা, পৃথিবী জ্ঞান থাকে না। হবে বৈ কি মা, হবে; মা মহামায়ার কৃপা হলে, ভক্তির এই সুধামৃত থেকে তুমিও বঞ্চিত হবে না। কিন্তু এইবার উঠতে হচ্ছে। বড় আনন্দ পাই তোমাদের সঙ্গে কথা করে, কিন্তু রাতের ভোগের সময় হয়েচে, এইবার না উঠলে কোথায় কোন্ ত্রুটি থেকে যাবে। কাল কিন্তু যেতেই হবে মা, বুড়ো ছেলে এই আব্দার করে গেলুম। আর এই নব্য যুবককেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।…রক্তের জোর আছে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে বিশ্বাস কম…কিন্তু হবে, মা মহামায়ার কৃপা হলে, সবারই হবে। কে জানে, একেই তিনি লীলামাহাত্ম্য প্রচারের বাহন মনোনীত করবেন কিনা…কে বলবে, কার ওপর মায়ের কোন্ দয়া হবে।… কিন্তু কালই যাওয়া চাই কিন্তু মা।' বলিতে বলিতে তিনি রাতের ভোগের ব্যবস্থা করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুজাতাও উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন, 'কাল হয়ে উঠবে না; পরশু যাব।'

'আবার পরশু।' রায়বাহাদুর উৎসাহের অভাবে মর্ম্মাহত হইয়া কহিলেন। 'তা জোর করব না মা। সুবিধামতোই যেয়ো। কিন্তু আবার যদি ডাকতে হয়, তবে কিন্তু রেগে উঠব মা, এই বলে দিয়ে গেলুম।'

ষোল

প্রশস্ত বসিবার কক্ষের সমস্ত আরামদায়ক আসন ও আসবাবপত্র ঠেলিয়া দেয়ালের ধারে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাঠের মেঝের আগাগোড়া ফরাস-পাতা। এ-ফরাসের উপর মানুষের একটা অখণ্ড মেলা বসিয়া গেছে। মাথার অরণ্যের উপর দিয়া তাকাইলে ইহার শেষ-প্রান্তে বড় কাচের জানালাটার কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত উঁচু গদির মঞ্চাসন চোখে পড়ে; তাহার উপর মন্দিরের দেবতার মতো শ্রীশ্রী মা মহামায়া উপবিষ্ট আছেন।

গৌরাঙ্গী, প্রসন্নবদনা, বিহ্বলনয়না মধ্যবয়স্কা নারী; রুক্ষ কেশ আলুথালু, সিন্দূরের বিন্দু জাজ্বল্যমান, অধরে রহস্যময় হাস্য সদা-বিরাজিত। লাল-পেড়ে গরদের শাড়ি পরণে, হাতে সোনায় বাঁধানো শঙ্খ-বলয়, পদ-পল্লবে অলক্তক। এই সজীব দেবী মূর্ত্তির সমক্ষে অগণিত ভক্ত ও শ্রদ্ধাবান শ্রদ্ধাবতীরা সসম্ভ্রমে বসিয়া আধিদৈবিক রোমাঞ্চ অনুভব করিতেছেন।

সুজাতা যখন এই ভক্ত-মণ্ডলীপূর্ণ কক্ষের প্রবেশ-পথে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রশ্নোত্তরের পালা চলিতেছে। ভক্তেরা এবং কৌতূহলীরা নানান্ ধরণের আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করিতেছেন; মা মহামায়া সহাস্য বদনে জবাব দিতেছেন, কিছুর বা জবাব না দিয়া হি-হি, হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছেন। ভক্তেরা পরের প্রশ্নগুলিকে বালকোচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছেন; এই প্রকার প্রশ্নের জবাব না দিয়া মা মহামায়া সর্ব্বদাই এইরূপ উদার হাস্য করেন।

'এস মা, এস। বড় আনন্দ দিলে, বড় খুসি হলাম।' রায়বাহাদুর ভিড়ের মধ্য হইতে পলকে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন। 'এগিয়ে এস, মা। ঐদিকটায় মেয়েরা বসেচেন, চল, একেবারে সামনে গিয়ে,

াসবে।—এস, বাবা, এস, তুমিও এগিয়ে এস। তোমারই যে ভাল করে দেখে, বাজিয়ে নেওয়া দরকার। মায়ের মহিমা প্রচারের ভার য তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে…'

'আমি এখানটায় দাঁড়িয়েই ভালো লক্ষ্য করতে পারব। আপনি দিদিকে সামনে নিয়ে যান', সুপ্রকাশ ভিড়ের পশ্চাতে একদিকের দেওয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল।

'সে কি। এ কি একটা কথা হলো?' রায়বাহাদুর স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, 'মাকে প্রশ্ন করবে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করবে, তবে তো চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হবে। মা যে জাগ্রত দেবী; ইনি তো চুপ করে থাকেন না, ভক্তের প্রার্থনায় কান দেন। এতদূরে দাঁড়িয়ে,—না না, এস, ভিড়ের মধ্য দিয়েই পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়া যায়। চল মা, চল, এগিয়ে চল…এরা ছেলেমানুষ, দাঁড়িয়ে থাকতেই পছন্দ করে। কিন্তু বাবা, কোথাও যদি কিছু সন্দেহ থাকে চুপ করে থেকোনা; মাকে প্রশ্ন করে দ্বিধা দূর করে নিয়ো…'

ভিড়ের মধ্য হইতে মাথাটা কিঞ্চিৎ জাগ্রত করিয়া একজন প্রশ্ন করিলেন, 'মা, এই দারুণ শীতে তুমি সামান্য এই বস্ত্রটুকু গায়ে কাটাও কি করে? তোমার কি শীতগ্রীষ্ম কিছুই বোধ নেই?'

মা মহামায়া ইহার বাচনিক জবাব না দিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

'মা', অপর জন প্রশ্ন করিলেন 'এই মায়াময় মিথ্যা জগতে জীব অনর্থক বিড়ম্বিত হ'তে আসে কেন?'

'খেলা, খেলা, খেলা!' মা মহামায়া হো-হো করিয়া হাসিয়া রহস্য-মধুর কণ্ঠে কহিলেন:

'সাংখ্য-দর্শন কি ভগবান বিশ্বাস করেনা, মা?' অপর জ্ঞানলোভী ভক্ত জানিতে চাহিলেন।

'তাই নাকি? জানিনে তো?' মা আবার হি-হি করিয়া প্রসন্ন হাস্য করিয়া উঠিলেন।

সুপ্রকাশের সমুখে এক ডজন ভক্ত প্রতি উত্তর শুনিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, এবারেও সসম্ভ্রমে কহিল, 'শুনেচেন, শুনেচেন মায়ের জবাবটা? মাথায় কত বড় জ্ঞানের সাগর লুকানো থাকলে এমন একটা জবাব দেওয়া যায়! দেবী, জাগ্রত মহামায়া…'

'তাকাবেন না, ওটার চোখের দিকে অমন করে' তাকাবেন না। বিভূতির মধ্যে ঐ বিদ্যেটুকুই আছে—হিপ্‌নোটিস্‌ম্‌! দেখচেন না, এতগুলি লোককে কেমন ভেড়া বানিয়ে দিয়েচে।'

অলক্ষ্যে কখন করুণাময় আসিয়া সুপ্রকাশের পাশে দাঁড়াইয়াছিল; আশঙ্কা আর চাপিতে না পারিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া সুপ্রকাশের কানে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিল। কপালে ফোঁটা-তিলক, গলায় ফুলের মালা, পরণে ক্ষৌম-বাসের উপর শাদা শাল—একেবারে প্রথম শ্রেণীর ভক্তের চেহারা।

'শেষ হয়ে গেলাম, সুপ্রকাশদা, একেবারে নাভিশ্বাসের আগের স্টেজে এসে পৌচেছি। মহামায়ার কল্যাণে বন্ধনমুক্ত হ'তে আর দেরি নেই। সারা দিন-রাত্তির চরণ-সেবা করে ধন্য হচ্চি। বাবার গুরুভায়েদের সংকার করে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করচি। বিশ্বাস করবেন, দশবারো দিন হলো দার্জ্জিলিঙ এসেচি, একবার ম্যাল্‌টা পর্য্যন্ত ঘুরে দেখে আসতে পারিনি; সারা শহরটায় গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী আর গেরুয়া-হৃদি ভক্ত ছাড়া আর যে কেউ আছে, ভাবতে পর্য্যন্ত পারি না। আরতি, অর্চ্চনা, ভোগ, আপ্যায়ন, তত্ত্ব-আলোচনা, আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা—শুনুন, শুনুন একবার মূল্যবান প্রশ্নগুলি এবং শ্রীশ্রীমহামায়ার মুখ-

নিস্থত তার অমূল্য উত্তর! বেচারি শঙ্করাচার্য্য! তোমার পাণ্ডিত্যের অভিমান ধূলিসাৎ!'

'এই প্রশ্নোত্তর কি সারাদিনই চলবে? এত জনের এত রকমারি প্রশ্নের জবাব দেওয়া তো কম হাঙ্গামা নয়।' সুপ্রকাশ কহিল।

'আরে না না, লেজিসলেটিভ্ অ্যাসেমব্লির অধিবেশনে যেমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে, আমাদেরও তেমনই ব্যবস্থা।' করুণাময় ফিসফিস্ করিয়া বলিল, 'পরলোকের তথ্যাদি এখান থেকেই সংগ্রহ করতে হয় কি না, তাই ব্যবস্থাও খাট সরকারি। আর যদি জবাবের নিজস্ব গুণের কথা বিবেচনা করেন, তবু তফাৎ খুব বেশি করা চলে না ;—উত্তর থেকে প্রশ্নের মীমাংসা আশা করা উভয় ক্ষেত্রেই নেহাৎ দুরাশা ; তবে তফাৎ আছে বৈকি। পরিষদের সদস্যেরা অস্পষ্ট উত্তরে সন্তুষ্ট হ'তে চাননা, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ; কিন্তু ভক্তেরা সেরকম নয় ; শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখাৎ যে জবাবই বে'র হয়ে আসুক না কেন, তা সে যতই না অস্পষ্ট বুদ্ধিহীন ছেলেমানুষি হোক, ভক্তেরা মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ; ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা করে তারা নিজেদের ঠকিয়ে বেশ স্বর্গীয় তৃপ্তি অনুভব করে। মা হেঁচেছেন—কি অর্থপূর্ণ এই হাঁচি, ষড়দর্শনের অতি সহজ ব্যাখ্যা এই হাঁচির মধ্যে ধরা পড়ে গেচে।—চৌধুরি-সাহেবের আবার কি প্রশ্ন? ভিড়ের মধ্য থেকে টাক-ভরা মাথাটা বারবার কচ্ছপের মাথার মতো উঁচু করে তুলছেন, অথচ কোনই আধ্যাত্মিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন না?'

সুপ্রকাশও কিছুক্ষণ ধরিয়া মাথাটা লক্ষ্য করিয়াছে। চাঁদির উপরে গোলাকার একটা চকচকে টাক, গলাতে একটা রঙিন নেকটাই, গায়ের স্যুটটা গাঢ় নীল সার্জ্জের। বারবার মাথাটা উপরে তুলিয়া মা মহামায়ার উচ্চাসনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হইতেছে, কিন্তু প্রশ্ন আর কিছুই করা হইতেছে না। বেচারীর এই প্রয়াসটা সুপ্রকাশের

কাছে করুণ মনে হইয়াছে। রামাশ্যামা সকলেই যখন উচ্চবিষয়ক প্রশ্নগুলি অবলীলাক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিতেছে, তখন এমন একজন হোম্‌রা-চোম্‌রা দর্শন লোক প্রশ্ন করিতে ঘামাইয়া উঠিবেন কেন?

'প্রশ্নের জ্বালায় গেলাম, সুপ্রকাশদা, একেবারে শেষ হয়ে গেলাম!' করুণাময় সাতঙ্কে পুনরুৎসারিত মাথাটার দিকে চাহিয়া কহিল, 'দেখুন তো একবার কাণ্ড। শেষে চৌধুরি-সাহেবও প্রশ্ন করবার জন্য ক্ষেপে উঠেচেন। সব হতাশ লোকেরই দেখচি—ঐ দেখুন, একটু এসে আপনার কাছে দাঁড়িয়েছি, অমনি ডাক পড়েছে। সত্যি বলচি, বাবার ঐ হাতটিকে আমি ভূতের চেয়েও বেশি ভয় করতে আরম্ভ করেচি; সারাক্ষণ নাড়ছেন—এস বাছা, এস। দেবসেবা করে জীবন সার্থক কর, এমন দুর্লভ সুযোগ আর জীবনে পাবে না।—একবার কল্পনা করে দেখুন, আমার দ্বৈত ভূমিকাটা। বাবার কাছে সারাক্ষণ একটা ভক্তিমানের অভিনয় করে যাওয়া যে আমার আত্মার পক্ষে কি কষ্টকর—আর নয়, এবার চলি, বলব একদিন চৌধুরি-সাহেবের কথা। বেশ একটা মজাদার গল্প আছে—ওরে বাবা, কি জরুরি হাত-নাড়া দেখছেন, তাড়াতাড়ি না গেলে এবার নির্ঘাৎ পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হবে—' বলিয়া দুষ্টহাস্য করিয়া করুণাময় দ্রুত মহামায়ার মঞ্চের দিকে পিতৃ-সন্নিধানে ছুটিল।

মা মহামায়াকে পুত্রের জিম্মা করিয়া তবে রায়বাহাদুর নড়িতে পারিলেন। ভিড়ের মধ্য দিয়া সুজাতাকে পথ করিয়া দিতে দিতে কেবলই তিনি বিস্ময় ও দুঃখ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। 'এই এলে, মা, আর এরই মধ্যে চলে যাচ্চ। মানুষের যে নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকেনা; দিন-রাত্তির ভুল হয়ে যায়। ভিড় কিছু বেশি বটে মা,

শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাবার জন্য লোক ক্ষেপে গিয়েছে; অসুবিধা হচ্চে তোমার বুঝতে পারি, তা বলে এসেই চলে যাবে, বলতো মা, এ কি কম দুঃখের কথা!—এই যে, বাবা, সুপ্রকাশ, নাও, বাবা, তোমার দিদিকে আবার তোমারই জিম্মা করে দিলাম। বেশ ছিলেন, মুখের ভাব দেখে মনে হলো, যেন সমাধিস্থই হয়েছেন, এমন সৌম্য, এমন ভক্তিতে ভরা; তারপরই ভিড়ের দিকে তাকাচ্ছেন, আর শীতের মধ্যেও যেন ঘেমে উঠচেন। তা বেশ, আমিও জোর করে' আটকে রাখবনা, মা মহামায়ার যদি কৃপা হয়ে থাকে, তবে আমার এ মা-টি এখন গেলেন বটে, আবার কালই ফিরে আসতে হবে—কোন জোরাজুরিরই আর আবশ্যক হবে না…'

'দিদি, ওদিকে কেন?'

'বাড়ি ফিরছি, ভাই।'

'কিন্তু বেড়াতে যাবার প্রতিশ্রুতিটা?' বিস্মিত হইয়া সুজাতার পাংশু ক্লান্ত মুখের দিকে চাহিয়া সুপ্রকাশ কহিল।

'ভাল লাগচে না ভাই। আজ আর পারবনা। বাড়ি গিয়ে একটু চুপ করে থাকতে চাই। তুমি ঘুরে এস।' সুজাতা চলিতে চলিতে কহিলেন।

'শরীর খারাপ লাগচে কি?'

'না, ঠিক আছি। ব্যস্, আর তোমাকে আসতে হবে না। ফেরবার সময় জিনিষগুলো মনে করে নিয়ে এস, ভুলো না।'

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুজাতা প্রাইভেট রাস্তার অপর প্রান্তে না-পৌছাইল ততক্ষণ সুপ্রকাশ নিচেই দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ যেন সুজাতা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন মনে হইল। অথচ এ-বিষয়ে পীড়াপীড়ি করিয়া

স্বীকারোক্তি আদায় করিতে যাওয়া একান্তই নিরর্থক, তাহাও সুপ্রকাশ বেশ জানে। ভিড় ও গোলমাল সুজাতা সহ্য করিতে পারেন না; সম্ভবতঃ এই জন্যই এমন হঠাৎ অসুস্থ বোধ করিতেছেন। কেনা-কাটায় বাহির হইবার কথা ছিল; তাহার ভারটা সুপ্রকাশের উপর আসিয়া পড়িল।

কাঁপিতে কাঁপিতেই সুজাতা ড্রইং-রুমের কৌচটার উপর বসিয়া পড়িলেন। পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই কাঁপিতেছে মনে হইল। বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ যেন কানে আসিয়া স্পষ্ট প্রবেশ করিতেছে। এক মুহূর্ত্তে শান্ত সংযত দেহযন্ত্রগুলি যেন বিকল হইয়া তটস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

স্পষ্ট দেখিয়াছেন; চোখের দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করিবার কোনও উপায় নাই। দৃষ্টিবিভ্রম ইহা নহে। ভিড়ের মধ্য হইতে মাথাটা বারবার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে। ভিড়ের মধ্যে বা কোলাহলের মাতামাতিতে সে-চেহারা ভুল করিবার নয়। সেই সুস্পষ্ট মুখটা হইতে এক জোড়া চোখের তীব্র দৃষ্টি যেন বাঘের চোখের চাওয়ার মতো; সুজাতার অন্তস্থলে সে-দৃষ্টি আতঙ্কের আলোড়ন তুলিয়াছে; ভয়ে সুজাতা বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন।

'মা, কতদূর বেড়িয়ে এলাম। এই দেখ, কত বুনো-ফুল তুলে এনেচি। বল তো, মা-মণি, বেয়ারার সঙ্গে কোন্ পাহাড়ে গিয়েছিলাম?' সশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিতে আসিতে মিণ্টু সগর্ব্বে কহিল। 'বলতো তার নাম? কি জানি নামটা বেয়ারা?'

'মিণ্টু, চেঁচামেচি করোনা। আয়ার কাছে যাও। আমাকে একলা থাকতে দাও।'

সবিস্ময়ে একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া এক সেকেণ্ডমাত্র দ্বিধা করিয়া মিণ্টু দুঃখিতভাবে কার্পেটের উপর ধীরে ধীরে অলস ক্ষুদ্র পা ফেলিয়া পাশের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। মায়ের আদর পাইবার জন্য মনটা লোভী হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করা চলেনা, তাহা সে জানে।

এইবার, সমুখের পর্দা-আঁটা কাচের দরজাটার দিকে সভয়ে বারবার চাহিয়া সুজাতা ভাবিতে লাগিলেন, সে যদি পিছন পিছন আসিয়া উপস্থিত হয়? ঠিকানা-সংগ্রহ করিতে তার আর কোন অসুবিধাই হইবে না; অনায়াসেই সে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। সেই চোখের তীব্র দৃষ্টি, এবং বিস্মিত, ঈষৎ তিরস্কার-ভরা মুখ একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হইল। দীর্ঘ পাঁচ বছর হইল ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, তবু আজও স্বামী তাহার কাছে তেমনি আতঙ্ক এবং বিতৃষ্ণার সংমিশ্রণ হইয়া রহিয়া গিয়াছে। এখন যেন বিতৃষ্ণা অপেক্ষা আতঙ্কটাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—বাধ্যতার অনুশাসন ভঙ্গ করাটা এতই বিপজ্জনক। এইবার যদি সে এই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া হুকুমের স্বরে বলে—'চলে এস, চলে এস বলচি', বাধ্য বিনীত দাসীর মতো উঠিয়া সুজাতা কি অমনি স্বামীর অনুগমন করিবে?

ঠক্, ঠক্, ঠক্। বাহিরের দরজায় আওয়াজ শুনিয়া সুজাতা শিহরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। পালাইবেন, ছুটিয়া শয়ন-কক্ষে পালাইবেন? অন্ধকার পাহাড়ী-পথে ছুটিয়া আত্মগোপন করিবেন? সমাজের অনুশাসনকে উপেক্ষা করিবার, স্বাতন্ত্র্যের জন্য বিদ্রোহ করিবার সাহস কি তাহার সত্যই ছিল? আজ তাহা কোথায় এমন করিয়া অন্তর্দ্ধান করিল?

'দিদি!'

'কে?' চমকাইয়া দরজার দিকে তাকাইয়া সুজাতা কহিলেন, 'ওঃ,

সুনীলা! এস, এস ভাই! কে না কে এল, বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।' পরম আশ্বস্ত হইয়া আগাইয়া গিয়া তিনি সুনীলার হাত নিজের হাতে লইলেন।

'আজই আবার এলাম দিদি', সুনীলা বড় কৌচটায় সুজাতার পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল। 'এতো ভালো লেগেচে যে, মাত্রা রক্ষা করা সম্ভব হচ্চে না। দাদা আর প্রদ্যোৎবাবু গেলেন মাউণ্ট এভারেস্ট্ হোটেলে কার সঙ্গে দেখা করতে; আমি চলে এলাম আপনার কাছে—বিরক্ত হবেন না যেন।'

'না ভাই, বিরক্ত হবো কেন। বড় আনন্দ হলো।' সুজাতা প্রসন্ন-মুখে চাহিয়া কহিলেন। 'হোক একদিনের পরিচয়, কিন্তু এরই মধ্যে তুমি যে আমার ছোট বোনটি হয়ে উঠেচ, সুনীলা। তোমার ইস্কুলের গল্প তো সুপ্রকাশের কাছে আগেই শুনেছিলাম; তোমার সব আইডিয়ার গল্পও কাল তার কাছে শুনেছি। এমন বোন পাওয়া কি কম সৌভাগ্য?'

'আইডিয়া ফেনিয়ে তাকে মস্ত কিছু প্রতিপন্ন করতে যাওয়াই যাদের পেশা', সুনীলা ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে কহিল, 'তাদের কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করলে ঠকবেন, দিদি। ছোটকে বাড়িয়ে বলা সুপ্রকাশবাবুর স্বভাব। কোথায় গেছেন? বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?'

'জোর করে পাঠিয়েছি। অচল দিদির সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্য সে-ও অচল হয়ে উঠতে চায়। সে কি হতে দিতে পারি? সে চলন্ত; ছুটে চলায়ই তার আনন্দ, নতুন পরিবেশে নতুন অভিজ্ঞতায়, নতুন চিন্তার মধ্যে চলতেই সে খুসি হয়। আজ সে অবাধ্য হবার উপক্রম হয়েছিল—কাজ দিয়ে তাকে বাইয়ে পাঠিয়েছি। গেরস্থালির টুকিটাকি এবার তাকে কাঁধে বয়ে আনতে হবে...'

সুনীলার মুখটা আবার কৌতুকে ও আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। 'এত উঁচুতে সারাক্ষণ বসে থাকেন', বেশ খুসি হইয়াই সে কহিল, 'মনে হয়, নিচের কিছু যেন চোখেই পড়ে না। এবার বেশ হয়েচে শাস্তি। এমন উদাসীন লোক কোথাও আর দেখেচেন, দিদি!'

'ঠিক বলেছ, ভয়ানক সে উদাসীন। কিছুই যেন তার নজরে পড়ে না। কিন্তু বড় ভালো ছেলে, বড় ভালো ছেলে।' সুজাতা বাহিরের ক্রমঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চাহিয়া যেন অন্যমনস্কভাবে কহিলেন। 'কে জানে ভাই, হয়তো উদাসীন বলেই এত ভালো লাগে। কিছুই সে চায়না, কিছুই তার দাবি নেই, কিছুর ওপরে যেন আসক্তিও নেই। অথচ সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পার, সবচেয়ে বড়ো বিপদেও অনায়াসে ভরসা করতে পার।···হ্যাঁ, সুনীলা, তোমার বাবার চিঠি পেয়েছ? কবে আসচেন?'

'পূজোতে আর আসতে পারবেন না', সুনীলা কহিল। 'জরুরি কাজে আটকে গেছেন। লিখেচেন, অক্টোবরের পরেও যদি আমরা থাকি, তবেই আসতে চেষ্টা করবেন। নইলে আর নয়। বাবা এলে খুব খুসি হতেন। সুপ্রকাশবাবুকে তিনি খুব পছন্দ করেন; বলেন, সুপ্রকাশ আইডিয়ার লোক, ভবিষ্যৎ জগতের বনিয়াদ যারা ঠিক করবে, ও তাদের দলের। সৃষ্টির প্রথমেই হলো পরিকল্পনা, তার পর প্রচেষ্টা···। কিন্তু মিণ্টু কোথায় গেল, দিদি? সে-ও কি সু-মামার সঙ্গে বেরিয়েচে?···'

'এই তো আমি, ফুল-মাসি।' হুইসিল বাজিবার পর কাচের দুই পাট দরজার ফাঁকে মিণ্টুর উঁকি-মারা মুখটা প্রকাশ পাইল। কাচের দরজার ওদিকে দাঁড়াইয়া সে সবই লক্ষ্য করিতেছিল। এইবার অধৈর্য্য আগ্রহে কহিল, 'ভেতরে আসব মা-মণি? এইবার আসব?'

'এস', সুজাতা কহিলেন, 'এতক্ষণ দরজার কাছে কান পেতে

বসেছিলে, কেমন? এখানে এসে এমন আহ্লাদে-ছেলে হয়ে উঠেছে, ভাই। মা আর সু-মামা, সু-মামা আর মা! কোথাও আর নড়বে না। এস, ফুল-মাসির কাছে এসে বসো।'

মিণ্টুকে আর দুইবার অনুরোধ করিতে হইল না; অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া সে সুনীলার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

'হ্যাঁ, মিণ্টু, আজ ভোরে যেতে বলেছিলাম, যাওনি যে? ব্যস্, দেখো আমি কি রকম আড়ি করে' দিই। আড়ি করায় আমার জুড়ি নেই, তা মনে রেখো।' সুনীলা আঙুল দিয়া মিণ্টুর চুল আঁচড়াইয়া কহিল।

'বাঃ রে, সু-মামা নিয়ে গেল না যে।'

'নাই বা নিয়ে গেল।' সুনীলা কহিল।

'একা একা যাব?' মায়ের দিকে কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে চাহিয়া লইয়া মিণ্টু কহিল।

'কেন, মাকে নিয়ে যাবে।'

'ধ্যেৎ, মা বুঝি যায় কোথাও, মা তো শুধু বসে থাকে।'

'এ না হলে আর ছেলে', হাসিয়া সুজাতা কহিলেন, 'মায়ের নিন্দে রটিয়ে বেড়াচ্ছ। কিন্তু মাসির নিমন্ত্রণের কথাটা কি আমাকে একবারও বলেছিলে?'

'যেতে তুমি মা?' পরম বিস্ময়ে ব্যগ্রস্বরে মিণ্টু প্রশ্ন করিল।

'যাব না কেন। তোমার মাসি যে আমার বোন।' সস্নেহ চোখে সুনীলার দিকে চাহিয়া সুজাতা কহিলেন। বড় ভালো লাগিয়াছে তার এই মেয়েটিকে। সুন্দরী সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বশালিনী মেয়ে, নম্রতায় ভদ্রতায়, নিরহঙ্কার সরলতায় একান্ত কমনীয়। মস্ত বড় একটা আদর্শ যেন ইহার মুখমণ্ডলেও একটা মহিমা সম্পাত করিয়াছে। এইরূপ

স্বাস্থ্য-প্রদীপ্ত, বলিষ্ঠচিত্ত, তেজস্বী, সংস্কৃতি-বিনম্র মেয়ে গড়িয়া তোলার স্বপ্নই যে শিক্ষয়িত্রী সুজাতা দেখিয়া আসিতেছেন। যেন মন্ত্রবলে সেই ভবিষ্যৎ ছাত্রীদের একজন আগাম আসিয়া তাহার চোখের সমুখে উপস্থিত হইয়াছে।

খাওয়ার টেবিলে সুপ্রকাশ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা মহামায়াকে কেমন দেখলেন দিদি, তা বললেন না তো?'

'তুমি কেমন দেখলে?' সুপ্রকাশের প্লেটে আরও এক চামচ মাংসের কোর্মা তুলিয়া দিয়া সুজাতা পাল্টা প্রশ্ন করিয়া উত্তর এড়াইয়া গেলেন।

'হাসব ভেবেছিলাম, কিন্তু হাসতে পারলাম না।' সুপ্রকাশ চামচটা মুখের কাছাকাছি তুলিয়া আবার প্লেটের উপর নামাইয়া রাখিল। 'হঠাৎ এমন করুণ মনে হলো, উপহাস করার মতো আর জোর নেই।'

সুপ্রকাশের কণ্ঠস্বর আর পরিহাস-তরল নহে, এক মুহূর্তে তাহা যেন মন্ত্রে বদলাইয়া সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। সুজাতা সবিস্ময়ে পক্ষ্ম উদ্ঘাটিত করিয়া চাহিলেন।

'চোখের সামনে দেখচি, যাকে সত্য এবং স্থির বলে বিবেচনা করতাম', সুপ্রকাশ বাহিরের অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণীর দিকে অন্যমনস্কের মতো চাহিয়া কহিল, 'পলকে পলকে তা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্চে। তাজা মানুষের মাংস অকস্মাৎ পচতে শুরু করে দেয়; সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে ওঠে; শক্ত মজবুত বলে যাকে জানতাম, একদিন চম্‌কে চেয়ে দেখি, তার ভিৎ পর্য্যন্ত নড়বড়ে হয়ে উঠেচে। এই গলন্ত ঠুন্‌কো জড়বস্তুর আবেষ্টনে অকস্মাৎ মানুষ নিজেকে বড় অসহায়, বড় বিমূঢ় মনে করতে শুরু করে দেয়। কিছু ধ্রুব, কিছু

চিরন্তন, কিছু নির্ভরযোগ্য খুঁজে পাবার জন্য সে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এই অসহায় ব্যাকুলতায় সে বিচারবুদ্ধি পর্য্যন্ত হারিয়ে বসে। দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত যেমন রোগ-উপশমের আশায় রাস্তার হাতুড়ে-বদ্যির স্বপ্নাদ্য ঔষধ বিচারহীন পরিপূর্ণ বিশ্বাসে গিলে ফেলে, অনন্তের মধ্যে বাঁচবার ব্যগ্র-আগ্রহে পৃথিবীর মানুষ, মরণভয়ভীত মানুষ, তেমনি মরিয়া হয়ে ওঠে। পরমার্থের সন্ধান দিতে পারে বলে যে-ই দাবি করে, বিচারহীন ব্যাকুলতায় তার কাছেই ছুটে যায়। এমন করুণ, এমন শোচনীয় করুণ আর কিছু ভাবতে পারি না।—যাকগে, আমিও দেখি আধ্যাত্মিকতা প্রচার শুরু করলাম। কিন্তু আর খেতে ইচ্ছে করছে না, দিদি।'

'না, না, সে হবে না, সুপ্রকাশ।' সুজাতা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন: 'কিছুই এখনও তোমার খাওয়া হয়নি। তুমিও কি শেষে সেন্টিমেণ্টাল হয়ে উঠবে? মন্দ কি, যতদিন বাঁচি সে-ই যথেষ্ট। কোনও পরিণতি যদি না থাকে, কি এসে গেল?'

'কিছু না, দিদি।' সুপ্রকাশ কহিল। 'কিন্তু সমস্যাটা তবু থেকে যায়। কি হয়, কি পরিণতি, কি সত্য? এই রহস্যের মধ্যে দিশেহারা হয়ে লোকে ভক্তির মাদকতার মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে পায়, চণ্ডুখোরের নেশার মতো। বলুন তো, কত সামান্য, কত সংকীর্ণ মানুষের জ্ঞানের প্রসার? কি করুণ এই অন্ধ-বিশ্বাস, এই নিরুপায় আত্মপ্রবঞ্চনা।'

'যাক্ ওসব কথা। এইবার তুমি খেয়ে নাও।'

'দিন, আর কি দেবেন?' সুপ্রকাশ আটপৌরে হইবার চেষ্টা করিয়া কহিল। 'খাওয়ার মতো এত বড় প্রচণ্ড সত্য আর কিছু নেই।'

সতেরো

প্রায় অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি ও বাত্যার মধ্য দিয়া পূজাটা পার হইয়া গেল। টাকা খরচ করিয়া যে সব স্বাস্থ্যলোভীরা হিমালয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া বসিয়াছিল, সকলেই ঘরে বন্ধ রহিয়া আব্‌হাওয়াকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। দার্জ্জিলিঙের মজা বারো আনাই মাটি হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু পূজা পার হইবার দশ-বারো দিন পরে কলিকাতার খবরের কাগজের মধ্যে যে-খবর আসিল, তাহা পড়িয়া বাঙালিরা একেবারে গালে হাত দিয়া বসিল। পাহাড়ী-সৌন্দর্য্য উপভোগের অন্তরায় বলিয়া যে বাত্যা ও দুর্য্যোগের প্রতি চেঞ্জে-আসা লোকেরা এমন অভিযোগ বোধ করিয়াছিল, পূজাটা মাটি করিবার জন্য যাহাকে অভিসম্পাত দিয়াছিল, তাহার উপর অভিযোগের তাৎপর্য্যটা যে কত বড় হইয়া উঠিবে, তাহা ইহারা ধারণা করিতে পারে নাই। এইবার টের পাইল। বঙ্গোপসাগর হইতে একটা বিরাট জলোচ্ছ্বাস ঝড়ের রথে চড়িয়া করাল মৃত্যুর মতো মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ঘর-বাড়ি, মানুষ ও পশু শত শত সহস্র সহস্র ভাসাইয়া ঝাঁটাইয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া গিয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অগণিত জাপানী বোমারু-বিমান অসংখ্য বোমা ফেলিয়াও যে ক্ষতি করিতে পারিত না, প্রকৃতির উন্মাদ বিপর্য্যয়ে সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হইয়া গেছে। বিপদের অভাবনীয়তা, মৃত্যুসংখ্যার অঙ্ক এবং সম্পত্তি-হানির পরিমাণের যে প্রাথমিক বিবরণ বাহির হইল, তাহা বুকের অন্তস্থল পর্য্যন্ত হিম করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট।

বাঙালির জাতীয় উৎসবের প্রথম দিন, সপ্তমী পূজার তারিখেই এই সর্ব্বনাশা দৈবদুর্ব্বিপাক সংঘটিত হয়, কিন্তু সংবাদটা চাপিয়া তাহা প্রকাশ করা হইল দশ-বারো দিন পরে। সমুদ্র-উপকূলে সামরিক আত্মরক্ষার যে ব্যবস্থাদি ছিল, এই জলোচ্ছ্বাসের ফলে তাহাও নানা প্রকারে বিপর্য্যস্ত হয়; শত্রুপক্ষের কাছে এ-খবর পৌঁছিতে দেওয়া বিপজ্জনক মনে করিয়াই খবরটা চাপিয়া দিতে হইয়াছিল বলিয়া সরকারী বিবৃতি বাহির হইল। ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত অঞ্চলে সরকারী সাহায্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহাও জানান হইল। কিন্তু এত বড় একটা বিপৎপাতের সংবাদ এতদিন ধরিয়া চাপিয়া রাখিয়া বাংলাদেশের বে-সরকারী সহানুভূতি ও সহায়তা হইতে এই আর্ত্ত অঞ্চলটিকে বঞ্চিত রাখা বাঙালি জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর ও রূঢ় মনে হইল; ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অবিলম্বেই সন্দেহের সৃষ্টি হইয়া সংবাদপত্রগুলিতে প্রতিধ্বনিত হইল।

সুপ্রকাশ এই সংবাদে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। বাংলাদেশের এত বড় একটা বিপদের কালে সাংবাদিক সুপ্রকাশ তাহার কর্ত্তব্যের ঘাঁটিতে অনুপস্থিত থাকিবে, ইহা যেন অপরাধের মতো মনে হইল। সঙ্কটক্ষণে তাহার গুরু কর্ত্তব্য রহিয়াছে; কলিকাতা হইতে দূরে থাকিলে তাহাতে ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। জনসহানুভূতি গঠনের দায়িত্ব, সাহায্য-সংগ্রহের দায়িত্ব, সাহায্য-বিতরণের দায়িত্ব কে জানে কোন্‌টা তাহার উপর ন্যস্ত হইবে?

মহামায়া-দর্শনের পর হইতে সুজাতাদি কেবলই যাওয়া-যাওয়া করিতেছেন। বিস্মিত সুপ্রকাশ স্বাস্থ্যের কারণ দেখাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছে; বলিয়াছে, মাত্র সামান্য কয়দিনের হাওয়া-পরিবর্ত্তনের জন্য যাওয়া-আসার হাঙ্গামাও পোষায় না এবং আরও অনেক কিছু বলিয়াছে। কিন্তু মেদিনীপুরের এই সর্ব্বনাশা দুর্য্যোগের

সংবাদ পাইবার পর দার্জ্জিলিঙের আরাম ও সৌন্দর্য্য, পাহাড় ও ফগ্-এর মায়া, রজত কাঞ্চনজঙ্ঘার স্নিগ্ধ সম্মোহন যেন অনাহার ক্লিষ্টের চোখের সামনে রাজভোগ আহারের মতো অস্বস্তিকর মনে হইতে লাগিল। সুজাতার প্রস্তাবে সে রাজি হইয়া গেল।

দুপুর হইতেই পাহাড়ের সানুদেশ হইতে মেষপালের মতো ফগ্-এর পুঞ্জীভূত কুণ্ডলী হামাগুড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছিল, শীঘ্রই তাহারা দূরদূরান্তের পাহাড়ের রেখা মুছিয়া দিল, অরণ্যশ্রেণী বিলুপ্ত করিল এবং দ্রুত দার্জ্জিলিং শহরে হাজির হইয়া নিরঞ্জনের দর্শন প্রচার শুরু করিয়া দিল।

সুপ্রকাশ বাহির হইয়াছে এই রহস্যের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে। এই অস্পষ্টতা, এই পোকায় কাটা ছবির মতো অসমাপ্ত রাস্তার মধ্য দিয়া সমাপ্তির দিকে আগাইয়া যাওয়ার আকর্ষণ, অ-দেখা পাহাড়ী ঝরনার রহস্যময় ধ্বনি, ভিজা মাটি ও অরণ্যের গন্ধ সুপ্রকাশকে বস্তুহীন জগতের আস্বাদ দান করে।

'সুপ্রকাশবাবু।'

'কে, সুনীলা?' চম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া সুপ্রকাশ ফগ্-এর মধ্য দিয়া দৃষ্টি-প্রেরণের চেষ্টা করিল। 'এখনও চোখে দেখতে পাচ্ছি না, গলাটা শুনতে পাচ্ছি মাত্র। আশা করি, ভুল করি নি।'

'তবে এই দেখুন! অশরীরী মোটেই নই। অন্ধকারের মধ্য থেকে আবির্ভূত হলেও রক্তমাংসের মানুষ', বলিয়া সুনীলা অস্পষ্টতার মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিল।

'কোথায় যাচ্ছ? ওরা সব কোথায়?'

'যাচ্ছিলাম, ডুমুরের ফুলের সন্ধানে। পেয়ে গেলাম রাস্তায়ই। কিন্তু সঙ্গে কেউ নেই।'

'তবে চল, বাড়ি ফিরি। দিদির সঙ্গে বসে গল্প করা যাক্।'

'বাড়ি? উঁহুঁ।' ঘাড় নাড়িয়া, হাতের বেঁটে ছাতা দোলাইয়া, দুষ্টু খুকির মতো সুনীলা কহিল। 'আবিষ্কারের নেশা লেগেছে, দেখছেন না? অন্ধকার ফগ্-এর মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছি। চলেছি, ঝর্‌নার সুর-লাগা, পাইনের সুর-লাগা, অজানা অস্পষ্ট পাহাড়ী পথে। হয়তো একটা নতুন পাহাড়ই আজ আবিষ্কার করে' ফেলব, কে জানে…'

'সব ইতিপূর্ব্বেই আবিষ্কার হয়ে গেচে।' মৃদু কৌতুকের সঙ্গে সুপ্রকাশ কহিল। 'ফিরে এসে শুনবে, এ-দ্রষ্টব্য দেখেনি, সারা শহরে এমন লোক একটিও নেই। পরিশ্রমই সার হবে।'

'চলুন না, দেখা যাক।' সুনীলা পা বাড়াইয়া কহিল, 'কাঞ্চন-জঙ্ঘার চূড়োয় চড়তে পারেনি বলে, কাঞ্চনজঙ্ঘা-অভিযানের গৌরব কি কম?'

'কিছুমাত্র নয়। আমরা সরাসরি এ-পথে হাঁটতে থাকলে', সুপ্রকাশ আমোদের সঙ্গে কহিল, 'অন্তত ঘুম্-এ পৌঁছিতে পারবই।'

কাকঝোরার উপর দিয়া অক্ল্যাণ্ড রোড ধরিয়া দুজনে আগাইয়া গেল। বাড়ি ও বাংলোগুলি বিরলতর হইয়া উঠিল। বঙ্কিম সরীসৃপের মতো কার্ট রোডটা নিচ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ রেলওয়ের একটা ট্রেন পায়ের তলা দিয়া হুঁস্ হুঁস্ করিয়া কুয়াসা-অস্পষ্ট অজগরের মতো ঘুম্-এর দিকে আগাইয়া গেল। বাঁ দিকে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল; ডান দিকে অসীম শূন্য। সুদূরের নিস্তব্ধ চিরনিদ্রিত পাহাড়শ্রেণী কখনও বা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কখনও বা শাদা আস্তরণে সম্পূর্ণই অবলুপ্ত। ঘোড়ার গলার ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যায়, পাহাড়ী গ্রাম হইতে দার্জ্জিলিঙের বা দার্জ্জিলিং হইতে গাঁয়ের যাত্রী কিছু নেপালী স্ত্রী-পুরুষ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। ইহা

ছাড়া একটা অসীম নির্জ্জনতা এই রহস্যময় পর্ব্বত-রাজ্যে যেন নিবিড় হইয়া আছে। এই নিস্তব্ধতা মনের মধ্যে ভয় ঢুকাইয়া দেয়; চতুর্দ্দিকের পাহাড়গুলি যেন নিঃশব্দে তোমার দিকে চাহিয়া অলক্ষ্যে পরস্পরের সঙ্গে চোখ-ইসারা করিতেছে—যে কোনও মুহূর্ত্তেই একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া যাইতে পারে।

'আর হাঁটতে পারি না। বসব এই ঝরনাটার পাশে? একটু-ক্ষণ মাত্র?'

'বসো। পায়ে ফোস্কা পড়েনি তো?'

'এখনও নয়। ঘুম্ পর্য্যন্ত পৌছতে পৌছতে কি হবে বলতে পারি নে। ওখানে গেলে কি কেবলই ঘুম পায়?'

'সম্ভবত।' সুপ্রকাশের ঠোটের দুই প্রান্তে দুষ্টু হাসি প্রকাশ পাইল। 'পরিশ্রম করে' উঠতে উঠতে ক্লান্তিতে ঘুম আসে বলেই এমন নাম। কিন্তু ঘুম-এ এখনও পৌছাই নি,—এখনও চোখ বোজার সময় হয় নি...'

তাড়াতাড়ি চোখের পাতা মেলিয়া সুনীলা স্মিত মুখে কহি 'ভয় নেই, ঘুমিয়ে পড়ে আপনাকে বিপদে ফেলব না। জানেন, আমাদের মুনি-ঋষিরা চোখ বুজে ধ্যান করতেন কেন? তাতে একাগ্রতা সৃষ্টির সহায়তা করে। সেই একাগ্রতার সঙ্গে পরমার্থের চিন্তা করা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়, তা আমার কাছে মূল্যবানও মনে হয় না। আমি নেহাৎই পৃথিবীর মানুষ; পৃথিবী থেকেই আনন্দ এবং আশ্বাস খুঁজতে চেষ্টা করি। কিন্তু একাগ্রতার প্রক্রিয়াটা ঋষিদের কাছ থেকে ধার করলে সেটা কি চুরি করা হয়?'

'কিছুমাত্র নয়।' সুপ্রকাশ কহিল। 'এগুলি হলো ঐতিহ্য, যাকে নিয়ে আমরা গর্ব্ব করি। ঐতিহ্য সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি—পৃথিবীর একমাত্র সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পত্তি...'

পাহাড়ের হাল্কা বায়ুর কল্যাণে মন হাল্কা হইয়া ওঠে; কথার সুরও হাল্কা হইয়া ওঠে। কিন্তু পাহাড়ের গাম্ভীর্য্যও কম নয়। অদৃশ্যপথে হাল্কা মনের উপর এ-গাম্ভীর্য্যের প্রভাবও অজ্ঞাতসারে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাথরে পাথরে ঘা খাইয়া উপরের ঝর্‌নার জল জপ-মন্ত্র উচ্চারণের মতো একই ধ্বনি সৃষ্টি করিয়া যেন চারিপাশ একটা অভাবিত গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সুদূর শূন্যের দিকে চাহিয়া সুনীলা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

'আচ্ছা, সুপ্রকাশবাবু', সহসা সুনীলা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, 'পৃথিবীর এমন মুক্তির মধ্যে, এমন উঁচু পাহাড়ের আবেষ্টনে, ফগ্-এর শুভ্রতার মধ্যে কেউ যদি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা বড় চাকরি আর বেশি ক্ষমতা লাভ, তবে কেমন শোনায় সে আদর্শটা?'

প্রসঙ্গের পারম্পর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সুপ্রকাশ আঙুলের বন্ধন হইতে বুনো-ফুলটা মুক্ত করিয়া সবিস্ময়ে সুনীলার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, তাহার চোখের দৃষ্টি আর সুদূরে প্রসারিত নহে, নিচের ঝর্‌নার জলের দিকে চোখ নত হইয়াছে।

'আদর্শের সঙ্গে ক্ষুদ্রতার বা ছোট স্বার্থের সমন্বয় কি সম্ভব? মহতের সঙ্গে হীনকে কি এক সূতোয় গাঁথা যায়? বলুন, জবাব দিন? এর ওপর আমার জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করচে। চুপ করে' থাকবেন না।'

সুপ্রকাশ তবু চুপ করিয়াই রহিল। এই আকস্মিক প্রশ্নের কোনও তাৎপর্য্য তার হৃদয়ঙ্গম হইল না।

'জীবনে যারা যথেষ্ট টাকা দেখেনি, ক্ষমতা-প্রয়োগের সুযোগ পায়নি', সুনীলা রহস্যভরা কণ্ঠে বলিয়া চলিল, 'দারিদ্র্য বা মধ্য-বিত্ততার

যারা বড়ো হয়ে উঠেচে, আদিষ্ট হয়েচ অথচ আদেশ করতে পারেনি, তাদের দুঃখময় অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় একটা আই, সি, এস্ তার পদগৌরব এবং মোটা মাইনের চাকচিক্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ও-দুটোর কাঙাল তো আমি কোনও কালেই ছিলাম না; হুকুম করার ক্ষমতা আর টাকা ব্যয়ের ক্ষমতা ছোটবেলা থেকে দুটোর কোনটারই আমার অভাব নেই। তবে আমার কাছে থেকে এ দুর্ব্বলতা আশা করা কেন?'

এতক্ষণে সুপ্রকাশ সুনীলার অস্পষ্ট উক্তির অসংলগ্নতার মধ্যে একটা পারম্পর্য্য আবিষ্কার করিতে পারিল। প্রস্তাবটা ছেলেটিকে তাহার মন্দ লাগে নাই; ব্যবসায়ীদের প্রতি সৌদামিনীর অবজ্ঞা এবং বড় চাকুরিয়ার প্রতি সম্ভ্রমের পরিচয়ও তাহার অপরিজ্ঞাত নয়। শুভেন্দুর এই আতিথ্যের আমন্ত্রণের পশ্চাতে এমন একটা কিছু সম্ভাবনার আভাসও সে দেখিতে পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আপত্তির বা অভিযোগের কোনও কারণই আবিষ্কার করিতে পারে নাই, বরঞ্চ ইহাকে স্বাভাবিক ও সুন্দর বিবেচনা করিয়াছে। হঠাৎ সুনীলার কথার সুর তাহাকে চমক্ লাগাইয়া দিল।

জুতোর ছুঁচলো আগাটা দিয়া সমুখের শ্যাওলা-সবুজ পাথরের চাপড়াটাকে মৃদু আঘাত করিতে করিতে মুখ অবনত রাখিয়াই সুনীলা বলিতে লাগিল, 'লোভী, স্বার্থপর, আত্মসর্ব্বস্ব মেয়ে হতে কোনও দিনই তো চাই নি। বড় করে', ব্যাপক হয়ে; সবার জন্য বাঁচতে চেয়েছি। আদর্শকে শ্রদ্ধা করেছি, আইডিয়াকে সম্মান করেচি, ব্রতের প্রতি নিষ্ঠা বোধ করেচি। অকিঞ্চন প্রলোভন আমাকে দেখানো কেন? কি আমাকে আকর্ষণ করতে পারে, তা আমিই জানি।' বলিয়া এতক্ষণ পরে একবার অশ্রুর আভাসে থম্‌থমে, সংকল্পে প্রদীপ্ত, দৃঢ়তায় কঠিন এবং নম্রতায় স্নিগ্ধ একটা বিস্ময়কর মুখ তুলিয়া চাহিল।

'ঐ দেখো', সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি দৃষ্টি এড়াইয়া সুদূরে চাহিয়া কহিল, 'ন্যাড়া পাহাড়টার মাথায় শাদা ফগ্ কেমন পশমী-টুপি পরিয়ে দিয়েচে, প্যারাম্বুলেটারের খোকার টুপির মতো। এসো উঠে পড়ি ঘুম-এ পৌছুলে ট্রেন্ বা ট্যাক্সি কিছু একটা জোগাড় হতে পারে...'

'আলস্য-বিলাসে, চা-ডিনার পার্টির আতিথেয়তায়, স্বামীর পদ-গৌরবের দেমাকে গর্ব্বিত হয়ে জীবন কাটাতে চাওয়ার মেয়ে তো আমি নই', সুনীলা ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিয়া কহিল। 'আমি আদর্শের সেবা করতে চাই, জীবনকে বড় করে' কাজে লাগাতে চাই, আরাম করে' বাঁচাটাই বড় কথা মনে করিনে। আমার আদর্শ উদ্‌যাপনের জন্য যার নির্দ্দেশ আমার পক্ষে...'

'সুনীলা, চল, আর দেরি করো না। সন্ধ্যা হ'তে আর খুব দেরি নেই।'

একটা আহত ভাব সুনীলার মুখের উপর প্রায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। দীর্ঘ এক মিনিটকাল সে চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে কহিল 'বেশ, চলুন।'

সমুখের দেওয়ালের দীর্ঘ ছায়াটা অকস্মাৎ সুজাতার চোখে পড়িল অবলীলাক্রমে তিনি পশ্চাতে তাকাইলেন। দরজার সমুখে পলকে মনুষ্যমূর্ত্তি আবিষ্কার করিলেন। তাহার বয়ন-ব্যাপৃত অন্যমনস্কতার সুযোগে তাহার বহু আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ, তাহার দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করিবার আগ্রহের হেতু, তিক্ত অতীতের স্মারক তাহার স্বামী অতুলানন্দ চৌধুরি অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন।

'আশা করি চিনতে অসুবিধা হচ্চে না,' চৌধুরি বেশ সুস্থিরভাবে

ধীরে ধীরে নিকটে অগ্রসর হইয়া কহিলেন। 'প্রয়োজন বোধ করলে পরিচয়টা নিজ মুখেই ব্যাখ্যান করতে প্রস্তুত আছি—ব্যস্, অনুমতির অপেক্ষা না করেই মহাস্বাধীনার দরবারে বসে পড়া গেল—গুস্তাকি মাপ হয়। তারপর আছ কেমন?'

'ভালো আছি।' সুজাতা গম্ভীরস্বরে অকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন।

অতুলানন্দ চৌধুরি মধ্যবয়স্ক, মধ্যমাকৃতির লোক। মাথার চাঁদির উপর একটা সুগোল টাক; কানের উপরকার চুলে শাদার আমেজ লাগিয়াছে। ভুরুগুলি কেশ-প্রাচুর্য্যে যেন কিছুটা দূর পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়াছে; দাড়ি-গোঁফ চাঁছা, মুখের চোয়াল জোড়া কিছু বেশি ভারি। শক্ত এক্-ভাঁজ কলারের উপরে কালো 'বো' বাঁধা। গায়ে কালো কোট, প্যাণ্টের ফ্ল্যানেল কালো ডোরা-কাটা।

'হুঁ। ভালো আছ। মাস্টারনিগিরি ভালোই লাগচে, তাহলে?'

'হাঁ।'

'মাস্টারির মাইনেয় মোটর চড়া যায় কি? না ট্রামে-রিক্সাতেই ইস্কুলে যাতায়াত করতে হয়? ভালো আছ, উঁ? আশা করি যুদ্ধের মাগ্‌গির বাজারে খাওয়া-দাওয়ার কিছু অসুবিধে হচ্চে না?'

'আর কি কিছু বলবার আছে?' সুজাতা সংযত-গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই কহিলেন।

'আছে বৈকি, অনেক আছে।' চৌধুরি সিগারেট লাইটার ঘুরাইয়া আলো জ্বালিয়া বর্ম্মা চুরুট ধরাইলেন। 'আমার কিছু তাড়া নেই; ক্রমে ক্রমে বলচি।—হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন। স্বাধীনতার কিছু কি মুনাফা লাভ হয়েচে? তেজ দেখানোটা কিছু দিনের জন্য ভালো, ওতে স্বাস্থ্যের উপকার হয়। কিন্তু বেশি দিন নয়। লোকসান বাড়তে থাকলে কোনও ব্যবসাই বেশি দিন চলবার নয়; তখন ব্যবসা গুটিয়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের পরিচয়। জিজ্ঞেস করচি, তার সময় হয়েছে কি?'

'ধন্যবাদ। এখনও হয়নি।'

'হুঁ। হয়নি, বেশ!—নেপালী আয়াটা সম্বন্ধে সেই স্ক্যাণ্ডালটা আগাগোড়া বানানো। ওর নব্বইভাগ অতিরঞ্জিত।' চৌধুরি সিগারের ধোঁয়ার মধ্য হইতে কহিলেন। 'এ সম্বন্ধে তখনও আমি জোর প্রতিবাদ করেচি, এখনও করচি। অত নিচুতে নামা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি জোর গলায় বলচি, ওটা মিথ্যা...'

সুজাতা চুপ করিয়া কোলের উলের অসমাপ্ত মাফ্‌লারটার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

'ব্যস্, তবে আর অভিযোগের রইল কি? উঁ? জবাব দাও, রইল কি?' চৌধুরি জেরা করার ভঙ্গিতে কহিলেন। 'তোমার বীরত্ব দেখাবার প্রধান হেতুটা জল হয়ে গেল। চাও তো এ আমি প্রমাণ করে' দিতে পারি; নিঃসন্দেহভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারি...'

'তার দরকার, নেই।' সুজাতা না চাহিয়া মৃদুস্বরেই কহিলেন।

'হুঁ। কোনও প্রমাণই বিশ্বেস করবে না। জেদটাই তোমার বড় কথা। উঁ?' চৌধুরি মুখ হইতে সিগার নামাইয়া কহিলেন, 'কিন্তু কেন, কেন শুনি? আমার চেয়ে কোন্ স্বামী স্ত্রীকে বেশি আদর করেচে? কোন্ স্বামী তার স্ত্রীর জন্য এমন অকাতরে অর্থব্যয় করে তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছে? নতুন নতুন মোটর কিনেছি কাকে খুসি করতে? বাড়ি সাজিয়েছি কার জন্য? গহনার সেট্ অহরহ কিনে এনেচি কার গলায় পরিয়ে দিতে? শুনি? চুপ করে থেকো না, জবাব দাও?'

'খেলাঘরের পুতুলের জন্য।'

'ওসব 'সিল্লী' কথা ছেড়ে দাও। খেলাঘর! পুতুল! হুঁ!' চৌধুরি এইবার একটু অধৈর্য্য কণ্ঠেই কহিলেন। 'ওসব ইব্‌সেন-পড়া

রাবিশ্ বাংলা-দেশে চালাতে এসো না। খেলাঘর! সংসারে পুরুষ প্রধান হবে, এটা প্রকৃতির নিজ হাতের বিধান! প্রকৃতিকে অস্বীকার করতে চাওয়া পথ আগ্‌লে আছে বলে পাহাড়কে তেড়ে ঘুষি মারতে যাওয়ার মতো। মেয়েদের যথেষ্ট সম্মান করতে আমরা শিখেচি; উগ্র স্বাধীন জেনানা ছাড়া পুরুষের অনিবার্য্য প্রাধান্যটাকে সবাই সুবিধাজনক বলেই স্বীকার করে নেবে···অবাধ্য চাকর তোমার দয়া আকর্ষণ করে রেহাই পায়নি, এ যদি তোমার অভিযোগ হয়—এ অভিযোগ তুমি করেছ—তবে সেটা অত্যন্ত অনুচিত অভিযোগ। তোমার গৃহস্থালীর ব্যবস্থায় যদি কখনও সামান্য হস্তক্ষেপ করে' থাকি, সেটা ভালোর জন্যই করেছি। তোমার নিমন্ত্রিতের তালিকা যদি কেটে দিয়ে থাকি, সেটা অবাঞ্ছিত লোককে বাদ দেবার বা সংখ্যা কমাবার জন্যই করেচি। তুমি চাকর বা আশ্রিতদের সঙ্গে চেঁচামেচি গালাগালি পছন্দ করো না, কিন্তু বাড়ি ঠিকমতো চালাতে হলে ও না ক'রে উপায় নেই।—কিন্তু এসব কি স্বামীগৃহ ত্যাগের যথেষ্ট কারণ, উঁ? বল, জবাব দাও? যে টাকা উপার্জ্জন করে, গৃহস্থালার সুব্যবস্থার শেষ-দায়িত্ব তারই; বাধ্য হয়ে তাকে কিছু শাসন, কিছু খবরদারি···'

'অর্থ উপার্জ্জনের ভার এজন্যই অন্যদেরও নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।' সুজাতা ধীর কণ্ঠে কহিলেন। 'পদে পদে খর্ব্ব হয়ে, পদে পদে অপমানিত হয়ে উপার্জ্জনশীলের প্রতাপের কাছে অসহায় বোধ করে অসংখ্য মেয়ে। নিশ্চিন্ত আরাম, নির্ভরযোগ্য পরিবার ছাড়তে ক'জনের সাহস হয়? অপমানের সঙ্গে তারা আপোষ করে' নেয়। তারা ভালো স্ত্রী, সুগৃহিনী হয়। কিন্তু বেয়াড়া প্রকৃতি যাদের, তারা আপোষ করতে জানেনা। তারা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহিণীদের কেউ বা চূর্ণ হয়ে যায়, কেউ বা সংস্কারের চাপে নিজেদের অসুখী করে' তোলে। কিন্তু আরেক জাতেরও মেয়ে আছে।—মিণ্টু!

না, না, এখানে এসো না। ভেতরে যাও, ভেতরে যাও...' আশঙ্কায়, উত্তেজনায় সুজাতা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শুইবার ঘরের দরজার একপাটি খুলিয়া মিণ্টু সবেমাত্র উঁকি দিয়াছিল ; অপরিচিত একজন লোককে মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত দেখিয়া তার কৌতূহলও কম হয় নাই। ভিতরে আসিবার আশায় সে কণ্ঠের হুইসিল বাজাইবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় মায়ের তীব্র অধৈর্য্য আদেশটা একটা তীরের মতো আসিয়া তার কানে প্রবেশ করিল। চকিতে তার প্রলম্বিত মাথাটা দরজার আড়ালে অন্তর্দ্ধান করিল।

'ছেলে? হুঁ! আমি খেয়ে ফেলতাম না। ও আমারও ছেলে। আইনের চোখে ওর ওপর আমার অধিকার ওর সেণ্টিমেণ্টাল মাস্টারনি মায়ের চাইতে কম নয়, বেশি।' চৌধুরি এদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন। 'ওকে দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে আনবার কি অধিকার আছে তোমার? বাপের পরিচয়, বাপের অন্য অসংখ্য সহায়তা থেকে বঞ্চিত করে তুমি ওর কত বড় শত্রুতা করছ, জানো? তুমি ওর সর্ব্বনাশ ছ...

'সর্ব্বনাশ থেকে ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি।'

'হুঁ, বাঁচাতে চেষ্টা করছ! বেশ। আমিও দেখে নেব। নিতান্ত শিশু ছিল বলেই আমার অধিকারের জন্য লড়ে দেখতে চেষ্টা করিনি। এবার বড় হয়েচে। ওকে আমার পদমর্য্যাদার উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ক্ষমতা কোনও মাস্টারনির নেই। যদি থাকেও, আমার ছেলের উপর আমার অধিকার সবচেয়ে বড়ো, কোনও 'সিল্লী' একগুঁয়ে মেয়ের বেয়াড়া স্বাতন্ত্র্যবোধের খামখেয়ালির জন্য আমার নিজের ছেলের ওপর অধিকার আমি ছাড়তে পারিনে।—কে ঐ ছোক্‌রাটা, যার সঙ্গে তুমি এসেছ? কে ওটা? তোমার কোনও আত্মীয় বলে তো ওকে

জানিনে। জবাব দাও। চুপ করে' থেকো না, জবাব দাও। হুঁ, জবাব নেই কিছু। স্বাধীনতা! হুঁ। কোথায় একে জোটালে? তরুণ, নিটোল যুবক,—তাজা টগ্‌বগে! জুটিয়েছ ভালো, তা স্বীকার করি…'

'বেয়ারা।'

'হুজুর, মেমসাব্‌।' বেয়ারা ঘরের একপাশ দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া খানা-কামরার দিকে যাইতেছিল, মণিবের আহ্বানে সাড়া দিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল।

'এ সাহেব এখন যাচ্ছেন। তুমি দরজাটা খুলে ধরো।'

'জী হুঁজুর।'

'হুঁ। বেশ। গুড্‌ নাইট্‌।' চৌধুরি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "কিন্তু প্রয়োজন হলে কোর্টে এই তারুণ্য-প্রীতির কথাটা জানাতেও আমি কসুর করব না, এ-কথাটা স্মরণ রেখো। ভাবচ, তুমিও সব জানাবে। কিচ্ছু এসে যায় না। পুরুষে মেয়েতে তফাৎ অনেক। গুড্‌ নাইট্‌, স্বাধীনাদেবী, গুড্‌ নাইট্‌।'

আঠারো

ইংরেজি ১৯৪৩ সালের এপ্রিল; বাংলার দুর্ভাগ্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ১৩৫০ সালের বৈশাখ মাস। মেদিনীপুরের ধ্বংসলীলার জের এখনও মিটে নাই; চতুর্দ্দিক হইতে এখনও সাহায্য প্রেরিত হইতেছে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে, বোমার হিড়িকে পলায়ন আরম্ভের এক বৎসর পরে, প্রথম কলিকাতায় জাপানী বোমা পড়িল; ক্ষতি বিশেষ কিছু হইল না; এবং বিস্ময়ের কথা এই যে, যাহারা বোমার আতঙ্কে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বেই

ছুটাছুটি করিয়া নিতান্ত পাগলের মতো আচরণ করিয়াছিল, তাহারা বোমা পড়িতে দেখিয়াও এইবার অবিচলিত হইয়া মজবুত রকম বসিয়া রহিল। গতবার মরিয়া হইয়া বিদেশে বিভূঁয়ে গিয়া অধিকাংশ পলায়িতই দুঃখ-দুর্দ্দশার চরম ভোগ করিয়া আসিয়াছে। কেহ ছেলেপিলে আত্মীয়স্বজন চিরদিনের জন্য হারাইয়া আসিয়াছে, কেহ মফঃস্বলের বিব্রত, অভাবিত অতিথির যোগ্য সমাদরে অসমর্থ, আত্মীয়-বন্ধুদের উপর আন্তরিক চটিয়াছে, কেহ বা বিদেশ ও অপরিচিত বাসিন্দাদের ঔদাসীন্যে, পথ-চলার এবং নতুন বাসা-বাঁধার অসুবিধার স্মৃতিতে, অথবা আর্থিক ক্ষতির মারের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া আছে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও ইহারা এস্থান ছাড়িয়া আর এক পা-ও নড়িবে না। শুধু কি তাই; কলিকাতায় অকস্মাৎ প্রায় অদৃশ্য হইতেই যেন কাতারে কাতারে লোক আমদানি হইতে আরম্ভ করিল। পথে-ঘাটে লোক গিস্‌গিস্ করিতে লাগিল। ভাড়াটিয়া-পরিত্যক্ত বাসাগুলি আবার নতুন নতুন লোকে ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-ভাড়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল; এইবার স্বাভাবিক হইতে শতকরা পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়া উঠিয়া বাড়ির মালিকদের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

ইহার পরও কয়বার জাপানী বোমারু শহরের উপর হানা দিল, কিন্তু কোনও আশ্চর্য্যজনক যুক্তির ইন্দ্রজালে কলিকাতার লোক-সংখ্যা বন্যার জলের মতো কূল ছাড়াইয়া ক্রমেই উর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিল।

কিছুকাল হইতেই দ্রব্যমূল্য কলিকাতার জনতার সঙ্গে পাল্লা লাগাইয়া ক্রমেই উঁচু দিকে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছিল। বাংলাদেশের নানা স্থান হইতে আর্থিক দুরবস্থার শোচনীয় কাহিনী অবিচ্ছিন্নভাবে স্বল্পায়তন সংবাদপত্রগুলির স্তম্ভে কিছুটা বা অযত্ন সহকারেই বাহির হইতে লাগিল। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, এবং

চিকিৎসাভাব বাংলাদেশে এমন কায়েমি ব্যাপার যে, পাঠকেরা বর্ত্তমান অভাবের তীব্রতা অনেকাংশেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না; নিতান্ত ঔদাসীন্য সহকারেই সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলির উপর দিয়া অসতর্ক চোখ বুলাইয়া গেল। ক্রমে কলিকাতার আয়ের পক্ষেও দ্রব্যমূল্য অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। চালের দর পাঁচ-ছয় মাস পূর্ব্বেই স্বাভাবিক দরের তিন গুণ হইয়া উঠিয়াছিল; সাধারণে আশা করিতেছিল, খন্দের সময় চালের দাম পড়িয়া আবার স্বাভাবিকের কাছে আসিবে। কিন্তু শীত আসিল, চলিয়া গেল। চালের দাম ঘুড়ির মতো একবার দশ-বারো টাকায় গোঁৎ খাইয়া দেখিতে দেখিতে হু-হু করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। দৈবদুর্ব্বিপাকে এ-বৎসর বাংলাদেশে সচরাচরের চাইতে কম ধান উৎপন্ন হইল। অথচ বাংলাদেশে যে-পরিমাণ চাল উৎপন্ন হয়, তাহাতেই বাংলার দাবি মেটে না। এই অবশিষ্ট অংশটা প্রধানত ব্রহ্মদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া আসিত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জাপানীদের হাতে ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া সরিয়া আসিয়াছেন; ব্রহ্মদেশ এখন শত্রুদের, সুতরাং সেখান হইতে চাল আসিল না। এদিকে সৈন্যদের জন্য ভারতবর্ষ হইতে মধ্যপ্রাচ্যে চাল রপ্তানি হইতেছে; অন্যান্য প্রদেশ হইতেও যথেষ্ট চাল বাংলার জন্য সংগ্রহ করা গেল না। ইহার উপর মনোনীত দালালদের মারফত বাংলা-সরকারের চাল-সংগ্রহের ব্যবস্থার ফলে এবং মুনাফাখোর আড়তদারদের চাল গোপন করিয়া ফেলার দরুণ বাজারে চালের সরবরাহ আশ্চর্য্যজনক ভাবে কমিয়া গেল।

বস্তুত, ব্যবসায়ী-মহলে সকল কিছু মজুদ করিয়া, সরবরাহ চাপিয়া দিয়া দ্রব্যমূল্য বাড়াইবার লোভ ব্যাপক হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। দু-পয়সার দাড়ি-কামানোর ব্লেড্ ছয় আনা হইয়া উঠিল। তবে প্রধানত চালের দুর্ভিক্ষেই দুর্দ্দশা সবচেয়ে বেশি হইল। গবর্ণমেণ্টের

চাল-সংগ্রহ, চাল-বণ্টন ও চালের দালাল-নির্ব্বাচন নীতি এবং চালের উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী কৃষি-বিভাগের অপ্রস্তুতিই সংবাদ-পত্রগুলিতে বেশি নিন্দিত হইতে লাগিল।

এইবার দেখিতে দেখিতে দূরদূরান্তের সুদূর অজ্ঞাত গ্রামাঞ্চল হইতে দলে দলে বুভুক্ষু স্ত্রী-পুরুষ বাংলা-দেশের রাজধানী কলিকাতা শহরে আবির্ভূত হইতে লাগিল। নিশ্চিত অনশন ও অবধারিত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা সরকারের চোখের সমুখে ছুটিয়া আসিল; সমৃদ্ধ নগরীর লক্ষ্মীমন্তদের সহানুভূতি ও সহায়তা লাভের আশায় ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া, খেত-খামার ত্যাগ করিয়া, আত্মীয়-পরিজন ছাড়িয়া ইহারা মরিয়া হইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। শীর্ণ রুগ্ন অসহায় গ্রাম্য স্ত্রী-পুরুষে কলিকাতার ফুটপাথ কালো হইয়া উঠিবার জোগাড় হইল। সরকার-নির্দ্ধারিত মূল্যে চাল-বিক্রয়ের যে কয়টি মুষ্টিমেয় দোকান তখন পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছিল, তাহার সমুখে দিনরাত্রিব্যাপী ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র জনতার অবিচ্ছিন্ন লাইন সৃষ্ট হইল। সারা রাত ফুটপাথের কোট্ আগলাইয়া তবেই পরের প্রভাতে চাল নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বে দোকানে পৌঁছানো সম্ভব। খোলা আকাশের তলায় রৌদ্র-বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া আতিথ্য-কৃপণ রাজধানীর উদার ফুটপাথে ইহারা বাসা বাঁধিল।

ইতিমধ্যে বাজারে বাজারে চালের দর হু-হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। বিহারে যখন বারো-চোদ্দ টাকা মণে চাল পাওয়া যাইতেছে, বাংলায় তখন প্রতি মণ চাল যাট-সত্তর টাকায় বিক্রয় হইতেছে। এই উন্মত্ত ঊর্দ্ধগতি মাত্রাহীন হইবার উপক্রম হইলে জনমতের চাপে গবর্ণমেণ্ট চালের ঊর্দ্ধতম দাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে সুরাহা কিছু হইল না; প্রকাশ্য বাজার হইতে দোকানের চাল কালোবাজারে চালান হইয়া গেল। মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে

অপরিহার্য্য মুখের গ্রাস মুনাফাখোরদের লাভের অঙ্ক মোটা করিবার জন্য অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গা-ঢাকা দিতে আরম্ভ করিল। সরবরাহ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না করিয়া দর বাঁধিয়া দিতে গেলে তাহা যে মুনাফাখোরদের কল্যাণে ব্যর্থ হইবে তাহা কাহারও কাছে আর অজ্ঞাত ছিল না, তবু গবর্ণমেণ্ট একবার দর বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। কিন্তু বহু অসৎ সরকারি কর্ম্মচারির সহায়তায় বা ঔদাসীন্যে বা অকর্ম্মণ্যতায় বহু মুনাফাখোর কালোবাজারে দিব্য নিঃসঙ্কোচে এবং নিরাপদে তস্করের ব্যবসা ফাঁপাইয়া তুলিল। হয় আগুনের দামে চাল কেন, নয়তো উপোস করিয়া মর। ব্যয় করিবার ক্ষমতা অনুসারে জনসাধারণ ইহার একটি বা অন্যটি বাছিয়া লইতে লাগিল।

বাংলাদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর পূরা দমে, পূরা দাপটে আরম্ভ হইয়া গেল।

শনিবার। সুপ্রকাশের ছুটি। সারাটা দুপুর সে পরম আলস্যভরে ক্যাম্বিসের ঈজিচেয়ারে শুইয়া রটেনস্টাইনের 'মেময়র্স' পড়িয়া কাটাইয়াছে। কিন্তু গোটা চারেকের সময় সে তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করিল। চায়ের পূর্ব্বেই সুজাতাদির ওখানে হাজির হইবার অভিলাষ, সুতরাং আর দেরি করা নয়।

লম্বা খদ্দরের পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়াইয়া, স্যাণ্ডেল ফটাফট্ করিতে করিতে সে ছাদের ঘর হইতে নিচে নামিয়া গেল। মহম্মদ আলী পার্ক বাঁয়ে রাখিয়া প্যারীচরণ সরকারের রাস্তা দিয়া সে কলেজ স্ট্রীট্ ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার ট্রাম আসিতেছে কিনা, হাওড়ার দিকে তাকাইয়া লক্ষ্য করিয়া লইয়া সে কাছাকাছি একটা মনোহারি দোকানে যাইয়া প্রবেশ করিল। মিনিট পাঁচদশ পরে আবার যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার বগলে

দু-তিনটা বাণ্ডিল; অসম্পূর্ণ আবরণের ফাঁক দিয়া কোনওটা হইতে কাপড়ের রঙিন পা, ঝুমঝুমির হাতল, কোনওটা হইতে বা চুষি-কাঠির রিং বা লজেঞ্জুষের বোতলের এক অংশ উঁকি মারিতেছে। অপর ফুটপাথ হইতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতা মায়ের নির্দ্দেশে একটা উলঙ্গ ছেলে আসিয়া অদ্ভুত দূরদৃষ্টির সঙ্গে সমুখে হাত পাতিয়া ছিল; সুপ্রকাশ খুচরো পয়সাগুলি সবই তার হাতে তুলিয়া দিয়া ট্রাম স্টপের দিকে আগাইয়া গেল।

সুজাতাদির একটা অভিযোগ এই যে, সুপ্রকাশ আমন্ত্রিত না হইলে আসে না। আত্মপক্ষ সমর্থনে সুপ্রকাশের প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সহস্র কর্ম্মের উল্লেখ এই অভিযোগ খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় নাই। আজ অনাহুত উপস্থিত হইয়া ইহার একটা সদুত্তর দেওয়া সম্ভব হইল মনে করিয়া সুপ্রকাশ বেশ একটা গর্ব্বিত পুলক অনুভব করিল। পা টিপিয়া টিপিয়া সে ড্রইং-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল; অভাবিতকে প্রকাশ করিবার মধ্যে একটা নাটকীয়তা আছে। ইহার আগাম স্বাদ সুপ্রকাশ যেন উপভোগ করিতে লাগিল।

'খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলাম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে—'

পর্দ্দার বাহির হইতেই সুমিতার কণ্ঠ শোনা গেল। সুপ্রকাশ আর অগ্রসর হইল না। শিশুর সঙ্গে মায়ের খেলার মধ্যে প্রবেশ করাটা অনধিকার হইবে কিনা, বিবেচনা করিতে লাগিল। কিন্তু পর্দ্দা এমন পর্য্যাপ্তভাবে টানা নহে যে, ভিতরের দৃশ্য অদৃশ্য রহিবে। ড্রইং-রুমের কড়ি-বর্গা হইতে দড়ি টাঙাইয়া বেতের দোল্‌না দোলানো। সেই দোল্‌নায় টুকটুকে লাল সালুর গদিতে, টার্কিশ টাউয়েলের চাদরে,

শাদা বালিশে ফুটফুটে শিশুটি শুইয়া শুইয়া বেশ আনন্দ সহকারে হাত-পা নাড়িতেছে এবং দুর্ব্বোধ্য ভাষায় মায়ের কবিতা আবৃত্তির এবং দোল্না-ঠেলার তারিফ করিতেছে। অপার পুলকানন্দে মায়ের মুখ উজ্জ্বল, চোখে অবর্ণনীয় মুগ্ধতার ভাষা। একটা অসীম শান্তি, ক্ষোভ-স্পর্শহীন একটা অসীম তৃপ্তি সুমিতার যেন রূপান্তর ঘটাইয়াছে।

ক্ষণকাল সুমিতা মুগ্ধস্নিগ্ধ চোখে ক্রীড়ারত শিশুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া দোল্না ঠেলিয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব হিসাবেই যেন বলিল ঃ

'মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে···'

'ভেতরে আসতে পারি? যা ছেলের আদর করা হচ্চে, অনধিকার প্রবেশে চটে না যাও।'

'ওঃ, সুপ্রকাশবাবু! আসুন, আসুন। চটব কেন, না রে সতুবুড়ো, চটব কেন, না?' দোল্নাটা শেষবারের জন্য ঠেলিয়া দিয়া সুমিতা সহাস্যে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

'দেখে ফেলেচি মায়ের আদর। এইবার এ-সম্বন্ধে লিখতে হলে নির্ভুল ভাবে লিখতে পারব।' দোল্নার কাছে আগাইয়া গিয়া সুপ্রকাশ কহিল। 'এই নাও, মহারাজ, উপঢৌকন এনেছি···'

'ও কি হচ্ছে। না না, এ ভালো নয়।' সুমিতা কহিল। 'এই তো ক'দিন হলো, এক গাদা পুতুল-বল-চুষি দিয়ে গেছেন। বেশি বেশি মামাগিরি ফলানো হচ্চে, না?'

'হচ্চেই তো।' সুপ্রকাশ কহিল। 'দিদি কোথায়? তিনি মা-ছেলেকে খেলা করবার অবকাশ দিয়ে সরে গেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই না, আরও কিছু।' সুমিতা সলাজ রক্তিম মুখে প্রতিবাদ করিল। 'সুনীলা এসে তাকে নিয়ে গেচে, তার মজুরের ছেলেদের ইস্কুলের প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউশনে। কি দস্যি মেয়ে বাবা, আমাকেও শেষে টানাটানি। সম্ভবত সে আমাকেও সম্ভ্রান্ত মা ভেবে বসে আছে।'

'এই জন্যই বুঝি যাও নি?'

'কি জানি। সম্ভবত তাই হবে।' সুমিতা সুপ্রকাশের দেখাদেখি বসিয়া কহিল। 'অভিনয় করবার জন্য চিরদিন লোভ ছিল: সে লোভের পরিণতিও কম শোচনীয় হয় নি; তবু জীবনে প্রতারণা করতে ইচ্ছে হয় না।—তা ছাড়া, যাব কি করে? এই যে আমাদের সতুবুড়ো শুয়ে আছেন দোল্‌নার ওপরে মায়ের পথ-আগলে। এতটুকু দুটো হাতে ওর কত জোর জানেন? আমার ইচ্ছে মতো চলবার-ফেরবার উপায় পর্য্যন্ত বন্ধ করে' দিয়েছে। বলুন তো, একে নিয়ে কি করি? আপনাদের নতুন পৃথিবীতে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, এর কোনও ব্যবস্থা করবেন না আপনারা?' সুমিতার কণ্ঠে হাল্কা উদ্বেগের সুর।

'নয় কেন, করবই তো', সহাস্যে সুপ্রকাশ কহিল। 'ছেলেমেয়েরা থাকবে রাষ্ট্রের রাজকীয় অতিথি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সকল শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষিত করে গঠন করে তোলবার ভার নেবে। এখন তোমাদের সমাজ শিশুর দায়িত্ব নেয় না, তবু পাংক্তেয়-অপাংক্তেয় চিহ্নিত করে; আগামী কালের রাষ্ট্র সমাজের সকল শিশুর ভার নেবে, তবু কৃত্রিম বিভেদের মাতব্বরি দাবি করবে না। রাষ্ট্রের সম্পদ ও শক্তি বড়-ছোট নির্ব্বিশেষে সকল স্তরের শিশুদের গড়ে তোলবার কাজে...'

'না না, সে হবে না, সে ভালো নয়,' সাতঙ্কে সুমিতা কহিল। 'আমার খোকাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে, আর আসতে দেবে না?'

'দেবে না কেন? কিন্তু সর্বক্ষণের জন্য নয়। মায়ের খোকা হয়ে থাকাই খোকার চরম সার্থকতা নয়', সুপ্রকাশ কহিল; 'যেসব ছেলেমেয়েরা আজকালকার কলেজ-ইস্কুলের বোর্ডিং-এ থেকে প্রবাসে পড়াশুনো করে, মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকে বলে তাকে কি সর্বনাশ বলা চলে? ছেলেমেয়ের মঙ্গলের জন্য যেটা আবশ্যক, সেটাই করণীয়। স্টেট্ যদি দেশের শিশুদের লালন ও শিক্ষণের ভার নেয়, তবে তা মাত্র এই উদ্দেশ্য নিয়েই নেবে। সব মা-বাবাই কি শিশুর পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত শিক্ষক, সবচেয়ে উপযুক্ত আদর্শ? কত অদ্ভুত সঙ্কীর্ণতা, কত বিচিত্র ক্ষ্যাপামি, কত শোচনীয় অসমর্থতা ছেলেপেলের শিক্ষার বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেমেয়েরা যদি উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে পড়তে পারে, উপযুক্ত বই পায়, উপযুক্ত রকম খেয়ে পরে খেলে আনন্দ করে নিজেদের গঠন করবার সুযোগ পায়, সেটা কি শিশুদের অধিকাংশের পক্ষেই সৌভাগ্যজনক নয়?'

'কিন্তু আমার ছেলে?' সুমিতা বক্তৃতায় প্রবুদ্ধ না হইয়া কহিল।

'সে তো তোমার রইলই। ছুটিতে তোমার কাছে এসে সে তোমার উপর স্নেহের দৌরাত্ম্য করে যাবে।—কিন্তু আমি চা খেয়ে আসিনি। আশা ছিল, এখানেই চা পাব, কিন্তু তার কোনও সম্ভাবনাই দেখচি না…'

'এক্ষুনি পাবেন', অপ্রতিভ সহাস্যমুখে সুমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। 'শুধু তর্ক করলে কি চা পাওয়া যায়? কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহুদূর, না রে, সতুবুড়ো? যান্, ওখানে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে ঠেলা দিন্। আমি চায়ের কথা বলে আসি…'

'তথাস্তু', উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুপ্রকাশ কহিল।

'আচ্ছা, চিনি সম্বন্ধে কি করা যায় বলুন তো? যা-তা দাম চাইবে, এর কিছু করা যাবে না?' চা ঢালিতে ঢালিতে সুমিতা কহিল।

'না, কিছু করা যাবে না।' নির্লিপ্তস্বরে সুপ্রকাশ জবাব দিল।

'এই নিন্, তবে আধ চামচ। মিষ্টি না হলে বয়ে গেল। কিছু করতে পারবেন না, তো ঐ যথেষ্ট। কিন্তু, সত্যি বলুন না, দাম এমন চড়ে উঠচে কেন?'

'সরবরাহ কম।'

'তা নাহয় আমাদেরও কম করে' দিক! দাম বাড়বে কেন?'

'ক্যাপিটালিস্টিক জগতের এই নিয়ম। জিনিষ কম থাকলে মুনাফা-খোরেরা দাম চড়িয়ে দিতে পারে; দ্রব্য-উৎপাদন মানুষের সুবিধার জন্য নয়, ব্যবসায়ীর লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে তোলবার জন্য। সাধারণভাবে সমাজের সর্বসাধারণের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য জিনিষ তৈয়ারি হয় না। শতকরা নব্বুই ভাগ লোক না-খেয়ে বা আধ-পেটা খেয়ে থাক, অবশিষ্ট দশ ভাগের আরাম বৃদ্ধি হলেই হলো!'

'তবে এখন উপায়?' তর্কজাল সম্পূর্ণ অনুধাবন না করিয়া সুমিতা কহিল।

'সরকারী নিয়ন্ত্রণ। হয় সম্পূর্ণ, নয় আংশিক।' সুপ্রকাশ চা তুলিয়া লইয়া কহিল। 'আংশিক হলে সেটা প্রাইস-কন্ট্রোল এবং র‍্যাশনিং; সম্পূর্ণ হলে সেটা সোশ্যালিজম্—সমাজতন্ত্র।'

'তাই কিছু একটা হোক। তবে বাঁচা যায়।' সুমিতা খাবারের প্লেটটা সুপ্রকাশের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল। 'অ্যাং-ব্যাং রামা-শ্যামা সবাই মজা পেয়ে গেচে। যে মুদি গলায় কাপড় দিয়ে হুজুর হুজুর করত, সে বেশ ভারিক্কি চালে বলছে,—পাঠিয়ে দেবেন সন্ধ্যার দিকে, দেখি দশ-পাঁচ সের কি দিতে পারি।—আজ্ঞে না, নুন দিতে পারব না। দিয়েচি যাকে দিয়েচি; সব কাজের কৈফিয়ৎ দেওয়া পোষাবে না। সুবিধে না হয় অন্য কারও ঠেঙেই এবার থেকে জিনিষপত্র নেবার

ব্যবস্থা করবেন ;—দেখচেন একবার আস্পর্দ্ধা ! অথচ গত পাঁচ বছর ধরে ওর দোকান থেকেই সব জিনিষপত্র কেনা হচ্চে···'

'যুদ্ধের কল্যাণে সবাই বড়লোক হচ্চে, বেচারির এমন একটা সঙ্গত অভিলাষে আর দোষ কি !' সুপ্রকাশ সকৌতুকে কহিল।

'ধোপা মোচড় দিয়ে দামটা ডবল করে নিয়েচে।' সুমিত্রা সপ্রতিবাদে কহিল। 'তার সঙ্গত অভিলাষে আমরা আপত্তি করতে সাহস করিনি। কিন্তু তাতেই যথেষ্ট নয়। শাড়ি হারাচ্চে, ব্লাউস হারাচ্চে, শেমিজ হারাচ্চে, কিছু বলবার জোটি নেই। খুসি-মাফিক যেদিন ইচ্চে কাপড় দিচ্চে নিচ্চে, কিছু আপত্তি করা চলবে না। বিনয় সৌজন্য সব যুদ্ধের গুলিতে মারা পড়েচে ধোপা, চাকর, গয়লা, গাড়োয়ান, ট্যাক্সিওয়ালা সব্বার একবার মেজাজ দেখুন না ! যেন সব নবাব খাঞ্জাখাঁর বংশধর ! এদের বড়ো করে' তোলবার জন্যই যদি আপনাদের সোশ্যালিজম হয়, তবে তার খুরে নমস্কার !'

'এদের বড়ো করে তোলা ভয়ের নয়, সুমিত্রা। এদের ছোট করে' রাখাই ভয়ের।' সুপ্রকাশ মিষ্টিটাকে প্লেটে নামাইয়া রাখিয়া কহিল। 'বড় দুঃখে এরাও মুনাফাখোরদের অনুকরণ করতে আরম্ভ করেচে ; সুযোগ বুঝে চাপ দিয়ে এরাও বেশি আদায় করতে চায়। কিন্তু এটা ক্যাপিটালিস্টিক সমাজে অবশ্যম্ভাবী। বেশি মুনাফা করতে পারাই এখানে সুখের, সম্ভ্রমের, বাঁচবার একমাত্র উপায়। সবার জন্য বাঁচবার তাৎপর্য্য আমরা ভুলে যেতে বসেচি ; স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের সুবিধার ব্যবস্থা করে' নিতে চাই। কিন্তু যাক্ গে, আজ একদিনে তোমার কাছে যতখানি সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করলাম, তা যে কোনও ধৈর্য্যবতী শ্রোত্রীর পক্ষেই ধৈর্য্যের পয়লা দরের সার্টিফিকেট। এইবার আমি চলি। আবার নির্ব্বিঘ্নে মা ও ছেলের অনন্তলীলা শুরু হোক্।' বলিয়া সুপ্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

'দিদির জন্য অপেক্ষা করবেন না?'

'দিদি সুনীলার পাল্লায় পড়েছে। তার গতিবিধি সম্পূর্ণ রকমই অনিশ্চিত। সুনীলা আমার চাইতে আরও গোঁড়া সংস্কারকামী, আরও উগ্র সোশ্যালিস্ট, সুতরাং তর্কের মাত্রাটা...'

'আপনার চাইতে অনেক কম।' সুমিতা বাধা দিয়া কহিল। 'সে কত চাপা মেয়ে, আপনি জানেন না। জানেন না কতটা সে উহ্য রাখতে পারে। কি অধিকার আছে, কি অধিকার আছে আপনার, শুনি, প্রত্যেককেই এমন করে' ঔদাসীন্য দিয়ে, দেমাকী বৈরাগ্য দিয়ে আঘাত করবার? আপনি কি মানুষ, না কি? কিসের আপনার এত গর্ব? নির্লিপ্ততার এত বড়াই কিসের?' উত্তেজনায় উচ্ছ্বাসে সুমিতার কণ্ঠস্বর চঞ্চল হইয়া উঠিল; রক্তের স্রোত এক মুহূর্তে তাহার সুগৌর মুখমণ্ডলে ঠেলিয়া ঝাঁপাইয়া আসিল।

'ব্যাপার কি? ঘটনার পারম্পর্য্যটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারছি, এমন গর্ব করতে পারি না।'

'কিছুই আপনি কোনও দিন উপলব্ধি করতে পারবেন সে ক্ষমতা আপনার নেই।' সুমিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল। 'দেমাকীবাবুর দেমাক-ভরা চোখে কি সাধারণ মানুষের ছোট সুখ-দুঃখের কথা ধরা পড়ে? সুনীলা আপনাকে ভালবাসে। এই ভালোবাসা উপেক্ষা করার কি অধিকার আছে আপনার?'

'আমাকে সবাই ভালবাসে।' গম্ভীরস্বরে সংযত-কণ্ঠে সুপ্রকাশ কহিল। 'যার বসুধৈব কুটুম্বকং, তাকে কে না ভালবাসে বল? কিন্তু এতে উচ্ছ্বাস করবার কিছু নেই।'

'দেমাক, দেমাক, দেমাক।' বলিয়া সুমিতা প্রায় টলিতে টলিতে দোলনার আছে আগাইয়া গেল।

উনিশ

'আবার ছুটি! বল কি? এবার আবার কোথায় রিলিফ্-এ ছুটবে?'

'নিজের দেশের কাছাকাছি।'

'তবে সত্যি যা ধরেছি, তাই: রিলিফ্!' মোহিতবাবু নিজের আবিষ্কারে যেন প্রায় গর্ববোধ করিলেন। 'এই ভরা-শ্রাবণে দেশে-গাঁয়ে গিয়ে মারা পড়বে যে! দুর্ভিক্ষের প্রবন্ধ লিখে লিখে এতদিন আমাকে ঝালাপালা করেছ, তাতেও কি যথেষ্ট হলো না? নিজে গিয়ে কি করবে শুনি? ওসব হাঙ্গামা-হুজ্জুতের কাজের জন্য তোমার চাইতে ঢের মজবুত লোক পাওয়া যাবে! তোমার যা করবার, তা তো যথেষ্ট করছ, ছোক্‌রা, আর কেন?'

'কি রকম আরামে গ্রামের বাজে লোকগুলি চট্‌পট্ করে মরে যাচ্ছে, দেখে আসতে কৌতূহল হচ্চে।' সুপ্রকাশ গম্ভীরভাবে কহিল।

'তা যাবে, যাও। দু হপ্তার ছুটি যখন পাওনা রয়েচে, তখন তোমাকে আর আটকায় কার সাধ্য।' মোহিতবাবু চশমার কাচ ঘষিতে ঘষিতে কহিলেন। 'কিন্তু দু হপ্তায় কার কতটা উপকার করতে পারবে শুনি? এসে আবার সেই ভ্যাংচানি সম্পাদকীয় ফাঁদবে তো। যত ছেলেমানুষি!'

'আজ্ঞে হোক ছেলেমানুষি।' সুপ্রকাশ চোখটা বাঁকা করিয়া একবার মোহিতবাবুর ভারিক্কি মুখখানা দেখিয়া লইল। 'কিন্তু নিজস্ব বিশেষ প্রতিনিধির বর্ণনার নিজস্ব দাম আছে। ন্যাশন্যাল ডেইলির পাঠকেরা নিজস্ব প্রতিনিধির চোখ দিয়ে দুর্দশা দেখতে পেলে বেশি তৃপ্ত হবে…'

'বটে ছোক্‌রা! লোভ দেখাচ্ছ!' মোহিতবাবু যেন উদ্দেশ্য টের পাইয়া কহিলেন। 'তা ফার্স্টহ্যাণ্ড বর্ণনার একটা নিজস্ব বিশেষ মূল্য সব সময়েই আছে; পাঠকেরা তার কদর বোঝে। কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি, ছোক্‌রা, কাগজ কিন্তু তোমাকে পাঠাচ্চে না; ফিরে এসে আবার যেন বিল্‌-টিল করে বসো না। যা তোমাদের আজকালকার মেজাজ।'

'দুর্ভিক্ষ সে মেজাজ ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।' বলিয়া স্থপ্রকাশ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল।

'আর শোন', স্থপ্রকাশ দরজার কাছাকাছি পৌঁছাইলে মোহিতবাবু শেষবার সতর্ক করিয়া দিবার জন্য কহিলেন, 'ঐ পনেরো দিনই। গিয়ে আবার ছুটি বাড়াবার জন্য চিঠি লিখে বসো না যেন। লোকের বড্ড টানাটানি। তা ছাড়া, তুমি অতদিন গাঁয়ে-জঙ্গলে থেকে কোনও একটা অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে বস, এ আমি চাইনে। শখ হয়েছে যাও, কিন্তু বেশি দিন নয়...'

নিজের কুঠরিতে ফিরিয়া গিয়া স্থপ্রকাশ চামড়ার ফোলিও-ব্যাগে কিছু কাগজপত্র ভরিয়া লইল। দেওয়ালের বড় ঘড়িটাতে নটা বাজিয়া সতেরো আঠারো মিনিট হইয়াছে; কাজ সারা হইয়াছে অনেকক্ষণ! পিছনের জানালাটা দিয়া ব্ল্যাক্‌-আউটের অমাবস্যাময় সহরটার একটা অস্পষ্ট ভৌতিক চেহারা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যাইবার পথে একবার রিলিফ্‌ কমিটির অফিসে খোঁজ করিয়া বন্দোবস্ত পাকা করিয়া বাড়ি ফিরিবে কিনা ভাবিতে লাগিল; কিন্তু পরদিন ভোরে যাওয়াই সিদ্ধান্ত করিল। কি করিয়া স্থপ্রকাশ মোহিতবাবুর মতো সুখী সাফল্যদীপ্ত লোকদের বুঝাইবে, গ্রামের বুভুক্ষু ব্যাধিক্লিষ্ট উপায়হীন মৃত্যুপথযাত্রী দুর্ভাগাদের কাছে গিয়া দাঁড়ানো তাহার পক্ষে বিলাস নহে, প্রয়োজন। মৃত্যুর এই মহামারী রোধ করিতে পারে, এমন

সাধ্য কোনও ব্যক্তির নাই ; এ সম্ভব শুধু রাষ্ট্রের পক্ষে। তবু নিজ হাতে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আসা, মুমূর্ষুর মুখে একটু জল তুলিয়া দেওয়া, বুভুক্ষুদের এক মুষ্টি চাল-বিতরণ করিতে পারা, আতঙ্কিত সরল গ্রাম্যলোকদের সাহস ও আশার বাণী শুনাইয়া আসা, এগুলিরও যত সামান্যই হোক্ কিছু সার্থকতা আছে। যে সকল আত্মত্যাগী, সেবা-পরায়ণ, নিঃস্বার্থ কর্ম্মী বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ-আর্ত্ত জনগণের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের মহৎ কর্ম্মের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করিতে পারা গৌরবজনক। যে সকল নগণ্য অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের ছবি খবরের কাগজে বাহির হয় না, সেখানকার দুর্গতেরা ফুটপাতের উপর জড়ো হইবার সুযোগ না পাইয়া সভ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না, নিঃশব্দে বিরূপ ভাগ্যকে মানিয়া লইয়া যাহারা দলে দলে মরিয়া পচিয়া থাকে, কাহাকে অভিসম্পাত করিতে হইবে জানেনা, সুপ্রকাশ একবার তাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতে চায়।

সিঁড়ির মুখে প্রুফ্-রীডার নকড়িবাবুর সঙ্গে দেখা। নিকেলের চশমাটা নাকের যথাস্থানে আট্‌কাইয়া তিনি মুখ উঁচু করিয়া নিচের ধাপে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

'স্যার, একটা কথা ছিল। কতক্ষণ ধরেই আসব আসব করচি, কিন্তু এটা-ওটা লেগেই আছে। নিজের কাজ করবার মুহূর্ত্তকাল সময় পাইনে।—আজ্ঞে, স্যার, মাগ্‌গি-ভাতাটা বাড়ানো হবে হবে শুনচি, কবে হবে একটু বলতে পারেন, স্যার? আর যে পারিনে, সপরিবারে শুকিয়ে মরবার জোগাড় হয়েচি···'

'তা তো বলতে পারি না, ন'কড়িবাবু।' সুপ্রকাশ দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল। 'শীগগিরই বাড়াবার কথা আছে কি?'

'শীগগির না হলে যে আর বাড়িয়ে লাভ নেই, স্যার।' নকড়িবাবু

কহিলেন। 'বাজারটা একবার লক্ষ্য করছেন তো, স্যার। পঞ্চাশ-ষাট টাকা চালের মণ, অন্য জিনিষপত্রের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কত মাইনে পাই, স্যার, একবার ভেবে দেখুন? কত মাইনে পাই! এ মাইনেয় কতটা চাল কেনা যায়? বলুন, স্যার, আপনিই বিবেচনা করে' বলুন? বাঁচতে হলে অন্তত চাল ফুটিয়ে নুন দিয়ে খেতে হবে তো? গায়ে একখানা বস্ত্র দিতে হবে তো? এর চেয়ে আর কি কম করা যায়, বলুন? আমাদের কি মেরে ফেলবে, উপোস করিয়ে মেরে ফেলবে?'

'চারদিকে চেয়ে আপনার প্রশ্নের কোনও আশ্বাসজনক উত্তর দিতে পারচি না…'

'মুদি চোর, গয়লা চোর, কাপড়ের দোকান চোর, মনোহারি দোকান চোর', নকড়িবাবু ক্রুদ্ধ করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'চারদিকে শুধু চোরের মেলা। চোরে চোরে সারা দেশটা ভরে' গেচে। যে পারচে সে-ই অপরকে ঠকাচ্চে। কি বলব স্যার, নিজের স্ত্রীকে আজ এক হপ্তা ধ'রে শস্তা চালের আশায় কণ্ট্রোলের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্চে! এ দুঃখ কাকে বলব আর কাকেই বা বোঝাব? শত হোক, গেরস্ত ঘরের মেয়ে। আজ তাকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হলো! তাও কোনও দিন ভাগ্যে চাল জোটে, কোনও দিন বা জোটে না। বলুন, কি বলবেন?'

'অফিস থেকে শস্তায় যে চাল দেওয়া হচ্চে, তাকি পাচ্ছেন না?'

'সে কতটুকু, স্যার! তার তো হিসেব মাপা আছে। আমাকে যে, স্যার, তার দ্বিগুণ মুখ পুষতে হয়, তার কি করি? আজ্ঞে, স্যার, যুদ্ধের কল্যাণে খবরের কাগজের কর্ত্তারাও কি কম লাভ করচেন। নিচে বসে প্রুফ-সংশোধন করি বটে, স্যার, কিন্তু কিছু কিছু খোঁজখবর তো আমরাও রাখি। কাগজের সাইজ্ আদ্দেক হয়েচে, অথচ দাম ধরা

হয়েচে ডবল। বিজ্ঞাপনের রেট্ পেল্লাই বেড়ে গেচে, আর গবর্নমেণ্টের হরেক রকম ডিপার্মেণ্ট থেকে বিজ্ঞাপন আসচে দিস্তায় দিস্তায়। এক গবর্মেণ্টের পয়সায়ই খবরের কাগজের তহবিল ফেঁপে ওঠবার জোগাড়। অথচ গত তিন-চার মাস ধরে শুনে আসচি, মাগ্‌গি-ভাতা বাড়িয়ে দেওয়া হবে, চালের বরাদ্দ বাড়িয়ে গরিব-গর্বা কর্মচারিদের বাঁচবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত তার দেখাটি নেই। জিজ্ঞেস করি, স্যার, আমরা না-খেয়ে মরে' গেলে তবে কি তার ব্যবস্থা করা হবে?'

'কিছু বলবার নেই, ন'কড়িবাবু।' সুপ্রকাশ বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সহজ করিতে চেষ্টা করিয়া কহিল। 'এই হচ্চে আমাদের ব্যবস্থা! উপরকার সবার যথেষ্ট হবার পর তবেই আপনাদের বাঁচবার প্রশ্ন ওঠে। আমি আজ যাই।' বলিয়া লজ্জিত, বিরত, অপ্রতিভ সুপ্রকাশ স্খলিতপদে সিঁড়ি দিয়া চোরের মতো পলায়ন করিল।

'ও কি করছ? না, না, ও খেতে নেই। অসুখ করবে।'

'তা করুক গে, বাবু। মইরে যাচ্চি যে, না-খেতি পেরে কোলের এই শিশুটা মইরে যাচ্ছে যে···'

প্রেতের মতো একটা শীর্ণ কঙ্কালসার স্ত্রীলোক ডাস্টবিনের মধ্য হইতে উচ্ছিষ্টের টুকরা বাহির করিয়া কিছু বা নিজের মুখে, কিছু বা নিজের কোলের শিশুটার মুখে গুঁজিয়া দিতেছিল, অপরের হস্তক্ষেপে অসন্তুষ্ট হইল।

'ও খেয়ো না। এই নাও পয়সা। ঐ দোকান থেকে মিষ্টি কিনে খাও গিয়ে। ওখানে দুধও বেচে। দুধ কিনে তোমার ছেলেটাকে খাইয়ে দাও, কেমন?'

'ভগমান তোমার ভালো কইরবে, বাবু।' বলিয়া স্ত্রীলোকটি হাত পাতিয়া পয়সাগুলি লইল। 'পরশু একটা গোরা-সায়েব একটা গোটা টাকা দিয়েছ্যালো। হাড়-হাবাতেরা কেড়ে নিলে। খেতে পাস্‌নে মড়ারা, মর্‌, তা আমার থিকে কেড়ে নেওয়া ক্যানে? আমার এই দুদের ছেলেটারে বাঁচাতি হবে না? বাঁচাবি তোরা?—একটুকুন দাঁড়িয়ে যাও, বাবু; ওরা তেইড়ে এলে এক্‌লা মেয়ে মানুষ, পারব ক্যানে?...'

'চল, আমি দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্চি।' বলিয়া সুপ্রকাশ গলিটা দিয়া খাবারের দোকানটার দিকে আগাইয়া গেল।

পূর্ব্ব হইতেই একটা মোটর লরি গলির এ-প্রান্তের একটা বন্ধ দরজার কাছে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল, অকস্মাৎ একটা লোক আসিয়া চারপাশে সন্ত্রস্তভাবে তাকাইয়া দেখিল এবং ড্রাইভারের আসনের কাছে আগাইয়া গিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিতে লাগিল। চালকের পাশে অন্ধকার ছায়ার মতো জন দুই তিন লোক গাড়িটার মতোই নিঃশব্দে বসিয়া ছিল, পলকে নিচে লাফাইয়া পড়িল।

'হুজুর, বিট্‌-এর পাহারাওয়ালা ব্যাটা এসে আবার উপস্থিত হবে না তো?' একটি ছায়া কহিল।

'ভয় পাচ্চ কেন হে, হরিহর।' আদেশ-কর্ত্তা কহিলেন, 'ব্যাটার পকেট কি আগে থাকতেই ভারি করে' দিয়ে আসিনি, মনে কর? অত কাঁচা লোক নই। কার পকেট আর ভারি করিনি, বলো?'

সম্মুখের রুদ্ধ দরজাটা যেন মন্ত্রে আলিবাবার দস্যু-আস্তানার ফটকের মতো খুলিয়া গেল। বাহিরের লোকগুলি ভিতরে প্রবেশ করিল। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিশ-পঁচিশটা বস্তা ভিতর হইতে লরির উপর আসিয়া জড়ো হইল। দরজার মুখটায় মিনিটখানেক কি সলা-পরামর্শ

হইল, পরক্ষণে পূর্ব্বের আরোহীরা সকলেই আসিয়া লরিতে আরোহণ করিল। নিঃশব্দ যন্ত্রটা এতক্ষণ পরে দৈত্যের মতো গর্জ্জন করিয়া উঠিল ; চক্ষের পলকে বস্তা-বোঝাই লরি অদৃশ্য হইয়া গেল।

'এমন করেই বাজারের চাল অদৃশ্য হয়।' সুপ্রকাশ ওদিকের থামের আড়াল হইতে অন্ধকারে লরির নম্বরটা পড়িতে ব্যর্থকাম হইয়া নিজ মনে কহিল।

'ও কি করছ!'

সুপ্রকাশ মেসের প্রায় কাছাকাছি পৌছাইয়া গিয়াছিল, এমন সময় অন্ধকার ফুটপাথে একটা লোককে অপর একটি শায়িত লোকের দেহের নানা স্থান থাব্‌লাইতে দেখিয়া প্রশ্ন করিল।

'এ ব্যাটা মরে গেছে বাবু।' প্রেতের মতো সেই লোকটা বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই জবাব দিল।

'তোমার আপনার লোক ?'

'উহুঁ। না। কোন্ ব্যাটা রাস্তার ভিখিরি।'

'তবে কি করছ তুমি ?'

'হাত্‌ড়ে দেখচি, ট্যাঁকে পয়সা-কড়ি আচে কিনা।' লোকটা বেপরোয়া স্বরে কহিল। 'পয়সা দিয়ে ও-ব্যাটা আর কি করবে, বাবু ; নিমতলার শ্মশানে মড়া স্তূপ করে' জমিয়ে রাখা হয়েচে, সেইখেনে গিয়ে এবার নিশ্চিন্দিতে গ্যাঁট হয়ে বসবে। পয়সা দিয়ে আর করবে কি। পাই কিছু তো কাজে লাগবে। জ্যান্ত মানুষেরই না-খেয়ে মরবার ডর, ও-শালার আর কি।' বলিয়া লোকটা হিহি করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

পকেটের অবশিষ্ট পয়সা এই মানুষ-প্রেতটার উদ্দেশে ছুঁড়িয়া দিয়া সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি মেসের দিকে ছুটিল।

দোতলার সিঁড়ির মুখে দারুণ হট্টগোল। মেসের প্রায় সকল বাসিন্দা আসিয়াই সেখানে জড়ো হইয়া কোলাহল ও উত্তেজনার যোগ দিয়াছে। এই ভিড়ের মধ্যে ক্রুদ্ধ রক্তচক্ষু শ্রীধরকে একাধিক লোকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চেঁচাইয়া শ্রীধর কহিতেছে, 'ছেড়ে দিন্, ছেড়ে দিন্ মশায়েরা। হারামজাদা শূয়োর বলে কিনা, এ সব্বাই করে। চাকরের আস্পর্দ্ধা! ছেড়ে দিন্, থাপ্পড়িয়ে ওর দাঁতকপাটি খুলে ফেলি।'

বীরেশ্বরবাবু নিরীহ মানুষ; মারামারি হাঁকাহাঁকিতে তার বিষম আতঙ্ক। তিনি অনুরোধের মৃদুস্বরে কহিলেন, 'ছেড়ে দিন, শ্রীধরবাবু, ছেড়ে দিন। যথেষ্ট মেরেছেন, যথেষ্ট ঠেঙিয়েচেন, আর কেন। ও তো ছোটলোক, কত ভদ্রলোকেই, বুঝলেন, শ্রীধরবাবু···'

শ্রীধর আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বীরেশ্বরবাবুকে কটুকথা বলিল, এবং অপরাধী চাকরের টুঁটি ছিঁড়িবার জন্য জেদ করিতে লাগিল।

কাছেই বিমলকে পাইয়া সুপ্রকাশ প্রশ্ন করিল, 'ব্যাপার কি, বিমল?'

বিমল কহিল, 'এ আর কিছু নয়, সুপ্রকাশদা, এটা স্রেফ ক্যাপিটালিস্‌ম্! পুঁজির সুবিধা নিয়ে ক্যাপিটালিস্ট কি করতে পারে, তারই প্রকৃষ্ট···'

'ক্যাপিটালিস্ট!' সবিস্ময়ে সুপ্রকাশ কহিল। 'কিন্তু চাকরকে নিয়ে কেন?'

'একই কথা। পুঁজির সুবিধা নিয়ে ক্যাপিটালিস্ট যা করে' থাকে, এ-ও স্রেফ তাই করেচে। একস্‌প্লয়টেশন। অসহায়তার সুযোগ নিয়ে একস্‌প্লয়টেশন! এ-ব্যাটা অকৃত্রিম ক্যাপিটালিস্ট।'

ইহাতেও সুপ্রকাশ প্রবুদ্ধ হইল না দেখিয়া বিমল হতাশ হইল, এবং

হতাশ হইয়া মাত্র-সোশ্যালিস্টদের মনে মনে ধিক্কার দিয়া সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া শুনাইল।

মেসের এই চাকরটা রাস্তার একটা ভিখারিণী মেয়েকে ওবেলার বাড়তি খাওয়ার দেওয়ার সুযোগে মন্দ প্রস্তাব করে। শ্রীধর সেই সময়েই মেসে ফিরিতেছিল, আতঙ্কিত গৃহস্থ মেয়েটার তীব্র রাগান্বিত প্রতিবাদ শুনিয়া ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করে, এবং চাকরটার উপর বাঘের মতো ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ঘাড় খাবলাইয়া ধরিয়া সহুঙ্কারে তাহাকে হিড়হিড় করিয়া উপরে টানিয়া লইয়া আসে, এবং মেস্‌-বাসীরা জড়ো হইবার পূর্ব্বেই তাহার গণ্ডে ও পৃষ্ঠে যথোচিত পুরস্কার বর্ষণ করে। কিন্তু ক্রুদ্ধ, প্রতিবাদপরায়ণ ভৃত্য-পুঙ্গব ইহাতে না-দমিয়া বেশ জোরের সঙ্গে বলে, 'এ ফাজলামি সব্বাই করে।' ইহারই ফলে শ্রীধর ক্ষেপিয়া গিয়াছে। এখন ওর হাত হইতে লোকটাকে বাঁচানোই একটা মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'শ্রীধর, ওপরে চল্‌।' সুপ্রকাশ আগাইয়া গিয়া কহিল।

'আলবৎ নয়। হারামজাদাকে শেষ না করে' এখান থেকে আমি এক পা...বলে কিনা, সব্বাই করে! এমন একটা রাস্কেলকে প্রশ্রয় দিতে হবে? খাওয়ার দেওয়ার সুযোগে যে এমন করে' নিজের দুষ্ট বুদ্ধির...'

'কোনও কথা নয়, ওপরে আয়!'

'ওপরে আয়, ওপরে আয়!' ভেংচাইয়া শ্রীধর কহিল, 'ব্যস্‌, চলো। ওপরেই যাচ্ছি। খুব বেঁচে গেল আজকের মতো ব্যাটা হারামজাদা বজ্জাত: ছুঁচো বদ্‌মাস কোথাকার!...'

নিজ নিজ বিছানায় দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল: ঠাকুর ভাতের থালা দুটো পাশের জীর্ণ টেবিলটার উপর রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। কেহ উঠিল না।

সুপ্রকাশ জানে, এ-সমস্যা সারা শহরে এবং মফঃস্বলে ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। অসহায় মানুষের ক্ষুধার সুযোগ লইয়া বহু মতলববাজ লোক নিজ নিজ অভিসন্ধি হাসিল করিয়া লইতেছে। মফঃস্বল হইতে, গ্রামাঞ্চল হইতে বহু অসহায় দুর্ভাগিনী স্বেচ্ছায় বা প্রবঞ্চিত হইয়া, অথবা আত্মীয়স্বজনের ব্যবস্থায় শহরে আসিতেছে দেহকে পণ্যে পরিণত করিয়া বাঁচিতে। দেশের সমুখে এটা একটা গুরুতর সমস্যা। ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা; ক্ষুধা মিটাইবার পক্ষে অপরিহার্য্য ন্যূনতম আহার্য্যের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে এ-সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে!

নিচের রাস্তা হইতে অন্ধকার ভেদ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত স্ত্রীলোকের কাতরধ্বনি, শিশুর আর্ত্ত-চিৎকার মুমূর্ষুর অভিসম্পাতের মতো কানে আসিতেছে। 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও।' 'মরে গেল মা, দুধের বাছাটা মরে' গেল।' 'মরে গেলাম, ক্ষিদেয় মরে গেলাম, বাবু। খেতে দাও, বাবু, একটু যা হোক্ খেতে দাও···'

'বুঝলি, সুপ্রকাশ, তুই খেয়ে নে।' সহসা শ্রীধর ক্রস্-ওয়ার্ড ধাঁধার পাতা খুলিয়া কহিল, 'আমার মোটেই ক্ষিদে নেই। বাইরে থেকে পেট ভরে খেয়ে এসেচি। আজ আর খাব না। খেলে হজম হবে না। আমার থালাটা বরঞ্চ···'

'আমারও তো তাই। একটুও ক্ষিধে নেই।' সুপ্রকাশ কহিল।

'তবে ডাক চাকরটাকে।' কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই শ্রীধর কহিল, 'দিয়ে আসুক গিয়ে ভিখিরি বেটিদের। শুধু শুধু আর ফেলা যায় কেন···'

'শুনচিস, সুপ্রকাশ। ঘুমোলি নাকি?'

'বল্। বেশি লম্বা না হয়।'

'লম্বা না হয়!' ভেংচাইয়া ও-বিছানা হইতে শ্রীধর কহিল। 'যেন সব সময়েই আমি লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে যাচ্চি। আমার আর সময়ের দাম নেই। দেখ, ভালো হবে না বলচি নাক-ডাকাতে আরম্ভ করলে।—কথাটা এই, তোদের সোশ্যালিস্‌ম্ হলে এর,—মানে, এ ধরণের দুর্ভিক্ষের, আর লুটের, সুরাহা হবে মনে করিস? তা যদি হয়, তো হোক্, হোক তোদের সমাজতন্ত্র। যেমন জোচ্চোর মুনাফাখোর, তেমনি ঘুষখোর সরকারি কর্ম্মচারি জুটেচে। মেরে ফেলবে, সারাটা দেশকে উপোস করিয়ে…'

'মুস্কিল হলো', সুপ্রকাশ ঘুমবিজড়িত কণ্ঠে কহিল, 'কাল থেকেই যে সমাজতন্ত্র প্রবর্ত্তন করা যাবে, তার উপায় নেই। আগামী সঙ্কটের আগে তাকে কাজে লাগাতে পারা যাবে বলে তো মনে হয় না। তার কিছু তাড়াতাড়ি নেই। ঘুমোতে দে।'

'তোদের সমাজতন্ত্রে মুনাফার জন্য জিনিষ তৈয়ারি না হয়ে নাহয় মানুষের প্রয়োজনে লাগবার জন্যই তৈয়ারি হলো।' না-দমিয়া শ্রীধর কহিল, 'মুনাফাখোরেরা জব্দ হবে, দেশের খাদ্য বা অন্য সামগ্রীর সরবরাহ চেপে লাভ বাড়ানো বা মানুষ মারার কাজ চলবে না। বড়ো সম্পত্তি আর বড়ো কারখানা সবই হবে দেশের সরকারি সম্পত্তি। কিন্তু বাছা, এইখেনেই যে আরেক মুস্কিল…'

'কি মুস্কিল?' সুপ্রকাশ এইবার স্পষ্টতর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

'বর্ত্তমানের সরকারি চাকরোদের দেখে খুব ভরসা হচ্চে কি? সমাজতন্ত্রের সরকারি কর্ম্মচারিরা যদি এদেরও এক কাঠি ওপরে ওঠে, তখন উপায়? সব কিছু মুঠোয় পুরে' যদি তলে তলে ব্ল্যাক-মার্কেট খুলে বসে?…'

'সে কর্ম্মচারিদের উপর যে কর্ত্তৃত্ব করবে, সে আমাদের নিজেদের দেশী গবর্ণমেণ্ট, গণভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত। বিদেশী গবর্ণমেণ্ট নিজের

চাকরদের ওপরও জোর খাটাতে ভয় পায়' সুপ্রকাশ শুইয়া শুইয়া, কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে, কহিল। 'আর তা ছাড়া, সরকারি কর্ম্মচারিরাই বেশি মুনাফা করে' করবে কি? ব্যবসা করতে পারবে না, সুদে টাকা খাটাতে পারবে না, টাকা ব্যয় করে ইচ্ছে মতো বিলাস-দ্রব্য কিনতে পারবে না। নোটের উপর শুয়ে থাকা এমন কিছু আরামদায়ক নয় যে, ঘুষ-খাওয়ার বিপদের মধ্যে কেউ মাথা গলাতে যাবে। আর যদি জবরদস্তির কথা বলো, তা-ও আটকান অসম্ভব নয়। এর প্রধান অস্ত্র সমালোচনার অধিকার আর স্বাধীন বিচার-বিভাগ। এত বড় অধিকার, এমন শক্তিশালী প্রতিকার আর কিছু নেই, এতে সকল দুর্বৃত্ত দমন হয়। আমাদের আদর্শ-স্টেটে এর পূর্ণ ব্যবস্থা থাকবে···'

'সুপ্রকাশ?'

'কি মুস্কিল, আজ কি ঘুমোতে দিবিনা।'

'আমি যাচ্চি তোর সঙ্গে পদ্মাপারে।'

'বেশ।' জড়িত অপ্রবুদ্ধ কণ্ঠে সুপ্রকাশ কহিল।

'বেশ! বেশ কি?' শ্রীধরের স্বর ক্রুদ্ধ। 'এত বড় একটা প্রস্তাব করলাম, অনায়াসে একটা মাত্র শব্দে তার জবাব দেওয়া হলো—বেশ! কত বড় একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার করচি, কিছু মালুম হচ্চে? পশ্চিম-বঙ্গের লোক; পদ্মা আর প্যাসিফিক্ ওশেন এ-দুয়ের মধ্যে কোনও তফাৎ করি নে। অথচ এর জবাব হ'লো—বেশ!'

'চুপ করবি?' সুপ্রকাশ অতিষ্ঠ হইয়া কহিল।

'আলবৎ নয়। চুপ করবি!' শ্রীধর প্রতিবাদের সঙ্গে কহিল। 'কেন চুপ করব? স্যাক্রিফাইসের যে মূল্য বোঝে না, তার কাছে শ্রীধর কখনও চুপ করে থাকে না।—এই উঠে পড়লাম। জান্‌লার ধারে গিয়ে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাঙাল-ভাষা মক্স করচি, যাতে

পদ্মাপারে গিয়ে অসুবিধের না পড়তে হয়। মন দিয়ে শোন্। ভুল হলে চট্‌পট্ বলে দিবি, চট্‌পট্ শুদ্ধ করে' নেব। শেষে এই নিয়ে হাসাহাসি করলে কিছুতেই আমি ক্ষমা করব না, এই বলে দিলুম…'

সুপ্রকাশ এপাশ ফিরিয়া কহিল, 'বকর-বকর করিস না।'

কুড়ি

ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমা হইতে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে সুখপাড়া গ্রামটি। সুখপাড়া নাম হইলেও বর্ত্তমানে সুখের কিছুই অবশিষ্ট নাই; এ অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের মতো ইহাও দুর্ভিক্ষে উজাড় হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বহু লোক বাঁচিবার আশায় শহরে পালাইয়াছে; বহু লোক না খাইয়া, রোগে ভুগিয়া ইতিমধ্যেই আরও দূরের রাজ্যে চিরপ্রস্থান করিয়াছে।

কিছুকাল হয় আশেপাশের কয়েকটা গ্রামে সরকারি সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু সুখপাড়া সেই তালিকায় পড়ে নাই। এই জন্য রিলিফ্-কমিটির সাহায্যকেন্দ্রটি এখানেই খোলা হইয়াছে। এটি সংগঠনের ভার লইয়া সুপ্রকাশ প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে চারিদিকে খাল-ঘেরা ছেঁচা-বাঁশের এই ঘরটায় আস্তানা পাতিয়াছে। নারায়ণগঞ্জের শাখা-অফিস হইতে একটি যুবক-কর্ম্মী আসিয়া কয়দিন সাহায্য করিয়া আবার নারায়ণগঞ্জে ফিরিয়া গিয়াছে।

গ্রামের দুঃস্থদের প্রধানত চাল বিতরণ করাই এই সাহায্য-কেন্দ্রের কাজ। সঙ্গে লবণ ও সরিষার তেল জোগাইবারও সামান্য বন্দোবস্ত আছে; এমন কি, মুন্সিগঞ্জের এক ধনী ব্যবসায়ীর বদান্যতায় মহকুমা-হাকিমের মারফৎ কিছু ধুতি এবং শাড়িও বিতরণের জন্য পাওয়া গিয়াছে।

বেলা প্রায় বারোটা বাজিয়াছে। শ্রীধর ডিঙিতে চালের বস্তা উঠাইয়া ভোর সাতটারই বিতরণের জন্য বাহির হইয়াছিল। সকলের পক্ষে সাহায্যকেন্দ্র হইতে চাল লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের অভাবে অনেক দুঃস্থ স্ত্রীলোক বাড়ির বাহির হইতে পারে না; মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেকে চাল ভিক্ষা করিয়া লওয়ার চাইতে উপবাস শ্রেয় মনে করে। সুতরাং ইহাদের কাছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য পৌঁছাইয়া দিতে হয়।

কাজটা শ্রীধরের চমৎকার লাগিয়াছে। প্রধানত বাঙ্গাল-দেশে বেড়াইয়া যাইবার জন্যই সে সুপ্রকাশের সঙ্গ লইয়াছিল। এখানে পৌঁছিয়া বিক্রমপুরের বর্ষার রূপ তাহার চমৎকার লাগিয়া গেল। জল, জল, একটা অখণ্ড সমুদ্রের মতো দৃশ্যমান সব কিছুই বর্ষার জলে ডুবিয়া গিয়াছে; খালে জল, মাঠে জল, বাড়ির উঠানে পর্য্যন্ত জল দাঁড়াইবার জোগাড়। বাড়িগুলি এই অগভীর সমুদ্রের দ্বীপের মতো অত্যন্ত রহস্যময় ভাবে বিরাজ করিতেছে। এই দ্বীপগুলিতেই ডিঙির সহায়তায় শ্রীধরকে পৌঁছাইতে হয়।

ইতিমধ্যেই সে গ্রামের ইতর-ভদ্র হরেক রকম লোকের সঙ্গে জমাইয়া বসিয়াছে। তাহার হাস্যকর বাঙাল-কথা শুনিয়া তাহারা যত না হাসে তত আকৃষ্ট বোধ করে। পশ্চিম-বঙ্গের লোক আসিয়া তাহাদের ভাষা বলিবার চেষ্টা করিবে, বাঁচিবার খাদ্য ও হাস্য পরিহাস বিতরণ করিয়া যাইবে, বুভুক্ষু, অবজ্ঞাত, মৃত্যুছায়াভীত গ্রামবাসীদের কাছে ইহার চাইতে বেশি আশ্বাসজনক আর কিছু নাই। তবে সাহায্যটা শ্রীধর একটু বেহিসেবীর মতো বিতরণ করিয়া আসে, এই যা। বরাদ্দের কোনও ধারই সে ধারে না, সুপ্রকাশের সতর্কতার উপদেশ সত্ত্বেও তিন দিনের চাল দুদিনেই শেষ করে।

সুপ্রকাশ উঠিয়া একবার বারান্দায় আসিল। আকাশে ভরা-শ্রাবণের

মেঘ ; খালটা অদূরে মোড় লইয়া বর্ষা-সবুজ জঙ্গল-ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। ঘন জঙ্গলের সবুজ মাথার উপর কোথাও ক্বচিৎ দু-একটা ইটের দালানের চূড়া চোখে পড়ে। পিছনের বড় পুকুরটা পাশের মাঠের সঙ্গে এক হইয়া মিলাইয়া গেছে ; বস্তুত. খাল আর মাঠে তফাৎ করিবার আর কিছু নাই। অন্তহীন জল ও নির্জ্জন জঙ্গলে পরিবৃত হইয়া সাহায্যকেন্দ্রের ঘরটি একটা আলাদা জগতের মতো মনে হয় ; অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ইহা গ্রামের লোকালয়ের ঠিক মধ্যস্থলেই অবস্থিত।

খালের দিকে কিছুক্ষণ উৎসুক চোখে চাহিয়া থাকিয়া সুপ্রকাশ ঘরে ফিরিয়া গেল। ভোর বেলাটা সাহায্যকেন্দ্রের অঙ্গন লোকজনে পূর্ণ থাকে। তারপর বেলা বাড়িলে গ্রামের অন্যান্য নির্জ্জীব বাড়ি-ঘরের মতোই ইহাও নিঃশব্দ নিঃসঙ্গ হইয়া ওঠে। নৈঃশব্দ্যের একমাত্র বক্তা হয় শ্রীধর। তবে সে একাই একশো, এই যা ভরসা।

'সেলাম বাবু।'

সুপ্রকাশ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল দরজার কাছে জন কয়েক লোক।

'এস। কিন্তু এত বেলায় কেন?' ইহারা সকলেই সুপ্রকাশের পরিচিত। মাঝে মাঝে ইহারা চাল লইতে আসে। কিন্তু প্রত্যহ নহে।

'কর্ত্তা, হাটে যাইতেছি। এই ফলটা বাবুগো লাইগ্যা রাইখা গ্যালাম।' বলিয়া কালু মণ্ডল মস্ত বড় একটা পাকা পেঁপে কেরোসিন কাঠের টেবিলটার উপর রাখিল।

'বেশ। কিন্তু এর দাম তোমাকে নিতে হবে, কালু।' সুপ্রকাশ বৃহৎ সুপক্ক ফলটার দিকে চাহিয়া কহিল।

'ছি ছি, কর্ত্তা। এমুন কথা কইয়েন না : এর লাইগ্যা দাম নিলে জাহান্নমে যাইতে অইবনা, কি কও জাউলার-পো?

জেলের পুত্র উদ্ধব কহিল, 'হুজুর, বড় দুর্দ্দিনে আইলেন। নাইলে দুই-চাইরটা রুই-কাৎলা মাছ কি আর উদ্ধব-জাউলা বাবুগো খাওয়াইতে পারত না। জাউলার পো, আইজ কিনা কয় আটি কলমি শাক লইয়া হাটে চলছি। দুই আটি রাইখ্যা গেলাম হুজুর। ভাল্ লাগলে খাইয়েন…'

'হুজুর, সুতার বাজারটা কি আর পড়ব না?' অবশিষ্ট ব্যক্তিটি উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করিল।

'কোনও বাজারই পড়বে বলে ভরসা দিতে পারব না, নীলকান্ত', সুপ্রকাশ নীলকান্ত জোলার দিকে চাহিয়া কহিল। 'মিলের সুতোর ওপর ভরসা করো না। পার তো, নিজেদের চরকায় কিছু কিছু সুতা কেটে নাও।'

'হুজুর, চাউলের এই দুর্ভিক্ষটা হইল ক্যান্? এইর কারণটা কি? যুদ্ধের গোলাগুলি বানাইতে চাউল লাগে নাকি?' নীলকান্ত পুনরায় প্রশ্ন করিল।

'হুজুর, কন্ দেখি কারণটা?' কালু মণ্ডল সামনের বেঞ্চিটায় বসিয়া কহিল।

'অনেক কারণ আছে। সব গোলমেলে কারণ, সব-কিছু খুব স্পষ্ট নয়', সুপ্রকাশ ব্যাখ্যার ভূমিকা স্বরূপ বলিল। 'বাংলাদেশে আমরা যত চাল জন্মাই, তাতে বাংলাদেশের সারা বছরের চাহিদা মেটে না। এই বক্রি অংশটা প্রধানত বর্ম্মা থেকে চালান আসত। এবার বর্ম্মা থেকে চাল আসতে পারে নাই, ওটা এখন ইংরেজের হাত-ছাড়া। এদিকে গত বছর মেদিনীপুরে যে বন্যা হয়, তার ফলে প্রায় নয়দশ লক্ষ বিঘা জমির চাল নষ্ট হয়; জমি পতিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে সাধারণত যত চাল হয়, এবার চাল তার চেয়ে কম উৎপন্ন হয়েছে, অথচ সৈন্যদের জন্য ভারতবর্ষের বাইরে

নানা জায়গায় চাল পাঠান হয়েছে; তা ছাড়া দেশেও কিছু কিছু চাল মজুদ হচ্চে। বাংলা-সরকারও হাতের পাঁচ হিসাবে চাল মজুদ করছেন, বিপদের দিনে সাহায্য হবে বলে। এই সব নানা কারণে বাজারে চালের কমতি পড়েচে। আর এই সুযোগে যত লোভী মজুতদার আর মুনাফাখোর মহাজন চাল চেপে রেখে দাম ফাঁপিয়ে তুলেছে। দেশের লোক মেরে তারা লাভের মাত্রা বাড়াবে। এই সব নানা রকম কারণ।—কিন্তু দেখ, আমাকে কক্ষনো হুজুর বলবে না। আমি হুজুর নই, হুজুর হতে চাইনা।—আমি তোমাদের লোক, তোমাদের বন্ধু, ইচ্ছে হলে আমাকে বাবু বলতে পার, কিন্তু হুজুর কখনও নয়। যদি পার, কাউকেই হুজুর বলো না। তোমরা স্বাধীন ভাবে খেটে খাও, হুজুর বলবে কেন?'

'দাদাবাবু কইলে রাগ করবেন?' উদ্ধব দ্বিধার সঙ্গে প্রশ্ন করিল। 'দাদাবাবু কমুনে এইবার থন্। কিন্তু, হুজুর, দাদাবাবু, জাপানীরা কি পদ্মা তক্ পৌছাইছে? গাও-গ্রামে আইয়া পৌছাইব না তো? কিষ্ট-জাউলা কইল, দীঘিরপাড় থন্ শুইনা আইছে, লোজঙ্গের ইষ্টিশনে জাপানীরা নাকি ঘাঁটি বান্ধছে।'

'ওসব একদম বাজে কথা। ওতে কান দিয়োনা।' সুপ্রকাশ কহিল। 'জাপানীরা মোটে বাংলাদেশের মধ্যেই ঢোকেনি। কাছা-কাছিও তারা কোথাও নেই।'

'তবে, দাদাবাবু, চৌকিদাররা আইয়া আমাগো নাও ক্রোক্ কইরা লইয়া গেল কোন্ কথায়? বলে, জাপানীরা আইয়া আমাগো নৌকা লইয়া যুদ্ধ চালাইব। দিয়া দাও হকল নৌকা।—তবে এই কন্ কি? জাপানীরা কাছাকাছিও নাই। ঠিক জানেন তো, দাদাবাবু?'

'জানি, উদ্ধব। ঠিক জানি।' সুপ্রকাশ গম্ভীর হইয়া কহিল।

'তবে একবার কাণ্ডটা গ্যাখছেন। জুলুমটা দেখছেন একবার!'

বিস্মিত ক্রুদ্ধ উদ্ধব আহত-স্বরে কহিয়া উঠিল। 'কই জাপানীরা, আর আমাগো হক্কল নৌকা ক্রোক কইরা উপাস করাইয়া মারণের জোগাড় করচে। কন্, আপনেই কন্, ডিঙি না অইলে মাছ ধরতে যাই কি লইয়া? পায়ে হাইটা জলের উপুরে চলন যায়? কাণ্ড দেখ! আমরা ভাবি, কি না কি? কন্ কি আপনে?'

'তুমি বুঝবে না, উদ্ধব।' ক্লিষ্টস্বরে সুপ্রকাশ কহিল। 'একে বলে পোড়ামাটির নীতি! নামটি ঠিক হয়নি। তোমাদের অঞ্চলে এর নাম পোড়া-কপালের নীতি হলেই মানানসই হতো। কিন্তু কালু মণ্ডল, তোমার ক্ষেতে তো চার-পাঁচশো মণ ধান হয় বলে শুনেচি। তুমি এমন ফতুর হলে কি করে?'

'আর কইয়েন না' দাদাবাবু। লোভের আক্কেল-সেলামি দিতে আছি, আর কি', কালু গামছা দিয়া দাড়ি-আকীর্ণ গলাটা রগড়াইয়া লইয়া কহিল। 'শ দুই মোণ চাউল তো আমার ঘরেও আছিল, হুজুর। শুনলাম, ব্যাপারীরা আইছে; পাঁচ টাকার চাউল দশটাকায় খরিদ করতাছে। বড় আনন্দ হইল; বিশ-পচিশ মোণ বেইচা দিলাম। কিন্তু বাজারে নানা কথাবার্ত্তা শুনলাম। ব্যাপারীরা যে-সে না, খোদ সরকারের লোক: যুদ্ধের লাইগা চাউল কিনতে আইছে। চাপ, চাপ, চাপ। পরথমে তারা আর গরজ দেখাইল না। দেও ভাল নাইলে না, আর এক কড়িও দাম তুলুম না! আমরাও কম চালাক না। চুপ মাইরা বইয়া রইলাম। যাইবা কোন্হানে? দাম চড়ল মোণ প্রতি দুইটাকা তিনটাকা। দিলাম শ মোণ বিক্রী কইরা? সেই ব্যাপারীরা তো গেল, আইল আরেক দল। আমাগো তখন মনে ডর বান্ধছে। ব্যাপারটা কি রে? আগুনের দামে চাউল কিনা লইয়া যায়; কিছু মতলব আছে নাকি? খাওনের চাউলটা রাখন লাগব। কইলাম, না মশায়রা, বেচুম না। তুরায়,

তুয়ায়, দর চড়ায়। শ্যাষে একদিন চৌকিদাররে লইয়া আইয়া কইল, চাউল বেচনই লাগব। ঘরে চাউল মজুত রাখন বে-আইনী। দাম চাও, বেশি দাম দিতাছি, বেইচা দাও; নাইলে হাজতে চল। সত্য মিথ্যা জানিনা, কাম কি হাঙ্গামায়। দাম দেওনের চায় তিনগুণ। টাকা থাকলে এই গঞ্জে না হউক অন্য গঞ্জের থন্ চাউল কিনা খাইতেই পারুম। দিলাম সব বিক্রী কইরা…’

‘তোমাদের ঠকিয়ে নিয়েচে। নিজেদের খাওয়ার চাল সম্বন্ধে অমন কোনও আদেশ ছিল না, অমন কোনও আইনই ছিল না।’ সুপ্রকাশ এই অজ্ঞ সরল গ্রাম্য লোকদের উপর প্রবঞ্চনার এই পাশবিকতায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। ‘কিন্তু এবার বাঁচবে কি করে, মণ্ডলের পো?’

‘আইজ্ঞা, মাঠ! একমাত্র ভরসা ঐ মাঠ।’ কালু সুদূর মাঠের দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল। ‘মাঠে মাঠে আউস-ধান বড় হইয়া উঠ্চে। আল্লার দোয়ায় যদি ঘরে তুলতে পারি, তবেই বাচুম। নাইলে আর রক্ষা নাই, কোনও রক্ষা নাই। আইজ্ঞা, অখন আমাগো সকল আশা-ভরসা ঐ ধান-ক্ষ্যাত। যাইবেন হুজুর, একবার দেখতে? হাওরের কাছে মাঠ ভইরা গেছে আউস-ধানের শীষে। কন্ তো হাটের থন্ ফিরনের পথে বিকালে একবার ডিঙিতে লইয়া গিয়া ঘুরাইয়া লইয়া আসুম…’

‘যাব, কালু। তুমি এসো।’

বেলা একটা দেড়টার সময় শ্রীধর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে উচ্ছ্বসিত মুখ লইয়া ফিরিয়া আসিল। কার সাধ্য তার উচ্ছ্বাসের স্রোতে বাধা দেয়।

‘এবার আর কোনও সন্দেহ নেই। চন্দ্রসূর্য্যের মতো অকাট্য সত্য!’ শ্রীধর চালের শূন্য বস্তা দুইটা ঘরের একদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া

কহিল। 'এতে যদি এবারও সন্দেহ করিস, শুনে রাখ, সুপ্রকাশ, কিছুতেই আমি ক্ষমা করব না, কিছুতেই না। সহানুভূতির যদি একটু অভাব লক্ষ্য করি, তবেই…'

'প্রকৃত প্রেম নয়তো?' সুপ্রকাশ খাতায় হিসাবের অঙ্ক বসাইতে বসাইতে না চাহিয়াই কহিল।

'আলবৎ প্রকৃত প্রেম।' শ্রীধর আন্তরিকতার সমস্ত জোর ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিল। 'নির্ঘাৎ প্রকৃত প্রেম। এতে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নেই। ভবিতব্যের বিধান, শেষে বাঙাল-দেশে এসেই প্রেমে পড়ে গেলাম। ভারি চমৎকার মেয়ে বাঙালদেশের। এমন মেয়ের সন্ধান পাওয়া জন্মজন্মান্তরের…'

'চান করতে যা।'

'না, যাব না। নির্ঘাৎ যাব না। একশোবার যাব না।' শ্রীধর চটিয়া কহিল। 'আগ্রহ নেই, কৌতূহল নেই, বন্ধুর প্রতি সহানুভূতি নেই, ঠাকুরমার মতো উপদেশ দিয়ে বললেন, চান করতে যা। আগে প্রত্যেকটি কথা, প্রতিটি উক্তি আমার শুনবি, তবে স্নানে যাব। নইলে এই রইলুম এইখানে বসে সারা দিনের জন্য', বলিয়া জানালার পাশের টুলটায় সজোরে বসিয়া পড়িল।

'ব্যাপারটা কি? সুপ্রকাশ রাগান্বিত শ্রীধরের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়া আপোষের চেষ্টায় প্রশ্ন করিল।

'আমার বাপের ভাগ্যি জিজ্ঞাসা করেছ। ব্যাপারটা সংক্ষেপে যাকে বলে, প্রেম। প্রথম দর্শনেই প্রেম।' শ্রীধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল। 'পুকুর-ঘাট থেকে মেটে কলসী ভরে জল নিয়ে বাড়ি ফিরছে। কালও হেসেছিল, আজও হেসেছে। বললুম, হাস্তেছ ক্যান্? আমি কি হাসনের মতো? হিহি করে কি বললে জানিস? বললে, পিঠের ছালাটা, হি হি হি…তা কাঁধে বস্তা নিয়ে চলেছি, তো হয়েছে কি?

সঙ্গে সঙ্গে গেলাম বাড়িতে। বললুম, এই নাও পাঁচ সের চাল। দু সেরের বেশি দেওয়ার হুকুম নেই। তা কুছ্ পরোয়া নেই। তার বুড়ি মার মুখে রীতিমত হাসি ফুটে উঠল। বুড়ো বাপ্,—লোকটা পেন্সন-পাওয়া সাব্-পোস্টমাস্টার—বললে, অত কেন, অত কেন। আমাগো ঘরে কিছু চাউল তো আছেই, আছে না পারুলের মা? পারুল! একবার নামটা শোন্। সাতভাই চম্পার বোন পারুল! বললুম, থাকলই বা, রেখে দিন কাজে লাগবে। পারুলের শাড়িটাও বড় ছিঁড়ে গেছে দেখছি। আমাদের কাছে শাড়িও দুচারখানা আছে—বিকেলে এসে দিয়ে যাব'খন।'

'যারা খুব দুঃস্থ শাড়িগুলি তাদের জন্যই। প্রেমের উপহার হিসাবে ওগুলি ব্যবহার হয়, সম্ভবত দাতার উদ্দেশ্য সে রকম ছিল না।' সুপ্রকাশ হিসাব লিখিতে লিখিতেই বলিল।

'দেখ, সুপ্রকাশ, রাগাস্ না বলচি। এবার কিন্তু ভয়ানক রেগে উঠব। দুঃস্থ! জানিস কি দুঃস্থের? ছোটলোক, চাষা ডোম কুমোর জেলে জোলা ছাড়া কি কেউ দুঃস্থ হ'তে পারে না? ভারি বিবেকী হয়েচিস! নিতান্ত দুঃস্থ না হলে সারা জীবন বাইরে বাইরে কাটিয়ে কেউ গাঁয়ে এসে বাসা বাঁধে? সাব্ পোস্টমাস্টারের মাইনে কত হয়? তার পেন্সেন কত, একবার ভেবে দেখেচিস? কটাকা চালের মণ? ভদ্রলোকের ভদ্রতার খরচ কত? যত বড় বড় বোল-চাল! বলে কিনা, শাড়ি শুধু দুঃস্থদের দেওয়া হয়!'

'দুঃস্থ হলে নিশ্চয়ই দেওয়া কর্ত্তব্য।' ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সুপ্রকাশ কহিল। 'কিন্তু প্রেমের উপঢৌকন হিসাবে নয়।'

'সে আমি বুঝব। তুই ফোঁপর-দালালি করিস না।' শ্রীধর মাথায় তেল দিতে দিতে কহিল। 'বাংলাদেশের নব্বুই ভাগ মেয়ে-পুরুষ যখন দুঃস্থ হয়ে গেচে, তখন,—এই দিকে তাকিয়ে জবাব দে,—প্রেম,

মানে প্রকৃত প্রেম, দুঃস্থ ছাড়া আর কার সঙ্গে করা যাবে? দুঃস্থ ছাড়া আর কাকে উপহার দেওয়া যাবে শুনি? দে দেখি চাবিটা, একবার খুঁজে দেখি। ভদ্রগোছের পাড়ওয়ালা শাড়ি একটাও পাওয়া যায় তো রক্ষা; ব্যাটারা বেছে বেছে যত রদ্দি মাল খয়রাত করে' লোক-মারা মুনাফার পাপের প্রায়শ্চিত্তির করতে চায়। একবার বুদ্ধি দেখ না, ভগবানকে পর্য্যন্ত ঠকাবার ইচ্ছে…'

জল, জল, অন্তহীন জল দিগন্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সুদূর গ্রাম-রেখা মসিরেখার মতো মনে হয়। খোলা বিস্তৃত নিচু জমিতে বর্ষার জল দাঁড়াইয়া বহুক্রোশব্যাপী এই হাওরের সৃষ্টি হইয়াছে। সন্ধ্যার আরক্ত আকাশের রঙ পড়িয়াছে জলে। সোনা-মাখান জল কাটিয়া ডিঙিটা অর্দ্ধ-নিমজ্জিত পাট ও ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

'আল্লার দোয়া মাঠে মাঠে ছড়াইয়া আছে, দাদাবাবু।' কালু মণ্ডল লগি মারিতে মারিতে পুলকিত-সুখে অন্তহীন শস্যক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া কহিল। 'একবার চায়্যা দেখেন,, কত বড় হইয়া উঠচে ধানের চারা! কাঁচা শীষ কেমুন দানা বান্ধছে, একবার চায়্যা দেখেন…'

'জীবনের দুঃখ তো এই কালু', মুগ্ধ হইয়া শস্যসমাচ্ছন্ন জলমগ্ন মাঠের দিকে চাহিয়া সুপ্রকাশ কহিল। 'প্রকৃতি অযাচিত দাক্ষিণ্যের সঙ্গে শস্য আর সম্পদ ঢেলে দেয়; মানুষের লোভে সে-সম্পদ বেশির ভাগের কাছে পৌঁছাতে পারে না।—না না, কালু, ধানের গায়ের উপর গিয়ে পড়োনা; ওর একটি নষ্ট হলেও চলবে না। বাঁচার জন্য এর প্রত্যেকটি ধান…'

'ডর নাই, দাদাবাবু। এইতে নষ্ট হয় না। জলে একটু ডুব দিয়া আবার খাড়া হইয়া দাঁড়ায়।'

'চল, এগিয়ে চল! এর ভাল নাম হলো আশু-ধান্য। তাড়াতাড়ি ফসল ফলে, তাই এই নাম।' সুপ্রকাশ সাগ্রহে চারদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 'কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, এ-ধানও যেন যথেষ্ট তাড়াতাড়ি উঠতে পারচে না। বড় আস্তে জন্মাচে। আর দেরি হলে বাংলাদেশের লোক না-খেয়ে মরে যাবে...'

একুশ

নারায়ণগঞ্জের টান্‌-বাজারের রিলিফ-কমিটির শাখা অফিস হইতে সুপ্রকাশ যখন বাহির হইয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইবার আর দেরি নাই। আজ ভোরবেলায়ই সে আসিয়াছে, শেষ-রাতের ইস্টিমারে মুন্সিগঞ্জ ফিরিবে! ছুটির আর দিন-চারেক মাত্র অবশিষ্ট আছে; সময়-মত যাহাতে নতুন কর্ম্মী পাঠান হয় এবং চালের বরাদ্দ যাহাতে কিছু বাড়ান যায়, হিসাব বুঝাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পর্কিত ব্যবস্থাও কিছু করা গেছে; এজন্যই স্বয়ং আসিয়াছিল। মনের অগোচরে হয়তো নারায়ণগঞ্জের জন্য কিছু দুর্ব্বলতাও আছে। বিশেষ অর্থে, নারায়ণ-গঞ্জকেই সে বাড়ি বলিতে পারে; তার বাবা এখানে আছেন, ভায়েরা এখানে আছে। শৈশবের অজস্র স্মৃতি এই মহকুমা-শহরের সঙ্গে জড়াইয়া আছে।

হাঁটিতে হাঁটিতে রেলি-ব্রাদার্সের পাটের গুদামগুলি পিছনে ফেলিয়া শীতললক্ষ্যা নদীর পারের রেলিং-এর বেড়া-দেওয়া রাস্তাটা দিয়া সে ধীরে ধীরে স্টেশনে উপস্থিত হইল। চা-বিস্কুটের স্টল্‌গুলির চারপাশে তখনও ভিড় লাগিয়া আছে। এই ভিড়ের মধ্য দিয়া অলস-ভাবে হাঁটিয়া সে নদীর উপরকার স্টিমার-জেটিতে আসিয়া পৌঁছাইল। এটা ছিল তার এখানকার বেড়াইবার সবচেয়ে প্রিয় স্থান। স্টিমার ও

স্টিম-লঞ্চের চঞ্চল যাতায়াত, নৌকার নিরুদ্দেশ রাজ্যের জন্য পাড়ি-দেওয়া, মাঝিদের হাঁক-ডাক, পাটাতনের উপর নমাজ-পড়া, রান্না ও নদীজলের মিলিত গন্ধ তাহাকে একটা অপূর্ব্ব স্বাদে পুলকিত করিত। আজ নদীর বুকে বাষ্পযান এবং নৌ-যান উভয়েরই সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, তবু শীতললক্ষ্যার বাতাস ও ঢেউয়ের মাদকতা কমিবার নহে। ছেলেবেলার মতোই চুপ করিয়া সে নদী ও পরপারের গুদামগুলির দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া উঠিল; নিষ্প্রদীপের কল্যাণে ওপার আর চোখে পড়িতেছে না। অন্ধকারে নদীর তরঙ্গায়িত জল সুদূর কোন্ দীপশিখার স্পর্শ পাইয়া মাঝে মাঝে ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে। নদীর বুকে কোনও নৌকা নাই; খেয়া-নৌকাটা অনেকক্ষণ ছাড়িয়া গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই। পারের নৌকাগুলির মধ্য হইতে দুচারটা প্রদীপ মিট্‌মিট্ করিতেছে!

সুপ্রকাশ উঠিয়া পড়িল। স্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া ওভার-ব্রীজ পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িল এবং উত্তর দিক ধরিয়া অগ্রসর হইল। কি বিস্ময়কর মানুষের মন! ইহার দাবির মতো এত তীব্র, এত জরুরি আর কিছু নাই। যে বাড়ি হইতে অবাধ্যতার অপরাধে একদিন তাহাকে এক রকম বিদায় লইতে হইয়াছে, একটা দুর্নিরীক্ষ্য আকর্ষণে সেই বাড়িটা তাহাকে প্রায় জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। কালীর বাজারের মধ্য দিয়া সে চাসাড়ার দিকে বহু পরিচিত দৃশ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল। পিছনে পড়িয়া রহিল উকিল-পাড়া, আম্‌লা-পাড়া, পাল-পাড়া; কালীর বাজার হইতে উত্তরে মোড় লইয়া ঢাকা অভিমুখে যে পিচের রাস্তাটা গিয়াছে, তাহা ধরিয়া সুপ্রকাশ হাঁটিয়া চলিল।

রামকৃষ্ণমিশন রোডের পশ্চিম প্রান্তের কাছাকাছি পৌঁছাইয়াই বাড়িটা চোখে পড়িল। পশ্চিম দিকে পুকুর; তার পরে দোতলা

দালান। দালানের সমুখে, রাস্তার প্রায় উপরেই আটচালা বৈঠকখানা ঘর। চোরের মত সুপ্রকাশ তাহার কাছাকাছি আগাইয়া আসিল।

ঐ তো তকেয়ায় ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে বাবা প্রথামত নথি দেখিতেছেন। ফরাসের অন্যদিকে মুকুন্দ-মুহুরী তেমনি করিয়া বসিয়া আজ্ঞা-পালনের অপেক্ষা করিতেছে। বেঞ্চগুলিতে এবং ভাঙা চেয়ারগুলিতে নানা রকম লোকজন।

অদ্ভুত, অদ্ভুত। সব যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। মায়ের স্মৃতি যেন ঠেলিয়া আসিয়া চোখ দুইটা ঝাপ্‌সা করিয়া তুলিবার উপক্রম করিল। দুইটা বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন প্রকৃতির হুকুমে মা এবং সুপ্রকাশ কাহারও এ-বাড়িতে থাকিবার অধিকার রহিল না।

অম্বিকাবাবু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। এমন সংসারী-লোক কম দেখা যায়। শোকে অভিভূত হইয়া কাঁদিয়া ভাসাইতে ভাসাইতে রাস্তার জেলের কাছে মাছের দাম জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ইহার বিসদৃশতা তার চোখে পড়ে না। লোকের হক্‌-পয়সা একটিও ঠকাইবেন না; কিন্তু একটি পয়সা দান করিতে বলিলে চোখে অন্ধকার দেখেন। কাহারও উপকার করিতে পারিলে খুসি হন, অথচ নিজের সামান্য ক্ষতি করিয়াও অপরকে সাহায্য করা তাহার কল্পনাতীত। অনায়াসেই অপরকে রূঢ় কথা বলিতে পারেন, তবে অপরে তাহার প্রতি রূঢ় আচরণ করিলেও দুঃখিত হন না। ছেঁড়া খাটো প্যাণ্ট, তালি-দেওয়া আলপাকার কোট, জীর্ণ বিবর্ণ জুতো পরিয়া কাছারিতে যান, পয়সার অভাবে বা পয়সা বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে নয়, ইহার চাইতে ভালো সাজ নিষ্প্রয়োজন মনে করেন বলিয়া।

রাস্তার পাশের গাছটার কাছে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ সুপ্রকাশ বৈঠকখানার দৃশ্যের দিকে চাহিয়া রহিল। চেহারার দিক দিয়া বড় বেশি বদলায় নাই, তবে একটু যেন রোগা হইয়াছে, গোঁফ্‌টা যেন

কেমন তামাটে দেখাইতেছে। কিন্তু এখান হইতে বর্ণ-বিচার করা সম্ভব নয়—সুপ্রকাশ আপন মনে বলিল। কেমন যেন মায়া ধরিয়া যাইতেছে, এমন দুর্ব্বল হইয়া উঠিয়াছে মনটা!

আগাইয়া যাইবে কি? বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া বুড়ো ভদ্রলোকের পা ছুঁইয়া বলবে কি, 'অপরাধ হয়েছিল, ক্ষমা কর।' কিন্তু অপরাধটা কি? ক্ষমা কেন? বাধ্যতাটাই মানুষের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য নয়; নিজের সত্তাকে নিপীড়িত করা নিজের কাছে সবচেয়ে বড় অকর্ত্তব্য। সর্ব্বক্ষেত্রেই বিনয় অবশ্য-পালনীয়; তাহা সুপ্রকাশ লঙ্ঘন করে নাই। নিজের ব্যক্তিত্ব, অভিরুচি ও আদর্শের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া বশ্যতার বিধান ভাঙিতে হইয়াছে; কিন্তু বশ্যতাটাই সবচেয়ে গৌরবজনক বৃত্তি নহে। কি হইবে আগাইয়া গিয়া? যাহা সে অধর্ম্ম মনে করে না, পিতার জন্য ব্যক্তিগত আকর্ষণে তাহাকেই কি সে অধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিবে?

যাইবে কি? দীর্ঘকাল পরে নিজেদের বাড়িতে ঢুকিয়া পলাতক ছেলে বলিবে কি, 'বাবা, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।' বাহিরটা যত কঠিনই মনে হউক, ভিতরটা বৃদ্ধের তত মজবুত নয়। মনে মনে নিশ্চয়ই সে কষ্ট পাইতেছে; অথচ নিজের জবরদস্তিটা বুঝিবার তাঁর ক্ষমতা নাই।

'আজ থাক্।' বলিয়া সহসা সুপ্রকাশ পশ্চাৎ ফিরিল, এবং ওদিকে আর একবারও ফিরিয়া না চাহিয়া স্টিমার-স্টেশনের উদ্দেশে রামকৃষ্ণমিশন রোড দিয়া সরাসরি পূব দিকে দ্রুত হাঁটিয়া চলিল।

'এই যে সুপ্রকাশবাবু। কাল বিকেল থেকে আপনার বন্ধুর

খুব জ্বর। ডাক্তার দেখে গেচে। সম্ভবত ম্যালেরিয়া। অথচ মুস্কিল হয়েচে, এ-তল্লাটে এক গ্রেণ কুইনিন পাবারও জো নেই।'

সুখ-পাড়ার সাহায্যকেন্দ্রের বাড়ির ঘাটে নৌকাটা সবেমাত্র ভিড়িয়াছে, এখনও নৌকার কেরায়া মিটাইয়া দেওয়া হয় নাই। পিছন হইতে শ্রীধরের জ্বরের এই সংবাদ পাওয়া গেল।

এদিক ফিরিয়া সুপ্রকাশ একজন অপরিচিত প্রৌঢ় বয়সের ঠাণ্ডা-প্রকৃতির ভদ্রলোকের উদ্বিগ্ন মুখটা দেখিতে পাইল। সুপ্রকাশের জন্য তিনি যে ব্যস্ত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহা বেশ বুঝা যায়।

'জ্বর! কত জ্বর! এখন কেমন আছে?' উদ্বিগ্ন-স্বরে সুপ্রকাশ প্রশ্ন করিল।

'বেশিই মনে হচ্চে। আপনি ঘরে যান্। আমার স্ত্রী আছেন ওখানে। কাল থেকে উনিই শ্রীধরবাবুর শুশ্রূষা করচেন। বড় ভালো ছেলে। গাঁয়ে এসে শহরের ছেলে কি বিপদে পড়লেন।'

'আপনি কি কাছেই থাকেন?'

'হ্যাঁ, ঐ তো খালটার মোড়ের সামান্য উত্তরে। রোজই শ্রীধরবাবু আমার ওখানে যান্, গল্পগুজব করেন, আমার স্ত্রীকে মাসিমা মাসিমা বলে ডাকেন। বড় আমুদে লোক। কাল গিয়ে বল্লেন, বড় মাথা ব্যথা করচে। বললাম, আসুন দেখি, নাড়ীটা দেখি। সারা জন্ম ডাক-টিকেটের সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওষুধও ছড়িয়েছি। নাড়ী দেখেই টের পেলাম, জ্বর বেশ জোরেই এসেচে। নিজের ওষুধের ওপর ভরসা না করে গ্রামের বিষ্টু-ডাক্তারকেই ডেকে আনলাম...'

'ওঃ, আপনিই বুঝি পোস্ট-মাস্টারবাবু। শ্রীধরের কাছে শুনেচি আপনার কথা'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আপনি ঘরে যান। আপনাকে দেখে তবেই আমি বাইরে এসেচি। বাড়ি গিয়ে আমি পারুলের হাতে শ্রীধরবাবুর পথ্যি

পাঠিয়ে দিচ্চি। বেলা বাজে এগারটা, আবার পথ্যি না করালে নয়। যাক্, আমার মাথার বোঝা নেমে গেল। আপনি এসেচেন, এইবার শ্রীধরবাবুও ভরসা পাবেন। আপনাকে সাহায্য করবার জন্য আমরা তো রইলামই।' বলিয়া ভদ্রলোক দ্রুত এ-সময়ে এ-অঞ্চলের একমাত্র বাহন ছোট ডিঙিটার দিকে অগ্রসর হইলেন।

উদ্বিগ্নমুখে সুপ্রকাশ অফিস-ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

দুদিনেও জ্বর থামিল না। কোনও প্রকারেই ডাক্তারখানা হইতে এক গ্রেণ কুইনিন পাওয়া গেল না। অথচ কুইনিন ছাড়া ইহার আর কোনও ওষুধ নাই! ডাক্তার কহিলেন, 'আরে মশায়, কুইনিনের অভাবে গ্রামকে গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে যাচ্ছে, আর আপনি খুঁজছেন কুইনিন।' বীরেশ্বরবাবুর কুইনিন মজুতের প্রস্তাবটা সুপ্রকাশের অকস্মাৎ মনে পড়িল। কুইনিন এতটা দুষ্প্রাপ্য হইবার কারণ সুপ্রকাশকে বীরেশ্বরবাবু ইতিপূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং শ্রীধরকে লইয়া অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিবার সিদ্ধান্ত করিয়া সে নৌকা ভাড়া করিল। মুন্সিগঞ্জ পর্য্যন্ত নৌকায় পৌছাইতে হয়।

'তার মানে? কিছুতেই নয়, আলবৎ নয়।' জ্বরের ঘোরে রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া শ্রীধর কহিল। 'এখান থেকে এক-পা নড়ব না, বলে দিচ্চি। জ্বর হয়েচে তো বয়ে গেল। এখানে যে স্বর্গের সন্ধান পেয়েচি, তার কি? এ জ্বর কিছু নয়, এটা স্রেফ্ প্রেম-জ্বর। প্রেমের তপ্ততা…'

'যথেষ্ট পাগলামি হয়েচে। চুপ কর এবার।' সুপ্রকাশ কহিল।

'বললেই হলো, চুপ কর। যা বলবি, মুখ বুজে তাই করব, কেমন? আমার কোনও দায়িত্ব নেই? কথার কিছু মূল্য নেই?—

শোন তবে, শোন। মন দিয়ে শোন। ওদের কথা দিয়ে দিয়েচি, পারুলকে আমি বিয়ে করব। আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার, বিয়ে করব। একেবারে পাকা কথা দিয়েচি, ভদ্রলোকের এক কথা। আর বলিস কিনা, কলকাতায় চল। কেন, কেন শুনি? কোন্ দুঃখে কলকাতায় যাব? কেউ কারুর জন্য ভেবে দেখে সেই লক্ষ্মীছাড়া শহরে? কেউ কাকে একটা মিষ্টি কথা বলে, কেউ কাকে ভালবাসে? রয়ে গেলাম আমি এইখেনে, ও-মুখো আর হাচ্চি না। পারুলকে বিয়ে করে…'

'ওরে গর্দ্দভ, বিয়ে করতে হলে আগে বাঁচা দরকার।' সুপ্রকাশ স্যুটকেস গুছাইতে গুছাইতে কহিল। 'কলকাতায় চল, চোরাবাজারের কুইনিন গিলে আগে ভাল হ, তারপর যত ইচ্ছে, স্বর্গে ফিরে আসতে পারবি। রেল-কোম্পানীর 'ভ্রমণ কমাও' উপদেশ না মানলেই হলো।'

'গোল্লায় যাও।' ও-পাশ ফিরিয়া শুইয়া শ্রীধর হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল।

পরদিন প্রভাতে তাহারা কলিকাতা রওনা হইয়া আসিল।

বাইশ

রাত প্রায় সাড়ে নয়টা। সুপ্রকাশ সবেমাত্র আফিস হইতে ফিরিয়াছে। নিচের চায়ের দোকানের একটা ছোক্রা আসিয়া জানাইল, তাহার টেলিফোন আসিয়াছে।

সুপ্রকাশদের মেস্-এ টেলিফোন নাই, কিন্তু মেসের দালানের নিচতলার চায়ের দোকানের পাবলিক টেলিফোনটা মেসের বাসিন্দারা প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করে। সুপ্রকাশকে এখান হইতে এত বেশি টেলিফোন করিতে হয় যে, বাহির হইতে কেহ ডাকিলে দোকানের ছোক্‌রারা সর্ব্বদাই তাহাকে ডাকিয়া দেয়।

'হ্যালো, কে? সুজাতাদি? কি খবর?' রিসিভারটা কানে চাপিয়া সুপ্রকাশ কহিল। 'ডিপ্‌থেরিয়া! কার? সুমিতার ছেলের? বলেন কি? আমি এক্ষুনি আসচি; ডাক্তার আসার আগেই পৌঁছে যাবো।...'

টেলিফোন ছাড়িয়া দিয়া সুপ্রকাশ দ্রুত উপরে উঠিয়া গেল। স্যাণ্ডালটা ছাড়িয়া কাব্‌লি-জুতাটা পায়ে পরিল এবং মণিব্যাগটা পকেটে ফেলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। দোতলার সিঁড়ির মুখে বামুনের অন্ন-সরবরাহের অগ্রদূত হিসাবে চাকরটা জলের গেলাস লইয়া উপরে উঠিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া এক মিনিট থামিয়া সুপ্রকাশ কহিল, 'শ্রীধরবাবু এলে খেয়ে নিতে বলিস্, আমার জন্য যেন বসে না থাকে। আমি কখন ফিরতে পারি ঠিক নেই। বুঝলি?' এবং উহা বুঝা না বুঝার অপেক্ষা না করিয়া সশব্দে নিচে নামিয়া গেল।

কৃষ্ণপক্ষের ব্ল্যাক্‌-আউটের রাত; এক হাত দূরের জিনিষও নজরে পড়ে না। ইহার মধ্য দিয়া নিতান্ত বেপরোয়াভাবেই সুপ্রকাশ দ্রুত হ্যারিসন রোডের মোড়ের দিকে ছুটিয়া চলিল। সৌভাগ্যক্রমে একটা পার্ক সার্কাস-গামী বাস্ সেই মুহূর্তে পুলিশের হাত-উঠানোর দরুণ ব্রেক চাপিয়াছিল, সুপ্রকাশ দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাতে লাফাইয়া উঠিল।

মাত্র ক'দিন আগে উহাদের সকলকেই সে সুস্থ ও তৃপ্ত দেখিয়া আসিয়াছে। অনভিপ্রেত পুত্রের জন্মের কলঙ্কিত ইতিহাসের কথা ভুলিয়া অদ্ভুত বাৎসল্যরসে সুমিতা যেন মশগুল হইয়া উঠিয়াছিল। মিণ্টুর কাছেও নতুন-শিশু একটা সজীব খেলনার মতো হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের সকল বিদ্যা সে উদাসীন সতুবুড়োর কানের কাছে অনর্গলভাবে উজাড় করিয়া বেশ গর্ব্ব উপভোগ করে। সুজাতাদির আচরণে তো সুপ্রকাশ শ্রদ্ধা বোধ না করিয়া পারে নাই। অদ্ভুত মেয়ে সুজাতাদি

পাছে বোনের মনে সামান্য ব্যথা লাগে, এজন্য কি সহজ ব্যবহারটাই করিতেছিলেন তিনি—যেন ইহাই তিনি চিরকাল চাহিয়া আসিতেছিলেন, এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক ও সুন্দর। এই তৃপ্তির পরিবেশের মধ্যে কোথা হইতে এই বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল? জন্মের মাত্র পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যেই কি এই মানবক শরীরের অবশ্যম্ভাবী শর্তের আওতায় আসিয়া পড়িল? ডিপ্‌থেরিয়া! শিশুদের এত বড় শত্রু আর নাই। সমাজের অভিসম্পাত কি এরই মধ্যে ফলিয়া যাইবে? অবাঞ্ছিত শিশু মানুষের ভ্রূকুটি ও নাসিকা-কুঞ্চনের ভয়ে কি আর আগাইতে সাহস করিবে না?

চলন্ত বাস্ হইতেই সুপ্রকাশ নামিয়া পড়িল, এবং দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

খাটের পায়ের দিকে বসিয়া টার্কিশ-টাউয়েল ও ক্ষুদ্র বালিসগুলির দ্বারা চিহ্নিত সুমিতার শিশুপুত্রের উপর ঝুঁকিয়া একজন ডাক্তার ইনজেক্‌শনের সূচের লক্ষ্য ঠিক করিতেছিলেন। এমন সময় সুপ্রকাশ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ডাক্তার সিরিঞ্জ্‌টা ডান হাতে ধরিয়া একবার চোখ উঠাইয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিলেন এবং কহিলেন, 'আপনি একটু এগিয়ে এসে ধরুন তো। এর মা আর মাসি দুজনেই যেমন নার্ভাস হয়ে উঠেছেন, তাতে আমারই সূচ ফুটাতে হাত কাঁপছে।

সুপ্রকাশ আগাইয়া গেল। সুজাতা যেন বাঁচিয়া গেলেন; এক মুহূর্তে তাহার মুখে নির্ভরতার সান্ত্বনা ফুটিয়া উঠিল। ভয়-চকিত দৃষ্টির স্থলে আশ্বাস আত্মপ্রকাশ করিল। ক্লান্ত হইয়া তিনি পাশের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িলেন।

'ছেড়ে দাও, সুমিতা। তুমি পাশে সরে বস। এমন ভয় পাচ্ছ কেন? জিজ্ঞেস কর ডাক্তারবাবুকে, ডিপ্‌থেরিয়ার সিরাম কতটা

কার্য্যকরী—ভাবনার কোনও কারণ নেই।' সুপ্রকাশ খাটের মাথার দিকে বসিয়া সুমিতার শিশু-পুত্রের মোমের মতো ফুটফুটে হাতটি নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

'কিন্তু মুস্কিল হবে এই সিরাম পাওয়াটাই।' ডাক্তারবাবু সূচের মুখ দিয়া সিরাম স্বচ্ছন্দে বাহির হয় কিনা, তাহা পরখ করিতে করিতে কহিলেন। 'বিকেল বেলা থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। কোথাও পাবার জো নেই। যত দরকারি ওষুধ সময় বুঝে সব গা-ঢাকা দিয়েচে। অনেক হাঙ্গামা করে এক ডাক্তার-বন্ধুর কাছ থেকে তার অনেক কষ্টে বাঁচানো দুটো অ্যাম্পুল প্রায় জোর করেই নিয়ে এসেছিলাম; তার একটা দিয়ে গেছি, আর এইটি মাত্র অবশিষ্ট। দুটো মিলে মাত্র ষোল হাজার ইউনিট, তাও আবার দিশী।

'আর কতটা দরকার? অনেকটা কি?' সুপ্রকাশ সুমিতার আতঙ্কিত মুখটার দিকে একবার সভয়ে চাহিয়া লইয়া কহিল।

'অনেকটা বৈকি। একবার দেখলে বুঝতে পারবেন, প্যাচ্ কতটা ডেভেলাপ্ করেচে। অন্তত ষাটহাজার ইউনিট। তাও পি-ডি হলে ভাল হয়। আজ রাত্তিরেই আরও হাজার ষোল ইউনিট পড়া নিতান্ত দরকার।'

সহসা ঘুমন্ত শিশুটা চিৎকার করিয়া উঠিল। নরম মাংসের মধ্যে সূচ ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একটা অদৃশ্য অজ্ঞাত বেদনায় অবোধ মানবক 'ওয়াঁও' 'ওয়াঁও' করিয়া গুম্‌রাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। সহসা একটা অবরুদ্ধ ক্রন্দনের শব্দে ডাক্তারবাবু এবং সুপ্রকাশ দুজনেই চমকাইয়া উঠিলেন।

'ছি, সুমিতা, এই নাও, হয়ে গেচে। ধর তোমার ছেলেকে।' সুপ্রকাশ স্থান ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া বসিল। 'চলুন ডাক্তারবাবু, ও-ঘরে গিয়ে বসি। আপনার ব্যাগটা আমি নিচ্ছি। দিদি, দেখবেন,

জায়গাটার তুলোটা কিছুক্ষণ যেন না পড়ে। হ্যাঁ, বলুন দেখি, আর কতটা সিরাম আপনার চাই। জোগাড় আমি করতে পারবই, তা যেখান থেকেই হোক। সিরাম পেলে আর ডিপ্থেরিয়ার ভয় কি, কি বলেন ?...'

ড্রইং-রুমে বসিয়া সুপ্রকাশ সমস্যাটার গুরুত্ব সম্বন্ধে সকল তথ্য জ্ঞাত হইল। অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় ওষুধের মতো ডিপ্থেরিয়ার সিরামও মুনাফাখোরদের গৃধ্নুতায় শাদা-বাজার হইতে গা-ঢাকা দিয়া কালো-বাজারে বেসাতি আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু কালোবাজারের মূল্য দিবার ক্ষমতা যাহাদের আছে তাহাদের পক্ষেও তাহার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। কালোবাজারীরা বহুলাংশে বেপরোয়া হইলেও অনাবশ্যক বিপদের মধ্যে পা বাড়াইতে নারাজ। সুতরাং অপরিচিত বা পরিচিত সৎ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তাহারা শত হস্ত দূরে রাখে। এই দূরত্ব অতিক্রম করা অসাধ্যের কাছাকাছি।

'দিদি, বাড়িতে টাকা আছে ? শখানেক হবে ?'

'হবে। এনে দিচ্চি। কি বললেন ডাক্তার ঘোষ ?'

'খুব গুরুতরই বটে। পার্ক ডেভিসের সিরাম যদি গোটা চারেক অ্যাম্পুল জোগাড় করা যায়, তবে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।' সুপ্রকাশ পীড়ার গুরুত্বটা সুজাতাকে জানাইয়া দেওরাই কর্ত্তব্য মনে করিল।

'সুপ্রকাশ, বাঁচবে তো ? বেচারি সুমি !' সুজাতা ভীতমুখে কিন্তু সংযত-কণ্ঠে কহিলেন।

'আরও হাজার পঁচিশেক ইউনিট না পড়লে ডাক্তার ঘোষ কিছু বলতে পারছেন না। রাত্রি বারোটা সাড়ে বারোটায় উনি আবার আসবেন।'

কাছাকাছি সমস্ত ওষুধের দোকানে সুপ্রকাশ খোঁজ করিল। কিছু কিছু দোকান ইতিমধ্যেই বন্ধ হইয়াছে, কিছু বা বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে। দুএকটা এখনও অনেকক্ষণ খোলা থাকিবে। যেখানেই পারিল, সুপ্রকাশ ঢুকিয়া পড়িল। সকলেই কহিল, এখানে পাবেন না, অমুক ফার্ম্মেসিতে একবার দেখতে পারেন। অমুক ফার্ম্মেসিতে গেলে তাহারা জানাইল, আমাদের যা ছিল ফুরিয়ে গেছে, আপনি বরঞ্চ একবার অমুক জায়গায় খোঁজ করতে পারেন। অমুক জায়গাও তাহাই বলিল।

দোকানের পর দোকানে প্রায় পাগলের মতো খোঁজ করিতে করিতে সুপ্রকাশ ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। ফেরৎ ট্রামগুলি ডিপোর দিকে চলিয়াছে, অথচ এতক্ষণে একটাও ট্রাম ধর্ম্মতলার দিকে যাইতেছেনা। শেষে ধর্ম্মতলা ও চৌরঙ্গি অঞ্চলের দোকানগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে যে! আশেপাশে একটাও ট্যাক্সি নজরে পড়িল না; পেট্রোল-র‍্যাশনিং-এর দরুণ প্রয়োজনের সময় ইহারা আর চোখে পড়েনা।

'গাড়ি হুজুর?'

সুপ্রকাশ চাহিয়া দেখিল, পাশে একটা ফিটন-গাড়ি। তাহার চালক অন্ধকারে ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় গাড়ির কাছাকাছি ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছে।

'গাড়ি? আচ্ছা চল', বলিয়া সুপ্রকাশ বাক্যব্যয় না করিয়া উঠিয়া বসিল।

'শাদা?' কোচবাক্সে চড়িয়া বসিয়া গাড়োয়ান প্রশ্ন করিল।

'কি বলচ?'

'প্রাইভেট মাংতা?'

'তোমার মুণ্ডু মাংতা', এইবার প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া

সুপ্রকাশ এত উদ্বেগের মধ্যেও কৌতুক উপভোগ করিল। বারবণিতার এই দালালদের প্রশ্ন কলিকাতার প্রকাশ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে যাহারা দুচার দিনও বেড়াইয়াছে, তাহাদের না শুনিয়া উপায় নাই। ইহা এত মামুলি হইয়া গিয়াছে যে, ইহার কদর্য্যতাতে রুষ্ট হওয়া নিরর্থক মনে হয়। গম্ভীরভাবেই সুপ্রকাশ কহিল, 'ধর্ম্মতলা চল, গীগ্‌গির। তাড়াতাড়ি যেতে পারলে ভাড়া ছাড়াও বক্‌শিষ পাবে।'

হতাশ কোচোয়ান বকশিষের লোভেও হৃষ্ট হইল না; ঘোড়াটাকে জোরে চাবুক মারিয়া দালালি হস্তচ্যুত হওয়ার ক্ষতির প্রতিশোধ লইয়া ছাড়িল।

'আপনাদের ডিপ্‌থেরিয়ার সিরাম আছে কি? পি-ডি'র সিরাম হলেই ভালো হয়। জরুরি দরকার।'

কাউণ্টারের কাছে দু-তিন জন কর্ম্মচারি বসিয়া রেস-টিপ্ আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের একজন চোখ তুলিয়া সুপ্রকাশের দিকে চাহিল।

'ডিপ্‌থেরিয়ার সিরাম দিতে পারেন কি? খুব উপকার হয় দিতে পারলে।' সুপ্রকাশ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল।

কর্ম্মচারিটি ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। পরে অপর দুই সহকর্ম্মীর মুখের দিকে তাকাইল, এবং চোখের দৃষ্টি ছানি-পড়া চোখের দৃষ্টির মতো করিয়া আরও কয়েক সেকেণ্ড নির্ব্বাক রহিয়া কহিল, 'নাঃ, নেই।'

'দেখুন দয়া করে একটু খুঁজে। পাওয়া না-পাওয়ার উপর ছোট একটি শিশুর জীবন নির্ভর করচে।'

'না, নেই।' লোকটা স্থিরকণ্ঠে কহিল।

'একবার খোঁজ করে দেখলে হতো না?' হাবভাব দেখিয়া সুপ্রকাশের বিশ্বাস হইল, ইহাদের কাছে ওষুধ আছে, অথচ তাহা

ইহারা কবুল করিতে চাহিতেছে না। 'হয়তো ভিতরে কোথাও কোন আলমারিতে…'

'ওষুধ নেই। আপনি এবার আসুন।'

সুপ্রকাশ দোকানের বাহিরে আসিয়া ফুটপাথের উপর দাঁড়াই এইবার কোথায় যাওয়া যায় ভাবিতে লাগিল।

'শুনচেন মোশায়?'

'আমাকে বলছেন? বলুন?' সুপ্রকাশ অন্ধকারের ভিতর অস্পষ্ট মূর্ত্তিটার প্রশ্নের উত্তরে কহিল।

'আপনি পুলিশের লোক নন বলেই মনে হচ্চে। হাঙ্গামাকে আমরা বড় ভয় করি।' বলিয়া মূর্ত্তিটা কাছে আগাইয়া আসিল। তখন ইহাকে সুপ্রকাশের ওষুধের দোকানটার অপর দুইজন কর্ম্মচারির একজন বলিয়া মনে হইল।

'দিতে পারেন ওষুধটা?' ব্ল্যাক-মার্কেটে সিরাম প্রাপ্তি'র সম্ভাবনায় পুলকিত-আগ্রহে সুপ্রকাশ প্রশ্ন করিল।

'সামান্য দু পাঁচটা অ্যাম্পুল আছে পি-ডির।' লোকটা কাছে সরিয়া আসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল। 'কাস্টমারের অর্ডার ছিল, তুলে রেখেছিলাম। তা আপনি যেমন জরুরি বলচেন, শত হোক মশায়, আমাদেরও তো ছেলেপিলে আছে—তা নিয়ে যান আপনি। তবে আমাদেরও বাইরে থেকে কেনা কিনা, দামটা একটু বেশিই পড়বে। আপনার কটা অ্যাম্পুল চাই বললেন?'

'চারটা পাঁচটা। যতটা পাওয়া যায়।'

'তা পাবেন। পাঁচটাই পাবেন। দামটা আপনার অ্যাম্পুল প্রতি পঞ্চাশ টাকা পড়বে। দোকানটার কবাটের কাছে সরে দাঁড়ান, আমি এনে দিচ্ছি।'

'পঞ্চাশ টাকা!' সবিস্ময়ে সুপ্রকাশ কহিল, 'এত কেন! কনট্রোল দর তো দশ-বারো টাকার বেশি নয়, ডাক্তারবাবু বললেন। আপনারা না হয় তার দ্বিগুণ···'

'তবে আপনার দরকার নেই বলুন', লোকটা নিরস কণ্ঠে কহিল।

'না, দরকার আছে বৈকি।' এক পলকে সম্পূর্ণ অবস্থাটা ভাবিয়া লইয়া সুপ্রকাশ নিজেদের অসহায়তা বুঝিতে পারিল। 'কিন্তু আমার কাছে তো অত টাকা নেই। দুটো অ্যাম্পুল আমাকে এখন দিন, তার টাকা দিয়ে যাচ্চি। বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে আধ ঘণ্টার মধ্যে বাকি কটা নিয়ে যাবো।'

'বটে, নিজেকে খুব চালাক ভেবেচেন।' লোকটা রূঢ় হাসি হাসিয়া কহিল। 'লম্বরী নোট গছিয়ে দিয়ে সাক্ষীসাবুদ হাতে করে একবারেই কাজ হাসিল করে' যেতে চান। আজ্ঞে আমরাও ভাত খেয়েই বড় হয়েচি; ঘাস খেয়ে বড় হইনি। আমাদের গোবিন্দখুড়ো প্রথমেই আঁচ করেছিলো, আমরাই বরঞ্চ বিশ্বেস করিনি। আচ্ছা, নমস্কার মোশায়। দেখুন এগিয়ে, পাবেন কোথাও, কন্ট্রোলের দরেই পেয়ে যাবেন···'

'আপনি ভুল করছেন। আমি সত্যই একজন সাধারণ খরিদ্দার; ওষুধ সংগ্রহ-করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই···'

'আচ্ছা আসি, স্যার, নমস্কার।' বলিয়া লোকটা চোরের মত সহজেই অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

ইহার পর দুঘণ্টা পর্য্যন্ত সুপ্রকাশ মরিয়ার মত সকল সম্ভব এবং অসম্ভব স্থানে ডিপ্‌থেরিয়ার অমোঘ এই মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইল; অনেক দোকানই ইতিমধ্যে রাতের মত বন্ধ হইয়াছে যেগুলি খোলা ছিল, তাহারাও কেহ দিতে পারিল না, বা দিল না।

মরিয়া হইয়া অবশেষে সুপ্রকাশ থানায় উপস্থিত হইল, এবং সকল ঘটনা বলিল।

'আর মশায়!' দারোগা ছোক্‌রা দিনেন্দ্র রায়ের ডিটেকটিভ-উপন্যাস পড়িতেছিল, মিঃ ব্লেক্‌কে নিতান্ত বিপজ্জনক অবস্থায় ছাড়িয়া রাখিয়া কহিল, 'আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া যাবে তো আপনার সিরামের সন্ধান পাওয়া যাবে না। এতক্ষণে তা মন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে গেচে। তাছাড়া ডিস্‌পেন্সারি ভরা ওষুধের মধ্যে সাধ্য কি ডিপ্‌থেরিয়ার সিরাম খুঁজে বের করি। এক আলমারি ওষুধের নাম পড়তেই তো একটা রাত কাবার হয়ে যাবে। তবে আপনাকে এই প্রমিশ দিতে পারি যে, এবার থেকে ওদের কেনা-বেচার উপর নজর রাখবার ব্যবস্থা করব...'

'ধন্যবাদ', হতাশ হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুপ্রকাশ কহিল। 'কিন্তু খুব চক্ষুষ্মান পাহারা রাখবার চেষ্টা করবেন। যা কালো পাড়া—অনেকেরই সেখানে দিক্‌ভ্রম হয়ে যায়।' বলিয়া আর বাক্য-ব্যয় না করিয়া সুপ্রকাশ বাহির হইয়া আসিল, এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া নিউপার্ক স্ট্রীটে ফিরিয়া চলিল। পিছন হইতে গির্জ্জার ঘড়ির দুইটা ঢং ঢং শব্দ শুনা গেল।

'কি খবর, ডাক্তারবাবু?'

'আর খবর! আর আধঘণ্টার মধ্যে ছেলেটা চোক্‌ড্‌ হয়ে মারা পড়বে। পেলেন সিরাম?'

'না, পাই নি।' সিঁড়ির ধারে রেলিংটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সুপ্রকাশ কহিল।

'তা আমি জানতামই। তবু আপনাকে একবার চেষ্টা করে দেখবার কন্‌সোলেশন পেতে বাধা দিলাম না।' ডাক্তার ঘোষ ধীরে

ধীরে ড্রইং-রুমের দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন। 'দিনে হলে আমিও একবার চেষ্টা করে দেখতাম, কিন্তু কাল ভোরে আর প্রয়োজন থাকবে বলে মনে হচ্ছে না…'

ভর্তৃহীনা জবালা তাহার জারজ-পুত্রের দিকে অতন্দ্র ভীত-চোখে এক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। সুপ্রকাশ নাম দিয়াছিল সত্যকাম। সত্যকাম সতুবুড়ো হইয়া মায়ের বুক জুড়িয়া, কোল জুড়িয়া, মন জুড়িয়া বসিয়াছিল। পরিহাস-প্রিয় এক অজানা শক্তি এক কলঙ্ক-সম্ভূত জীবের সৃষ্টি করিয়া চপল মায়ের সকল চাপল্য বিদূরিত করিল, একটা অপার আনন্দে, অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে ধিকৃতা মাতাকে নতুন গৌরব ও পরম সার্থকতা দান করিল। তারপর নতুনতর পরিহাসে মার কোল হইতে খসিয়া পড়িল খেলনা, ভাঙিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল।…

সুমিতার চোখের সামনে পরদিন দ্বিপ্রহরে এক গণ্ডুষ বাতাসের জন্য সতুবুড়ো বারবার ক্ষুদ্র মুখটা খুলিতে চেষ্টা করিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত-পা দিয়া মাকে বারবার আঁকড়াইয়া থাকিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিল। মুখটা নানা বিকৃত রেখায় বারবার ভরিয়া উঠিল। তারপর সে স্থির হইয়া গেল, আর নড়িল না।

তেইশ

চিঠিটা পাইবার পর কালই যদি জবাব পাঠাইত, তবে অর্থ হইত। আজ আর চিঠি লিখিবার কোনও সার্থকতা নাই। ক্যাম্বিসের চেয়ারটার পাশের টিপয়-আকারের ছোট টুলটার উপর 'আউট্‌লাইন অব দি হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড্'-চাপা চিঠিটার প্রতি সুপ্রকাশ একটু যেন অপরাধীর মতো তাকাইল। সুনীলার চিঠি। অনুপস্থিতির জন্য

বিস্ময় ও শনিবার সন্ধ্যায় উপস্থিত হইবার আমন্ত্রণ। আজ শনিবার বৈকাল; এখনও সুপ্রকাশের অপারগতা জানান হয় নাই।

'সুনীলা আমার চাইতে অনেক উঁচুতে, এর প্রশ্রয় কিছুতেই দেওয়া চলে না; তার দুর্ব্বলতা সত্যই অহেতুক এবং উৎসাহ-দানের অযোগ্য।' সুপ্রকাশ ভাবিতে লাগিল। দার্জ্জিলিঙের নির্জ্জন পাহাড়ের রহস্যময় আবেষ্টনে, ঘুম্-এর পথে ঝরনাটার পাশে সুনীলার সেই আত্ম-উন্মোচনের সম্ভাবনায় সে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া সুনীলার সহিত কিরূপ রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিল, আজ সে কথাটাও আবার মনে পড়িল। গত কয়মাস হইতে শুভেন্দুদের বাড়িতে কেন তাহার যাতায়াত বিরলতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার নিজের কাছে তাহা অজানা নহে। আদর্শের মোহে নিজের জীবনে সুনীলা কোনও অবিশ্বাস্য অদূরদর্শিতা প্রকাশ করে, ইহা সুপ্রকাশের ইচ্ছা নহে।

'যাক্ গে, পারি তো সন্ধ্যাবেলা একটা টেলিফোন করে' দেব'খন', সুপ্রকাশ নিজের মনেই বলিল, এবং চাকরকে বৈকালিক চা আনিতে হাঁক দিল।

বিকালে কিছু করিবার ছিল না। সুজাতাদির বাড়ি যাওয়া চলে, কিন্তু সুমিতাকে দেখিলে বড় কষ্ট হয়। বেচারি সুমিতা! চাপল্য নাই, উচ্ছ্বাস নাই, মুখে হাল্কা হাসি পর্য্যন্ত নাই। জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা মুখরকে মৌন করিয়া দিয়া গেছে। এবার সিনেমায় নামাই বরঞ্চ ওর পক্ষে ভালো, তবু অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার একটা অবকাশ ঘটিবে; কিন্তু যাহার জন্য সে নারী-জীবনের সবচেয়ে বড় সম্ভ্রম ও বড় সম্পদ বিলাইয়া দিয়াছিল, তাহা আর তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে না।

এদের স্থান কোথায়? পরিণাম কি? সুপ্রকাশ চায়ে চুমুক দিতে ভুলিয়া ভাবিতে লাগিল। সমাজ ইহাদের অপাংক্তেয় বলিয়া চিহ্নিত

করিয়াছে, চাপল্যের মত্ততা ইহাদের নেশার মতো ছাড়িয়া গিয়াছে। কোন্ আনন্দ, কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া সুমিতা জীবনের আকর্ষণহীন সুদীর্ঘ পথে আগাইয়া চলিবে? এই অর্থহীন শোচনীয়তার সৃষ্টি করিয়া মানুষের সমাজ কোন্ আনন্দ পায়?

'বাবু, নিচে গাড়িতে করে এক সাহেব এসেচেন। ইটি আপনাকে দিতে বললেন।'

সুপ্রকাশ চমকিয়া চাকরের হাত হইতে কার্ডটা লইয়া পড়িল—পূর্ণেন্দুভূষণ রায়। নিমেষে সে সারা দুপুরের আরামদায়ক আশ্রয়টি হইতে উঠিয়া পড়িল। পূর্ণেন্দুবাবু নিজে! নিজে তিনি কখনও তাহার কাছে আসেন নাই। হঠাৎ কি প্রয়োজন পড়িল?

'তোমার সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন আছে, সুপ্রকাশ।' পূর্ণেন্দু-বাবু গাড়ির দরজাটা খুলিয়া দিয়া কহিলেন। 'চল, আমার সঙ্গে। অসুবিধা হবে না তো?'

'না, চলুন।' গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে সুপ্রকাশ কহিল।

'চা খাওয়া হয়েচে? চল, কোথাও চা খেয়ে নেবে।'

'চা খেয়েচি। কোথাও যাবার দরকার নেই।'

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়া বড়ো ডেইমলার গাড়িটা দক্ষিণ দিকে আগাইয়া চলিল, এবং গভর্ণমেণ্ট প্লেস ঈস্টে মোড় লইয়া ইডেন গার্ডেন্‌স্ ডাহিনে রাখিয়া স্ট্রাণ্ডে আসিয়া পৌঁছিল। পূর্ণেন্দুবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন, ড্রাইভারকে একবার মাত্র হেস্টিংস্-এর দিকে অগ্রসর হইবার নির্দ্দেশ দিয়া আবার নিঃশব্দেই বসিয়া রহিলেন। সুপ্রকাশের বিস্ময়টা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল।

'ব্যস্, এইবার ঘুরিয়ে রাস্তার পাশে রাখো।' অবশেষে স্টিমার-

জাহাজমুক্ত গঙ্গার এক অংশের নিকটে আসিয়া পূর্ণেন্দুবাবু গাড়ি থামাইবার আদেশ দিলেন। 'তুমি গঙ্গার কাছে গিয়ে বসো, রঘুনন্দন। যাবার সময় হলে আমি ডাকব।'

'জী, হুজুর।' বলিয়া উর্দ্দি-পরা মোটর চালক পা-জোড়া ফুট-বোর্ডের উপর নামাইল।

গঙ্গার পরপারে চটকলের ইমারতগুলি চোখে পড়িতেছে। কিছু কিছু মোটর-লঞ্চ ও দেশী-নৌকা যুদ্ধকালীন গঙ্গার যান-গৌরব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ডাহিনে ফোর্ট উইলিয়মের দুর্গপ্রাচীরের উপর দিয়া কেল্লার কোনও কোনও দালানের চূড়া দৃশ্যমান। ইহাদের মাথার উপর বেতারের সরঞ্জাম উঁচু হইয়া আছে।

'তুমি ভাবচ, বুড়োটার মতলব কি?' সহসা পূর্ণেন্দুবাবু সুপ্রকাশের বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন: 'প্রথমেই একটা মস্ত বড় স্বীকারোক্তি করে তোমাকে জানাতে চাই। বিশ্বাস করবে, তোমার মতো আমিও একজন সাম্যবাদী? আমার মিল, আমার ইন্‌স্যুরেন্স কোম্পানী, আমার ব্যাঙ্ক, আমার হাজার রকম ইন্‌ডাস্ট্রি সত্ত্বেও আমি একজন সাম্যবাদী। বাঁচাবার উপকরণের ওপর সাধারণ মানুষের অধিকার আরও অনেক বিস্তৃততর হোক্, বঞ্চিতদের উপর বঞ্চনার সমাপ্তি হোক, মানুষের সমাজ আরও ব্যাপক স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির কল্যাণে আরও উন্নতির ও আনন্দের জায়গা হোক, এ আমিও আশা করি, আমিও চাই...'

সুপ্রকাশ প্রসঙ্গটার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে পারিল না, চুপ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

'কিন্তু', পূর্ণেন্দুবাবু এক সেকেণ্ড নীরব থাকিবার পর কহিলেন, 'শ্রেণী-যুদ্ধে আমি বিশ্বাস করি না। ওটাকে অনাবশ্যক এবং অসম্ভব বিবেচনা করি। দরিদ্র হতে হতে জগতের অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব

হয়ে উঠবে এবং ধনী হতে হতে মাত্র ক'জন ধনী হয়ে দাঁড়াবে, এবং অবশেষে ক্ষিপ্ত বঞ্চিতেরা একদিন শুরু করবে রক্তের হোলি-খেলা, সাম্যবাদীর বিদ্রোহ ধনতান্ত্রিকতার টুঁটি চেপে ধরে' তাকে শেষ-বারের মত হত্যা করবে, এ প্রয়োজনীয় নয়, সম্ভাব্যও নয়। কেন সম্ভব নয়, তাই আগে বলি···' বলিয়া পূর্ণেন্দুবাবু সুপ্রকাশের কাছ হইতে মন্তব্যের জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেন।

'সম্ভব নয় এই জন্য যে', জবাব না পাইয়া পূর্ণেন্দুবাবু কহিতে লাগিলেন, 'ধনতান্ত্রিক সমাজ সবাইকে সমান ভাবে বঞ্চিত করেনা, সকলকে সমান নিঃস্ব করে তোলে না। যারা খেটে খায়, তাদের মধ্যে আর্থিক স্তর বহু। মেকানিক কুলির চাইতে নিজেকে ভিন্ন শ্রেণীর মনে করে, মেকানিকের চাইতে চার্জম্যান নিজেকে উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত বলে ভাবে। ফোরম্যান এদের সবার চাইতে কুলিন। তারপর আছে অসংখ্য ক্রমোচ্চ স্তর। সবাই নিজেকে উচ্চতর স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে ইচ্ছুক এবং ব্যস্ত। কেউ নেমে অন্যদের সঙ্গে মিশতে চায় না; একসঙ্গে বিদ্রোহ করা তো দূরের কথা···' বলিয়া চশমাটা খুলিয়া লইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পূর্ণেন্দুবাবু কাচগুলি বারবার ঘষিয়া আবার চোখে পরিলেন।

'অনাবশ্যকও বটে।' গলাটা সাফ্ করিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন। 'মিল-মালিক মাত্রই মূর্খ নয়, অন্তত সবাই মূর্খ নয়। তারাও সময়ের দিকে চোখ মেলে আছে। যা অসম্ভব, যা ব্যাড্ বিজ্‌নেশ, তা তারাও লক্ষ্য করতে জানে। যদি সমাজে এমন জনমত প্রবল হয়ে ওঠে যাতে নির্জ্জলা স্বার্থপরতা বিপজ্জনক ব্যবসায়ের পর্য্যায়ে দাঁড়ায়, তবে তারাও সময়-অনুযায়ী নিজেদের প্রচেষ্টাকে পরিবর্ত্তিত করতে বাধ্য হবে। হয়তো, তাদের মধ্যেও ক্রমে এমন মনোভাব সৃষ্ট করা সম্ভব, যাতে স্টেটের নিয়ন্ত্রণাধীনে যেতে তারা আর

আতঙ্কিত হবে না। এই জনমত গড়ে ওঠবার উপক্রম হয়েছে; স্বার্থপর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিসম-এর দিন বেশি নাই। এবার যারা বুদ্ধিমান ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট তারা আইডিয়াওয়ালা লোকের খোজ করবে, যারা নতুন পরিকল্পনায়, স্থায় ও মানবিকতার ভিত্তিতে নতুন ক'রে, নতুন পথে, ইণ্ডাস্ট্রিকে চালিত করবার উপযুক্ত শক্তি ও দৃষ্টির অধিকারী, যাদের সারথ্যে শ্রমশিল্পের নবজন্ম লাভ হবে; অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন—তা হোক সে স্তোশ্যালিস্‌ম্ বা অন্য কিছু—সহজ হয়ে উঠবে। সকল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মিল-মালিকই মনে মনে এমন খোঁজ শুরু করেছেন। অন্তত আমি যে খোঁজ করচি, তাতে সন্দেহ নেই…', বলিয়া স্থপ্রকাশের দিকে পূর্ণেন্দুবাবু রহস্যময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

'হ্যাঁ, জানো স্থপ্রকাশ,' সহসা পূর্ণেন্দুবাবুর কণ্ঠস্বর ও প্রসঙ্গ আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে বদ্‌লাইয়া গেল। 'প্রদ্যোৎ বলে' সেই ছেলেটিকে চেনো? স্থনীলার সঙ্গে তার বিয়ের একটা কথা-বার্ত্তা কিছুকাল ধরে চলচে। আই. সি, এস্-এর ওপর স্থনীলার মার বড় সম্ভ্রম। কাল সন্ধ্যাবেলা লাইব্রেরিতে বসে পড়ছিলুম। স্থনীলা এসে পাশে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, বাবা, আমি বলে দিনুম, কিছুতেই ওখানে আমার বিয়ে দিতে পারবে না—বলে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। কারণ জানতে চাইলাম। মেয়ে আমার বন্ধুও বটে তা জানো তো, স্থপ্রকাশ? জবাবটা খুব স্পষ্ট হলো না, কিন্তু যতটুকু হলো—হ্যাঁ, স্থপ্রকাশ, স্থনীলাকে বিয়ে করতে তোমার কিছু আপত্তি নেই তো?'

'আপনি বলেন কি!' এতক্ষণে স্থপ্রকাশ চম্‌কাইয়া উঠিয়া প্রথমবার কথা কহিল। 'স্থনীলাকে! আমি! আমি কি তার যোগ্য! স্থনীলা আমার চাইতে অনেক উঁচুতে; আমার যোগ্যতার অনেক উর্দ্ধে তার ঐশ্বর্য্য…'

'ঐশ্বর্য্য বাইরে নেই, সুপ্রকাশ, ঐশ্বর্য্য আছে ওখানে আর এখানে,' বলিয়া পূর্ণেন্দুবাবু প্রথমে মাথা ও পরে হৃৎপিণ্ডের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন। 'সে-ঐশ্বর্য্যে তুমি কারুর চাইতে ছোট নও, অনেকের চাইতেই বড়। আমার ইণ্ডাস্ট্রির পক্ষেও এ-ঐশ্বর্য্যের বড় প্রয়োজন হয়ে উঠেচে, সুপ্রকাশ। কার্য্য-পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন; তার জন্য আমার লোক আছে, সে শুভেন্দু। পরিকল্পনের, আইডিয়া ও আদর্শ দেওয়ার আমার লোক নেই। সে ভারটা তুমি এসে নাও, সুপ্রকাশ···'

'আমাকে একটু ভাবতে দিন। সমস্ত ঘটনাটা আমার কাছে এমন অসম্ভব ও নিজের যোগ্যতার বহির্ভূত বলে মনে হচ্চে যে, সব কিছুই অস্পষ্ট হয়ে উঠেচে। আমাকে দুদিন সময় দিন···'

'বেশ। তুমি ভেবে দেখো।' পূর্ণেন্দুবাবু প্রশ্রয়ের কণ্ঠে কহিলেন। কিন্তু আমাদের দিক থেকে আপত্তির কোনও কারণ নেই, তা তুমি মনে রেখো।' বলিয়া হাততালি দিয়া গঙ্গার শোভায় বিমুগ্ধ রঘুনন্দনের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

'কোথায় তোমায় নামিয়ে দেব, বাবা। বাসায় ফিরবে?'

'আমাকে এসপ্লানেডে নামিয়ে দিন।' সুপ্রকাশ কহিল।

নিউ পার্ক স্ট্রীটে জনাকীর্ণ ট্রামটা হইতে সুপ্রকাশ নামিয়া পড়িল, এবং কয়েক পা হাঁটিয়া আসিয়া সুজাতাদির বাসার সিঁড়ি পাইল।

'সুমিতা?'

'কেঃ! ও।' ড্রইং-রুমের সোফায় সুমিতা একা চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল, চমকাইয়া ক্লান্ত চোখের অশ্রুসিক্ত পাতা মেলিয়া চাহিয়া সমুখেই সুপ্রকাশকে আবিষ্কার করিল।

'দিদি কোথায়?' সুপ্রকাশ আগাইয়া আসিয়া কহিল।

'মিণ্টুকে ঘুম-পাড়াতে গেছেন। বসুন আপনি, আমি তাঁকে খবর দিয়ে আসি।'

'তার দরকার নেই। আমি তোমার কাছে বসচি।' বলিয়া পাশের গদিমোড়া টুলটায়, সুমিতার অতি কাছেই সুপ্রকাশ বসিয়া পড়িল।

'সুমিতা, তোমার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'কি বলুন ?' বিস্মিত হইয়া সুমিতা পক্ষ্ম উদ্ঘারিত করিল।

'তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই। আপত্তি থাকলেও আমি···'

'এর মানেটা কি ?' সুমিতা সোজা হইয়া বসিয়া চোখ বিস্ফারিত করিল। এক পলকে মুখটা আরক্ত হইল ; হাতের আঙুলগুলি কাঁপিতে লাগিল, শরীরটা অবশ এবং বুদ্ধি আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

'মানে খুব সহজ। এক ভদ্রলোক এক ভদ্রকন্যাকে বিবাহ করতে চান। সৃষ্টির আদি থেকে এই সত্য চলে আসচে, এসে পৌঁচেছে এই যুগ পর্য্যন্ত। আমি খুব বেশি অযোগ্য নই। তুমি আপত্তি করোনা ; আপত্তি করলেও আমি শুনব না।'

'দেমাক, দেমাক, দেমাক !' বলিয়া সহসা স্তম্ভিতবুদ্ধি সুমিতা প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল। 'অসহায়, ঘৃণিত, সমাজপরিত্যক্ত, অসম্ভ্রান্ত দেখে আপনি আমায় করুণা দেখাতে এসেচেন, দয়া করতে এসেচেন, কেমন ? সমাজে ঠাঁই হবেনা ভেবে ঠাঁই দিতে এসেচেন। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ এই করুণার জন্য, এই সহানুভূতির জন্য। আপনি খুব বড়ো, আমি জানি। আপনি খুব সৎ, তা আমি জানি। চাপল্য আপনার মধ্যে নেই, তা আমি জানি। যদি একটুও থাকতো, তবে এখনও হয়তো আমি সম্ভ্রান্তই থাকতে পারতাম, সুস্থ থাকতে পারতাম। ঋষিকে নমস্কার করি। কিন্তু আজ আমার সকল গায়ে কাদা লেগে গেছে, কলঙ্কে আমি আগাগোড়া···'

'কাদা কারুর গায়ে চিরদিন লেগে থাকে না, সুমিতা। এ-সম্পর্কে পুরুষ আর মেয়েতে যারা পার্থক্য করেন, আমি তাদের দলে নই।' সুপ্রকাশ মমতার সঙ্গে কহিল। 'মানুষ ভুলের অতীত নয়; রক্ত-মাংসের দুর্বলতা সুবিদিত। যে-ব্যবস্থা একে অস্বীকার করে, ত্রুটি-শাসনের উন্মত্ত নেশায় বর্ব্বরতা প্রদর্শন করে, সে সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নেই। তোমাকে বিয়ে করে' আমি সম্পূর্ণ সুখী হতে পারব বলে মনে করি।'

'তা পারবেন না।' সুমিতা এইবার সংযত, কিছুটা বা করুণ-কণ্ঠে কহিল। 'যদি আপনি এর ঊর্দ্ধে সত্যই উঠতে পারেন, তবু পারবেন না। এই দুঃস্বপ্ন আমাকে আচ্ছন্ন করে আছে, ছায়ার মতো চিরকাল সে আমাকে অনুসরণ করবে, এর দুর্গন্ধ চেষ্টা করেও আমি মন থেকে দূর করতে পারব না। এমন ইতিহাস বয়ে কারুকে সুখী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাকে অশেষ অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমাকে মাফ্ করবেন। আমার বিবেক...'

'অতীতের অনুচিত-আচরণের স্মৃতি যদি সজীব মনকে চিরকাল আচ্ছন্ন করে রাখে, সেটা স্বভাব নয়, এটা মনে রেখো, সুমিতা। এটা পচা দুর্গন্ধ মড়া সমাজের সৃষ্টি।' সুপ্রকাশ গম্ভীর স্বরে কহিল। 'সামাজিক ত্রুটিকে অনপনেয় পাপ বলে বহু শতাব্দী ধরে' যে-প্রচার চলে আসচে, তোমার এই বিবেক তারই সৃষ্টি; এটা সহজ মনের সিদ্ধান্ত নয়, এটা বুদ্ধির বিচার নয়। একে তুমি বর্জ্জন কর...'

'তা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন অনুরোধ করবেন না। এমন অনুচিত অসম্ভব কিছু আমি ঘটতে দিতে পারি না।...আমি দিদিকে ডেকে দিচ্ছি', বলিয়া সুমিতা ছলছল চোখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

'সুমিতা, তা হবেনা।' সুপ্রকাশও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। 'তোমাকে রাজি হতেই হবে। তোমার কোনও কথাই আমি শুনব

না। এ যদি আমার দেমাকই হয়, হোক। দেমাক থাকলেই সে লোক মন্দ হয় না। শোনো, দাঁড়াও। আমার প্রস্তাবের আকস্মিকতা হয়তো তোমাকে বিচলিত করেছে। আজ রাতটা ভেবে দেখো। কাল সকালে আমি আবার এসে হাজির হবো। তখন তোমার কোন আপত্তিই আমি শুনবো না, মনে রেখো। প্রত্যাখ্যানকে আমি সম্মান করব না। আজ আর দিদিকে ডেকে কাজ নেই; কাল এসে তাকে সকল কথা জানাব…' বলিয়া সুপ্রকাশ সজোরে পর্দাটা সরাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরক্ষণে সিঁড়িতে পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সুমিতার দুই চক্ষু অমিত অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সোফাতে মুখ গুঁজিয়া সে অশ্রু-বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠে কহিতে লাগিল, 'অসম্ভব, এ যে অসম্ভব! উচ্ছিষ্ট ফুলে কি দেবতার পূজা হয়?…'

চব্বিশ

'বাবা।'

'কি মা?'

'তোমার গাড়িটা নিয়ে আমি একটু বের হব?' সুনীলা বাবার আর্ম-চেয়ারটার সঙ্গে লাগিয়া দাঁড়াইয়া কহিল। 'তোমার আজ ভোরে কোন কাজ নেই তো?'

'না মা, কোনও কাজ নেই!' বইটা চোখের সমুখ হইতে সরাইয়া আঙুলটা পেজ-মার্ক হিসাবে বইয়ের ভিতর ঢুকাইয়া পূর্ণেন্দুবাবু কহিলেন।

'একটু কলকাতা যাব, বাবা। সুজাতাদির কাছে।'

'বেশ। একাই যাবি? মার্কেটে তোর মার কোনও কাজ আছে কিনা একবার জিজ্ঞেস করে দেখ।'

'মা কোথাও বেরুতে পারবেন না!' সুনীলা সকৌতুকে পিতার হাতের বইটার নাম লক্ষ্য করিয়া কহিল।

'ওঃ, আজ প্রদ্যোৎ খেতে আসবে বুঝি।' পূর্ণেন্দুবাবু স্মরণ করিয়া কহিলেন। 'তাই তো, তবে আর উনি যান কি করে। যা' মা, তবে তুই যা। বেশি দেরি করিস নি যেন ফিরতে—কি দেখচিস? তোর বাবা বুঝি শুধু লোহালক্কড় টাকা-কড়িই বোঝে? অদরকারী বইও সে পড়তে পারে, পড়তে ভালোই বাসে:—প্রমিথিয়ুস্ আন্‌বাউণ্ড! ছোট বয়সে আমার প্রিয় কবিই ছিল শেলী। তোরা বুঝি আর এদের আদর করিস না?'

'তা কেন, বাবা। তবে আমাদেরও তো নতুন কবি আছে, তাদের নিয়েও আমরা গৌরব অনুভব করি। আমাদের আদর্শ ব্যাখ্যা করা তাদের পক্ষে আরও সহজ। ফিরে এসে আজ দুপুরে তোমাকে তাদের কবিতা পড়ে শোনাব।'

'বেশ মা, তাই শোনাস্। দেখব তোদের কবিদের কতটা ক্ষমতা।'

বাহিরে গিয়া বেয়ারাকে দিয়া রঘুনন্দনকে গাড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য খবর পাঠাইয়া সুনীলা নিজের শোবার ঘরে আসিয়া ড্রেসিং-টেবিলের টুলটার উপর আয়নার দিকে পিছন দিয়া বসিয়া পড়িল। প্রসাধনের প্রয়োজন বোধ করিল না।

সুপ্রকাশবাবু কক্ষনো এমন করেন না। নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে না-পারিলে হয় টেলিফোনে বা চিঠিতে পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ পাঠান। তবে কি কিছু অসুখ-বিসুখই হইল? সরাসরি মেস-এ যাইতে পারিলেই ভালো হইত, কিন্তু তাহা সম্ভবত শোভন হইবে না। তা ছাড়া, মোটেই অসুখ-বিসুখ না হইতে পারে। পরশু দিন

সুজাতাদিকে টেলিফোন করার সময় শুনিয়াছে, একটুমাত্র পূর্বে সুপ্রকাশবাবু সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশবাবু কি এবার ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে খবর দেন নাই ?

সুনীলা জুতোর গোড়ালি দিয়া কার্পেটের উপর বারবার আঘাত করিতে থাকিল। সুপ্রকাশবাবুর এড়াইয়া-চলা এত সুস্পষ্ট যে, তাহা লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই; ইহা সুনীলার বহু অশ্রুজলের কারণ হইয়াছে। কিন্তু কারণটা কি ? বিরাগ অথবা ঔদাসীন্য ? অথচ যখনই দেখা হইয়াছে, সুপ্রকাশবাবুর পক্ষ হইতে আচরণের মাধুর্য্যের কোন ত্রুটি ঘটে নাই। সুমিতা বলেন, এটা দেমাক! অবর্ণনীয় একটা শ্রেষ্ঠত্ববোধ। এত বড় একটা দেমাকের ঔদ্ধত্য গোপন করিয়া এতটা ভব্য এবং আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ কি সম্ভব ? তবে কি ধনী বলিয়া সুপ্রকাশবাবু তাহাদের ঘৃণা করিয়া পরিহার করেন ? উনি তো নির্বোধ নন, তবে এ-গোঁড়ামি দেখাইতে যাইবেন কেন ?

'এখন আবার কোথায় বেরুচ্চিস্, শুনি ? ইচ্ছে হয়, বিকেলে বের হোস্। এখন কোথাও যাওয়া হবে না।'

চম্‌কাইয়া সুনীলা দেখিল, পিছনে মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নিশ্চয়ই বাবার কাছ হইতে সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন।

'আমাকে একবার কলকাতায় যেতেই হবে, মা।' সুনীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল।

'প্রদ্যোৎ একটু পরেই আসচে, সে খেয়াল আছে ?'

'দুপুরের খাওয়ার আগেই আমি ফিরে আসব।'

'যা ইচ্ছে করো।' সৌদামিনী অসন্তুষ্ট স্বরে কহিলেন। 'আজই তোমার কলকাতায় যাওয়ার দরকার হয়ে পড়ল কেন শুনি ? কার কাছে যাচ্চিস্, শুনি ?'

'সুজাতাদির বাড়ি।'

'কেন ?'

'কাজ আছে, মা। তা ছাড়া সুপ্রকাশবাবুর হয়তো অসুখ-বিসুখ করেচে।' সুনীলা স্পষ্ট নির্ভীক কণ্ঠে কহিল: 'কাল তার আসবার কথা ছিল। কেন আসেন নি, সে খবরটাও নিয়ে আসব।'

'ওঃ, মস্ত জরুরি কাজ! আসেনি, অসুখ করেচে!' তিক্ত কণ্ঠেই সৌদামিনী কহিলেন। 'কিন্তু এ কি আরম্ভ হয়েচে শুনি? বাপ আর মেয়ে, দুজনেই কেবল সুপ্রকাশবাবু, সুপ্রকাশবাবু! বলি, সে আমাদের কে? শুভোর কলেজের বন্ধু, আসা-যাওয়া করে, কিন্তু তা বলে কি তাকে মাথায় তুলতে হবে। বাপ বলচেন, সুপ্রকাশের তুলনা নেই; সে আগামী-কালের মানুষ, আইডিয়া যারা পরিবেশন করবে, ও তাদের দলের: একটু সহায়তা করলে এ-ছেলে দেশের লীডার হবে। লীডার! যেন সে আই. সি, এস্-এর চাইতে বড় চাক্‌রো···' বলিয়া ক্রুদ্ধ পা ফেলিয়া বিরক্তি-পরিস্ফুট মুখে সৌদামিনী হন্ হন্ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। মেয়েটার অপরিণামদর্শিতায় তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম হইল। এতদিন পরে এমন পাগল স্বামীর হাতে পড়িবার জন্য তাহার অদম্য আক্ষেপ হইতে লাগিল।

'দিদি?'

'কে, সুপ্রকাশ? এস, ভেতরে এস।' বলিয়া সুজাতা ড্রইং-রুমের দরজার দিকে তাকাইলেন।

'দিদি, সুমিতা কোথায়?'

'নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'জানি না।'

এইবার সুপ্রকাশ সুজাতার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল; তাহাতে এক বর্ণ রক্তেরও আভাস দেখিতে পাইল না; চোখের ভিজা পল্লবগুলি নজরে পড়িল।

'তার কি কিছু হয়েচে, দিদি?' সামনের চেয়ারটায় অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া সুপ্রকাশ প্রশ্ন করিল।

'সে চলে গেচে। কোথায় গেচে বলে যায়নি, কবে ফিরবে বলে যায়নি। আভাসেও খবরটা আমাকে আগে জানতে দেয়নি। কিন্তু আজ ভোরে উঠে আর দেখতে পাওয়া গেল না:—এই চিঠি সে লিখে গেচে। নাও পড়ো...' বলিয়া বহু কষ্টে উদ্গত-অশ্রু সংবরণ করিয়া পাশ হইতে একটা খাম উঠাইয়া সুজাতা সুপ্রকাশের দিকে আগাইয়া দিলেন।

সুপ্রকাশ একবার হাতটা বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিতে গেল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হাত না বাড়াইয়া মধ্যপথে থামিয়া কহিল, 'আপনিই পড়ুন, দিদি। আমি বড় উত্তেজিত হয়েচি। হয়তো পড়তে পারব না ঠিক মতো।'

সুজাতা একবার করুণ এবং স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সুপ্রকাশের মুখের দিকে তাকাইলেন, তারপর খামের ভিতর হইতে নীল-রঙা চিঠির কাগজটা বাহির করিয়া প্রায় অকম্পিত কণ্ঠেই পড়িয়া গেলেন :—

'দিদি ভাই, রাগ করোনা। তোমাকে না বলেই চলে যাচ্ছি। কিন্তু আর উপায় ছিল না। মিছিমিছি আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না, বা খোঁজ করো না। নিজের ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা অনেক দুঃখেই অর্জ্জন করেচি; আশা করি নিরাপদেই থাকব। সময় হলে আমি নিজেই এসে তোমার কাছে উপস্থিত হবো,—ভেবো না, লক্ষ্মী দিদি ভাই।

'সুপ্রকাশবাবু কাল আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। আমার জীবনটা এমন ভাবে ব্যর্থ হবে, সেটা ওর মনে গভীর সহানুভূতি জাগিয়েছে। সমাজের ভয় না করে', সংস্কারকে না-মেনে, অনুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এগিয়ে আসবার ক্ষমতা ও উদারতা ওর আছে। কিন্তু উচ্ছিষ্ট ফুলে কি করে' আমি দেবতার পূজো করি, ভাই দিদি? অত বড়োকে কি করে' আমি আমার এত কাছে আসন পেতে দেবো? আমাকে যেন তিনি ক্ষমা করেন, আমার হয়ে তাঁকে এই অনুরোধ করো। যতটা অসহায় তিনি আমাকে মনে করেছেন, ততটা অসহায় আমি নই। সমাজের বিরুদ্ধে একদিন ছ্যাবলামি দেখিয়েছিলাম, ওটা বিদ্রোহ নয়। আজ সত্যই বিদ্রোহ করবার জোর পেয়েচি। মাথাটা একেবারে নিচু করে' চুপ করে' থাকব না; স্বাধীন-ভাবে চলবার অধিকার অর্জ্জন করে নেব। হয়তো এই অধিকার লাভের চেষ্টায় একদিন সুপ্রকাশবাবুর সহায়তা নিতে পারি; আজ করুণা নেব না। উনি এসে উপস্থিত হবার আগেই পালিয়ে যেতে চাই।

'সুনীলা সুপ্রকাশবাবুকে ভালবাসে। বাইরে কখনও প্রকাশ না করলেও আমার বিশ্বাস, সুপ্রকাশবাবুও তাকে ভালবাসেন। ওকে বলো, এবার যেন আর দেমাক না দেখান। সহজকে সহজ ভাবেই যেন মেনে নেন।

'আজ বিদায়, দিদি ভাই। আবার ফিরব। প্রণাম জেনো। ইতি সুমিতা।'

'দিদি, একবার আমি খুঁজতে যাব।' উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুপ্রকাশ কহিল। 'বলে দিন, কোথায় কোথায় সে যেতে পারে, কোথায় আশ্রয় নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব…'

'কোনও লাভ নেই, সুপ্রকাশ।' সুজাতা ধীর কণ্ঠে কহিলেন। 'সারা ভোরবেলা সম্ভব-অসম্ভব সকল জায়গায় আমি টেলিফোন করেচি। কেউ তার সন্ধান জানে না। তুমি বস, আজ কোথাও যেও না। আজ এখানে বিশ্রাম করো।'

'না দিদি, আজ যাই। আজ আমি নিজেও শান্তি পাব না, অন্য কাউকেও শান্তি দিতে পারব না।'

'সু-মামা!' দরজার কাছ হইতে হুইসিল বাজিয়া উঠিল; উভয়েই চমকিয়া দরজার দিকে ফিরিলেন। পর্দার ফাঁক দিয়া মিণ্টুর উঁকি-দেওয়া মুখটা চোখে পড়িল। কৌতুকে, কৌতুহলে দীর্ঘ চোখ-দুটি।

'মিণ্টু, এখন নয়, ও-ঘরে যাও।' সুজাতা তাড়াতাড়ি কহিলেন।

'আমি শুধু', মিণ্টু কহিল, 'হাউৎজার কামান কতটা যায়, সু-মামাকে তাই জিজ্ঞাসা করব, মা-মণি। আর কিছু নয়।'

'পরে জিজ্ঞাসা করো।'

'আর ট্যাঙ্ক্ গাছে চড়তে পারে কিনা, তা-ও।'

'বেশ। তাও পরে জিজ্ঞাসা করো।'

অনিচ্ছুক মুখটা মিণ্টু ক্ষুণ্ণভাবেই পর্দার ফাঁক হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। আজ বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে কি? মাসিই বা কোথায় গেল? এসব কি?

অবসন্ন দেহে, অনিশ্চিত পদে সুপ্রকাশ সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিতে লাগিল। নিচের সিঁড়িতে কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা; মদের নেশায় অব্যবস্থিতচিত্ত সুমিতা এইখানেই তার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়াছিল। বেচারি

সুমিতা! এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণের মধ্যেও তাহার চিত্তের গভীর সত্য প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা, কে জানে। মানুষের ভালবাসাকে উপেক্ষা দেখান সত্যই হয়তো উচিত নয়। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া সুপ্রকাশ একটা বিশ্রী ট্র্যাজিডির সৃষ্টি করিয়াছে; ত্রুটি-সংশোধন করিতে আসিয়া সুমিতাকে গৃহহীন করিয়া অজ্ঞাতবাসে ঠেলিয়া দিল মাত্র। অথচ সামান্য···

'সুপ্রকাশবাবু!'

'সুনীলা! তুমি! এখানে?' সন্ত্রস্ত ভীত ভাবেই সুপ্রকাশ সুনীলার দিকে তাকাইল।

'বেশ! কাল গেলেন না। একটা খবরও দিলেন না। খোঁজ নেবার জন্য আমাকেই ছুটে আসতে হলো। কিন্তু এ কি, এ-রকম চেহারা কেন? চুল উস্কোখুস্কো, মুখ শুকনো, চোখ লাল। অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?'

'সুনীলা, সুমিতা বাড়ি থেকে চলে গেচে! কাউকে না জানিয়ে কোথায় চলে গেচে...'

'সুমিতা! কেন? কোথায়? কবে?' সোদ্বেগে সুনীলা প্রশ্ন করিল। 'দিদি ওপরে আছেন? চলুন তার কাছে যাই।'

'আমার জন্যই সে চলে গেছে, সুনীলা। আমি তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলাম। আমাকে এড়াবার জন্যই সে চলে গেচে।'

সুনীলার মুখটা বিস্ময়ে, বেদনায়, অপ্রত্যয়ে সহসা বিবর্ণ হইয়া উঠিল; নিজেকে বিমূঢ়ের মতো মনে হইল।

'তার বিশ্বাস', সুপ্রকাশ বাহিরের দিকে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া কহিল, 'আমি শুধু করুণা করেই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেচি, এতে আমার—তুমি ওর ইতিহাসটা জানো না, তাই হয়তো সবটা বুঝতে পারবে না, কিন্তু···'

'আমি সব ইতিহাস জানি।' অকস্মাৎ সুনীলার বিবর্ণ মুখ-মণ্ডল রক্তের আবির্ভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

'ওঃ, সব জানো। তার দুঃখময় ইতিহাসের পটভূমিকায় সে আমার প্রস্তাবটাকে দয়া-দেখানো ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে নি। সে মনে করেছে, এর সঙ্গে আমার হৃদয়ের কোনও সংযোগ নেই; এটা নেহাৎ আর্ত্তসেবা ছাড়া আর কিছু নয়। তার বিশ্বাস, আমি অন্যকে ভালবাসি এবং সেই অন্যজন আমাকে…'

'তা তো আমারও বিশ্বাস।' কৌতুকে হাসিতে সুনীলার মুখটা ঝলমল করিয়া উঠিল।

'তুমি কি করে জান?' সবিস্ময়ে আশঙ্কিত মুখ ফিরাইয়া সুপ্রকাশ চাহিল।

'জানব না? সেই অন্যজন যে আমি! কতদিন ধরে জানি, সে কি আজ? এ কথা যে জন্মজন্মান্তর ধরে' জানি।' অকস্মাৎ সুনীলার দুই চোখের অশ্রু মুক্তার মতো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল।

'সুনীলা!'

'কম্‌রেড্‌!' বলিয়া সুনীলা ডান হাতটা সুপ্রকাশের দিকে বাড়াইয়া দিল।

'এবার কোথায় যাব, দিদিমণি?' রঘুনন্দন গাড়িতে স্টার্ট দিয়া কহিল।

'লিলুয়া।' সুনীলা কহিল।

'আর আমি?' সুপ্রকাশ প্রশ্ন করিল।

'তুমি যাবে আমার সঙ্গে।' সুনীলা পাশে চাহিয়া সহাস্যে কহিল। 'একসঙ্গে চলা শুরু হলো, এ-চলা আর থামবে না।'

'আর সুমিতা? কে তার খোঁজ করবে?'

'আমিই তাকে খুঁজে বের করব, দেখো।'

পার্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গি, কাউন্সিল্ হাউস্ স্ট্রীট, ক্লাইভ স্ট্রীটের ভিতর দিয়া বড়ো গাড়িটা হাওয়ার মতো ছুটিয়া চলিল। বড় বড় অফিস-বাড়িগুলি ছায়ার মতো সঙ্গে দৌড়াইতে দৌড়াইতে অস্পষ্ট হইয়া উঠিল; ল্যাম্প পোস্টগুলি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আঙুল মট্‌কাইতে লাগিল। সংযোগ-উৎসুক ফুটপাথ জোড়া স্টিমারের ধাক্কা-খাওয়া জলের মতো পথের দুই পাশে সরিয়া যাইতে লাগিল। গতির চাঞ্চল্য ও গাড়ির ঝাঁকুনি যেন একটা নতুন আবেশের সৃষ্টি করিল।

'জানো, সুনীলা,' অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর সুপ্রকাশ কহিল, 'কাল বিকেলে তোমার বাবা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন হেস্টিংসে, গঙ্গার পারে। ঠিক্ এই রকম অবিশ্বাস্য প্রস্তাবই তিনি একটা করলেন। কিন্তু আমি চট্ করে রাজি হতে ভয় পেলাম। রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব শুধু রূপকথায়ই পাওয়া যায়, কিন্তু রূপকথার যুগ…'

'ঐ তো আসচে!' সুনীলা সমুখে চাহিয়া যেন বহু দূরে দৃষ্টিটাকে প্রেরণ করিয়া দিয়া দূরাগত কণ্ঠে কহিল। 'সব মানুষ স্বাধীন, সব মানুষ সমান সুযোগের অধিকারী; দাসত্ব ও দারিদ্র্য থেকে শ্রমিকের মুক্তি, স্বামীর প্রভুত্ব থেকে স্ত্রীর মুক্তি, সমাজের সংস্কারের বন্ধন থেকে যুক্তির মুক্তি, অন্ধ-ভক্তির মোহ থেকে ধার্ম্মিকের মুক্তি, পরদেশীর অধীনতা থেকে দেশের মুক্তি, মানুষের লোভের শয়তানি থেকে কল্যাণের মুক্তি, সর্ব্বপরিব্যাপ্ত, তুচ্ছতম মানুষ পর্য্যন্ত সর্ব্বজনের এত বড়ো মুক্তি, এ কি রূপকথা ছাড়া কেউ ভাবতে পেরেছে? আমাদের যুগ সেই অসাধ্য-সাধন করতে চায়। গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে, কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায় যত

রকমের শৃঙ্খল আছে, তা ভেঙে-গুঁড়িয়ে দিতে চায়। রূপকথাকে রূপ দেব বলেই আমরা ব্রত গ্রহণ করেছি। এইবার সেই রূপকথালোকে আমাদের যাত্রা শুরু হলো।' বলিয়া সুনীলা দীপ্ত মুখে সুপ্রকাশের দিকে চাহিল।

'পাগলা মেয়ে!—এই দেখ, তোমাদের রঘুনন্দনের কাণ্ড। যা জোরে ছুটছে, লোক-চাপা না দিয়ে ছাড়বে না!' আকস্মিক ব্রেক-চাপার ঝাঁকুনি হজম করিয়া সহাস্যে সুপ্রকাশ কহিল।